হুমায়ুন আজাদ

আমার অবিশ্বাস



এক বড়ো অশুভ সময় এসেছে পৃথিবীতে, যারা অন্ধ
তারা চোখে সবচেয়ে বেশি দেখতে তো পাচেচ্ছই,
তারা অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করছে, এবং পৃথিবী জুড়ে
ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বাসের বিকট মহামারী। এখন সবাই
বিশ্বাস করছে, সবাই বিশ্বাসী; কারো পক্ষে এখন বলা
সম্ভব হচ্ছে না– আমি বিশ্বাস করি না, আমি অবিশ্বাস
করি। বিজ্ঞানের এই অসাধারণ যুগে যখন কিছু
অবিশ্বাসী সৌরলোক পেরিয়ে ঢুকতে চাচ্ছে মহাবিশ্বে,
তখন পৃথিবী মেতে উঠেছে মধ্যযুগীয় বিশ্বাসে;
শক্তিলোভী ভ্রষ্ট রাজরীতিকেরা মানুষকে আক্রান্ত ক'রে
তুলছে বিশ্বাসের রোগে। এখন পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন
বিধাতা পালন করছে অত্যন্ত সক্রিয় রাজনীতিক
ভূমিকা, আর গণতন্ত্রমত্ত শক্তির উৎসরা নির্বাচিত ক'রে
চলছে বিভিন্ন বিধাতাকে। তবে বিশ্বাস শুধু
অতিমানবিক সত্তায়ই সীমাবদ্ধ নয়; হাজার হাজার শূন্য
প্রথা বিশ্বাস ক'রে চলছে তারা, যা খুবই ক্ষতিকর।
বাংলাদেশে আজ সবাই বিশ্বাসী; শক্তিমানতম থেকে
দুর্বলতম বাঙালিটি প্রচণ্ডভাবে পালন ক'রে চলছে
বিশ্বাস। এখানে একমাত্র হুমায়ুন আজাদই বলতে
পারেন– আমি অবিশ্বাস করি। তাঁর অবিশ্বাস শুধু
অতিমানবিক সত্তায় অবিশ্বাস নয়, তাঁর অবিশ্বাস এর
থেকে অনেক গভীর; তিনি অবিশ্বাস করেন এ-সভ্যতার
প্রায় সমস্ত প্রচারে। সব কিছুই তিনি বিচার ক'রে
দেখতে চান; এবং এর ফলেই জন্মেছে এই অসামান্য
দার্শনিক গ্রন্থটি। এ-বইয়ের পরিচেচ্ছদপরম্পরায় তিনি
খুলে খুলে দেখিয়েছেন বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা।
প্রথম প্রকাশের পর থেকে *আমার অবিশ্বাস* নন্দিত হয়ে
এসেছে বাঙলা ভাষায় লেখা অনন্য বই হিশেবে। এবার
প্রকাশিত হলো বইটির পরিশুদ্ধ সংস্করণ।

ISBN 984 401 412 3



হুমায়ুন আজাদ বাঙলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক; তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪ : ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ বিক্রমপুরের রাড়িখালে। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন সভাপতি। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে- কবিতা : ১৯৭৩ *অলৌকিক ইস্টিমার* ১৯৮০ *জ্বলো চিতাবাঘ* ১৯৮৫ *সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে* ১৯৮৭ *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল* ১৯৯০ *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে* ১৯৯৩ *হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* ১৯৯৪ *আধুনিক বাঙলা কবিতা* ১৯৯৮ *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* ১৯৯৮ *কাব্যসংগ্রহ* কথাসাহিত্য : ১৯৯৪ *ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল* ১৯৯৫ *সব কিছু ভেঙে পড়ে* ১৯৯৬ *মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ* ১৯৯৬ *যাদুকরের মৃত্যু* ১৯৯৭ *শুভব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার* ১৯৯৮ *রাজনীতিবিদগণ* ১৯৯৯ *কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ* সমালোচনা : ১৯৭৩ *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা* ১৯৮৩ *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা* ১৯৮৮ *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* ১৯৯০ *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি* ১৯৯২ *নারী* (নিষিদ্ধ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫) ১৯৯২ *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে* ১৯৯২ *নিবিড় নীলিমা* ১৯৯২ *মাতাল তরণী* ১৯৯২ *নরকে অনন্ত ঋতু* ১৯৯২ *জলপাইরঙের অন্ধকার* ১৯৯৩ *সীমাবদ্ধতার সূত্র* ১৯৯৩ *আধার ও আধেয়* ১৯৯৭ *আমার অবিশ্বাস* ১৯৯৭ *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা* ১৯৯৮ *দ্বিতীয় লিঙ্গ* ১৯৯৯ *নির্বাচিত প্রবন্ধ* ভাষাবিজ্ঞান : ১৯৮৩ *Pronominalization in Bengali* ১৯৮৩ *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র* ১৯৮৪ *বাক্যতত্ত্ব* ১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা* (প্রথম খণ্ড) ১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৯৮৮ *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* ১৯৯৯ *অর্থবিজ্ঞান* কিশোরসাহিত্য : ১৯৭৬ *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী* ১৯৮৫ *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না* ১৯৮৭ *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* ১৯৮৯ *আব্বুকে মনে পড়ে* ১৯৯৩ *বুকপকেটে জোনাকিপোকা* ১৯৯৬ *আমাদের শহরে একদল দেবদূত* অন্যান্য ১৯৯২ *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ* ১৯৯৪ *সাক্ষাৎকার* ১৯৯৫ *আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন* ১৯৯৭ *বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়* ১৯৯৭ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা*

হুমায়ুন আজাদ

আমার অবিশ্বাস

হুমায়ুন আজাদ

আমার অবিশ্বাস



আগামী প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : অষ্টম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৯ জুলাই ২০১২

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৪০৪ জুলাই ১৯৯৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : প্রথম পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ : দ্বিতীয় মুদ্রণ চৈত্র ১৪০৮ মার্চ ২০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ : তৃতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ মে ২০০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : চতুর্থ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : পঞ্চম মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৩ এপ্রিল ২০০৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ষষ্ঠ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : সপ্তম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৯৫৯১১৮৫, ৭১১০০২১, ০১৭৯০৫৮৬৩৬২

প্রচ্ছদ সমর মজুমদার

স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Amar Abishuash: My Unbelief: by Humayun Azad.

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
e-mail: info@agameeprakashani-bd.com
First Published: February 1997
Second Edition : Eighth Printing: July 2012

Price: Tk.200.00 Only

ISBN: 978 984 04 1679 0

উৎসর্গ

বার্ট্র্যান্ড রাসেল

ভূমিকা

বিশ্বজগত এখনো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর। গত তিন শতকে বিজ্ঞান বেশ এগিয়েছে, পৃথিবীকে মহাজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিয়েছে এক গৌণ এলাকায়, মহাজগতকে এক বদ্ধ এলাকার বদলে ক'রে তুলেছে অনন্ত; এবং মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, অমৃতের পুত্র প্রভৃতি আত্মগর্বিত সুভাষণ থেকে বিচ্যুত ক'রে পরিণত করেছে নগ্ন বানরে; কিন্তু মানুষের চেতনার বিশেষ বদল ঘটে নি। মানুষ আজো আদিম। মানুষের চোখে আজো সব কিছুই অলৌকিক রহস্যে পরিপূর্ণ; আকাশে আজো তারা অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ বা নিরন্তর বিস্ফোরিত গ্যাসকুণ্ডের বদলে দেখতে পায় বিভিন্ন বিধাতা; দেখতে পায় মনোরম স্বর্গ আর ভীতিকর নরক। সভ্যতার কয়েক হাজার বছরে মানুষ মহাজগতকে উদ্ঘাটিত করার বদলে তাকে পরিপূর্ণ করেছে অজস্র রহস্যে, ধারাবাহিকভাবে ক'রে চলছে বিশ্বের রহস্যীকরণ; বা সত্যের অসত্যীকরণ। মহাজগতের রহস্যীকরণে অংশ নিয়েছে মানুষের প্রতিভার সব কিছু : পুরাণ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, এবং আর যা কিছু আছে। তার শক্তির সব কিছুই মানুষ ব্যবহার করেছে মহাজগতকে রহস্যে ভ'রে তুলতে; তাকে পরিচিত করার বদলে করেছে অপরিচিত, আলোকিত করার বদলে করেছে তমসাচ্ছন্ন। আদিম মানুষ যখন রহস্যীকরণ শুরু করেছিলো, তার কোনো দুরভিসন্ধি ছিলো না, সে শুধু গিয়েছিলো ভুল পথে; কিন্তু পরে সমাজপ্রভুরা দেখতে পায় বিশ্বের সত্য বের করার বদলে তাকে রহস্যে বোঝাই ক'রে তুললেই সুবিধা হয় তাদের। মহাজগতের রহস্যীকরণে ধর্ম নেয় প্রধান ভূমিকা; তার কাজ হয়ে ওঠে রহস্যবিধিবদ্ধকরণ, আলো সরিয়ে অন্ধকার ছড়ানো, মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা সে-সব সম্বন্ধে যা সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন। ওই রহস্যের পায়ের নিচে নানা তাত্ত্বিক কাঠামো স্থাপন করে দর্শন, জন্ম দেয় বহু বিখ্যাত ধাঁধা, করে রহস্যের দর্শনীকরণ। দর্শনের লক্ষ্য ছিলো সত্য আবিষ্কার, কিন্তু দর্শন আসলে বেশি সত্য বের করতে পারে নি; কিন্তু মিথ্যে প্রতিষ্ঠায় তার কাজ অতুলনীয়। প্লাতো-আরিস্ততল সত্য বের করেছেন খুবই কম, তবে মিথ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিপুল। সাহিত্য ও শিল্পকলা রহস্যকে রূপময় ক'রে তীব্র আবেগের সাথে সঞ্চার

করেছে মানুষের মনে। বিশ্বসাহিত্যের বড়ো অংশই দাঁড়িয়ে আছে ভুল ভিত্তির ওপর। তাই মহাজগত এখনো রহস্যময়; মহাজগতকে এখনো বোঝার উপায় হচ্ছে বিশ্বাস। এই রহস্যময়তা ও বিশ্বাস ক্ষতিকর মানুষের জন্যে; এখন দরকার মহাজগত ও মানুষের মনকে অলৌকিক রহস্য থেকে উদ্ধার করা, অর্থাৎ দরকার মহাজগতের বিরহস্যীকরণ। মানুষের জন্যে যা কিছু ক্ষতিকর, সেগুলোর শুরুতেই রয়েছে বিশ্বাস; বিশ্বাস সত্যের বিরোধী, বিশ্বাসের কাজ অসত্যকে অস্তিত্বশীল করা। বিশ্বাস থেকে কখনো জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না; জ্ঞানের বিকাশ ঘটে অবিশ্বাস থেকে, প্রথাগত সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনভাবে না মেনে তা পরীক্ষা করার উৎসাহ থেকে। বাঙলার মহাপুরুষগণ, বিদ্যাসাগর ও আরো দু-একজন বাদে, সবাই বিশ্বাসী; তাঁরা আমাদের জন্যে সৃষ্টি ক'রে গেছেন ভুল কল্পজগত। রাজনীতিবিদেরা আজ মেতে উঠেছে বিশ্বাস ও মিথ্যের প্রতিযোগিতায়; তারা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিকর মানবগোত্র। *আমার অবিশ্বাস*-এ সাতটি প্রবন্ধ রয়েছে, তবে বইটি প্রবন্ধের বই নয়; আমি ধারাবাহিকভাবে একটি বই-ই লিখতে চেয়েছিলাম, তবে পাঠকদের কথা ভেবে বইটিকে সাত শিরোনামে ভাগ ক'রে দিলাম। আমি আনন্দিত যে বইটি বিপুল সাড়া জাগিয়েছে, বাঙালির বিশ্বাসের মেরুদণ্ডে কিছুটা ফাটল ধরাতে পেরেছে। সংশোধিত এ-সংস্করণে শুদ্ধ ক'রে দেয়া হলো কয়েকটি মুদ্রণ ক্রটি, বদল করা হলো একটি বাক্য, কবিতার অনুবাদেও বদল করা হলো কয়েকটি শব্দ। নতুন অক্ষরে বইটি এবার বিন্যস্ত হলো ব'লে কয়েকটি পাতা কমলো, কিন্তু আর কিছু কমে নি, বরং কিছুটা বেড়েছে।

হুমায়ুন আজাদ

১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
৪ আষাঢ় ১৪০৪ : ১৮ জুন ১৯৯৭

সূচিপত্র

আমার অবিশ্বাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার ইন্দ্রিয়গুলো

মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে আমি সুখী;—বেশ লাগে আমার; অন্য কোনো প্রাণী, এমন কি বস্তু, রঙিন প্রজাপতি বা সুন্দরবনের বাঘ বা শান্ত গরু বা নির্বিকার মোষ বা মাছ বা সাপ বা ছোট্ট পিঁপড়ে বা আমগাছ বা শিমুল বা ঘাস বা পাথরও যদি হতাম, তাহলেও খারাপ লাগতো না, বেশ লাগতো। আর যদি কখনোই জন্ম না নিতাম, কিছুই না হতাম, তাহলেও খারাপ লাগতো না। তখন আমি জানতামই না জন্ম আর পৃথিবী কাকে বলে, যেমন এসব আমি জানবো না যখন ম'রে যাবো। ম'রে যাওয়ার পর কখনোই জানবো না যে আমি জন্ম নিয়েছিলাম, পৃথিবীতে ছিলাম, আমার ভালো লাগতো ভোরের আকাশ, শ্রাবণের মেঘ, হেমন্ত, নদী বা নারী; কখনোই জানবো না আমি কবিতা পড়েছিলাম, এমনকি লিখেছিলামও, কেঁপে উঠেছিলাম কামনায়, অজস্র বার তৃপ্ত করেছিলাম আমার কামনা, এবং বহুবার পরিতৃপ্ত করতে পারি নি। জন্মের আগে যেমন শূন্য ছিলাম, ম'রে যাওয়ার পর আমার কাছে আমি সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে যাবো। আমার সূচনার আগের অধ্যায় অন্ধকার, সমাপ্তির পরের পরিচ্ছদও অন্ধকার। দুই অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক আলোর ঝিলিক আমি, এই ঝিলিকটুকু আমার ভালো লাগে। আমার আগের ও পরের অন্ধকার সম্পর্কে যে আমি জানি না, তা নয়; ওই অন্ধকারকে রহস্যময় ব'লে ভেবে আমি বিভোর নই, আমি জানি আমার আগে কী ছিলো, আমার পরে কী হবে। আমি জানি আমি কোনো মহাপরিকল্পনা নই, কোনো মহাপরিকল্পনার অংশ নই, আমাকে কেউ তার মহাপরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করে নি; একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে আমি জন্মেছি, অন্য একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে আমি ম'রে যাবো, থাকবো না; যেমন কেউ থাকবে না, কিছু থাকবে না। এ-সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোনো কারণ আমি দেখি না।

বেঁচে আমি সুখ পাই; আমার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে সুখ ঢোকে, আমাকে ভ'রে তোলে। সুখ আমার কাছে সামাজিক নয়, যদিও আমার সামাজিক অবস্থান আমাকে সহযোগিতা করে সুখী হ'তে, তবু সুখ আমার কাছে একান্তই ব্যক্তিগত; তার সাথে সমাজরাষ্ট্রসভ্যতার সম্পর্ক নেই; আমি আমার সুখগুলো প্রকৃতি ও প্রতিবেশ থেকে পুরোপুরি ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করি। আমার মাত্র পাঁচটি ইন্দ্রিয়, আমার মনে হয় আরো অনেকগুলো ইন্দ্রিয় থাকা উচিত ছিলো আমার; আমার

ইন্দ্রিয়গুলোর থাকা উচিত ছিলো আরো শক্তি, আরো নিপুণতা; তাহলে আমি আরো নানা ধরনের সুখ আরো প্রবলভাবে পেতে পারতাম। আমি দেখতে পাই, যদিও দিন দিন আমার দেখার শক্তি কমছে; দেখতে পাওয়া আমার জন্যে একটি বড়ো সুখ। এক ভোরবেলা চারদিকে এমন ঘন কুয়াশা ছড়ানো দেখলাম, কুয়াশা এমনভাবে ঢেকে ফেললো আমাকে, আরেক ভোরে এমন অমল আলো দেখলাম, রোদ এমনভাবে রঞ্জিত করলো আমাকে যে সুখ শরীর ভ'রে গেলো; মনে হলো মাংসে কুয়াশা ঢুকছে, রক্তে রোদ ঢুকছে, আমি সুখী হচ্ছি। যা কিছু দেখি আমি, তাই আমার জন্যে সুখ। ছেলেবেলায় পুকুরে ঢেউ উঠতে দেখে, স্থির জলে কচুরি ফুল দেখে সুখ পেতাম, আজো পাই; আজ পৌষের শিশির দেখে সুখ পেলাম, শিশিরভেজা ঘাসের সবুজ দেখে সুখ পেলাম, কোমল রোদ দেখে সুখ পেলাম; আজ এতোগুলো বিস্ময়কে দেখলাম যে সুখে দেহ ভ'রে উঠলো। বলবো কি যে মন সুখে ভ'রে উঠলো? সামাজিক অনেক কিছুর দিকেই আমি চোখ দিই না, ওসব দেখে সুখ পাই না, নোংরা লাগে, চোখ অসুস্থ বোধ করে। আমার মগজ সামাজিক অধিকাংশ ব্যাপার দেখতে ঘেন্না বোধ করে, তাই ওগুলো পীড়া দেয় আমাকে; যেমন মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি দেখে আমি সুখ পাই না, সাধারণত ওসব দেখতে চাই না, ওঁরা যেখানে থাকেন আমি সাধারণত সেখানে যাই না, ক্ষমতা আমার কাছে অসুন্দর, এমনকি অশ্লীল; দোয়েলচড়ুই দেখে সুখ পাই, রাষ্ট্রপতির মুখের থেকে চড়ুইর মুখ অনেক সুন্দর; উলঙ্গ শিশুরা, ওদের পরার কিছু নেই, মাঘের শীতে পাতার আগুনের উম নিচ্ছে দেখে সুখ পাই; সুখ পেয়ে নিজেকে অপরাধী বোধ করি। আমার ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে চোখ দুটিই শ্রেষ্ঠ; এ-দুটি দিয়ে আমি দূর থেকে ভেতরে টেনে আনি দৃশ্যের পর দৃশ্য, সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্য। অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে এভাবে টানতে পারি না বাইরকে। ছেলেবেলায় পদ্মার পারে, সূর্যাস্তের আগে, দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পদ্মার পশ্চিম প্রান্তে যে-লাল গলতে দেখেছিলাম, তার ঢেউ আজো দেখতে পাই; ওই লাল আমার চোখে লেগে আছে, যে-লাল আমি পরে মুহূর্তের জন্যে দেখেছিলাম মেরেলিন মনরোর ঠোঁটে, ওই ঠোঁটও আমি দেখতে পাই।

গন্ধ আমাকে সুখী করে, এলোমেলো করে, কখনো ভারী, কখনো হাল্কা করে; দৃশ্যের থেকেও, অনেক সময়, গন্ধ আমাকে বেশি আলোড়িত করে। গন্ধ অনেক বেশি গভীরে ঢোকে দৃশ্যের থেকে, এবং দেয় সংস্পর্শের বোধ। চোখ দূরকে ভেতরে টেনে আনলেও দূরত্ব ঘোচাতে পারে না; নাক দূরকে টেনে আনতে পারে না ভেতরে, টেনে আনে যা কিছু আমাদের সংলগ্ন; তাই নাক দিয়ে নিই সংলগ্নতার স্বাদ। শুধু সুগন্ধ নয়, যেসব গন্ধ খুব ভদ্র নয়, সাধারণত আমরা পেতে চাই না, সেগুলোতেও আমি সুখ পাই। অজানা ফুলের গন্ধে, সাথে কেউ না থাকলে, যেমন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ি, তাকাই, তেমনি দাঁড়িয়ে পড়ি, তাকাই, পচানো পাটের অবর্ণনীয় অভদ্র গন্ধে, আমার ভেতরে একটা প্রচণ্ড এলোমেলো অবস্থা

ঘটে, ভেতরটি ভারী হয়ে ওঠে, আমি সুখ পাই। বেশি সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না; বেশি সুগন্ধ ও দুর্গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার জগত গন্ধেরও জগত, সেটি যেমন ভ'রে আছে শিউলির সুগন্ধে, তেমনি ধানের, বা ঘাসের, বা কারো শরীরের গন্ধে, এবং কোনো কোনো কবিতা থেকে ছড়িয়ে পড়া গন্ধে। দৃশ্যের জগতের মতো বিশাল নয় গন্ধের জগত, এ-ইন্দ্রিয়টি বেশি দূরকে আমার ভেতরে টেনে আনতে পারে না; কিন্তু আমি বেঁচে থেকে যে-সুখ পেয়েছি, তার অনেকটা সংগ্রহ করেছে এ-ইন্দ্রিয়টি।

কান সুখী করেছে আমাকে বিপুলভাবে; এটি পৃথিবীকে ধ্বনিরূপে ঢুকিয়েছে আমার ভেতরে, আমার অভ্যন্তরকে ক'রে তুলেছে ধ্বনিময়, ভেতরে সব সময়ই ধ্বনির গুঞ্জন চলছে। নিঃশব্দতাই আমি বেশি পছন্দ করি আজকাল, সুখ পাই স্বরকোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারলে, যদিও তা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, কেননা পৃথিবী আজকাল উচ্চ কৃত্রিম ধ্বনি দ্বারা বড়ো বেশি আক্রান্ত; কিন্তু স্বরমালা যে বাল্যকাল থেকে সুখী ক'রে আসছে আমাকে, কোনো কোনো স্বরে আমি আজো সুখে কেঁপে উঠি, তা অস্বীকার করতে পারি না। সুখ পাই আমি প্রাকৃতিক শব্দে, দোয়েলের নিম্নস্বর বা বজ্রের প্রচণ্ড গর্জনে, গাভীর ডাকে, বৃষ্টির শব্দে, জলের প্রবাহে; বাঁশি বা বেহালার হাহাকারও সুখী করে আমাকে। একটি জলপ্রবাহের শব্দ আমি আজো শুনতে পাই। ঘুম থেকে জেগে এক বন্ধু আর আমি দেখতে পাই বর্ষা এসে গেছে, থইথই চারদিক, প্রচণ্ড শব্দে সরু নালা দিয়ে জল ঢুকছে পশ্চিম পুকুরে; আমরা দুজন ওই জলপ্রবাহে সারা সকাল ভ'রে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর ভেসে যেতে থাকি, আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকি। ওই শব্দ আজো আমাকে সুখ দেয়। মানুষের স্বর দিন দিন আবেদন হারিয়ে ফেলছে আমার কাছে, মানুষের বাচালতা এতো পীড়া দিচ্ছে যে মানুষ দেখলে আমি বধির হয়ে যেতে চাই; তবু ভুলতে পারি না যে আমার জন্যে সুখকর কিছু ধ্বনি উঠে এসেছিলো মানুষের কণ্ঠ থেকেই, হয়তো ভবিষ্যতেও আসবে।

শিশুর প্রধান ইন্দ্রিয় জিভ, পৃথিবীকে সে পরখ করতে চায় সম্ভবত জিভ দিয়ে, তাই মুঠোর কাছে যা পায় তাই মুখে দিয়ে দেখে, স্বাদ নেয় পৃথিবীর; তার কাছে সমান সুস্বাদু আবর্জনা আর আগুন। যখন শিশু ছিলাম, কিশোর হয়ে উঠেছি যখন, তখনও আমি সব কিছু চুষে দেখতে চেয়েছি; আজো অনেক কিছু চুষে আর চেখে দেখতে ইচ্ছে করে। ছেলেবেলা ভ'রে ইচ্ছে হতো চুলোর লাল আগুনের টুকরোগুলোকে চুষে দেখতে, ওগুলো লাল গোলাপের থেকেও লাল হয়ে জ্বলজ্বল করতো, সূর্যাস্তকেও চুষে স্বাদ নিতে ইচ্ছে হতো; কয়েক বছর আগে সারা সন্ধ্যা চুষতে চিবুতে ইচ্ছে হয়েছিলো চুয়িংগামের মতো এক তরুণীকে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে যে-জগত, তার স্বাদ আছে, টক মিষ্টি ঝাল তেতো বিষাক্ত স্বাদ; আমি তার স্বাদ নিয়ে সুখী হয়েছি। শুধু মিষ্টি স্বাদ নয়, সব স্বাদই সুখকর, যদিও সব স্বাদ সমানভাবে সহ্য করতে পারি না; কিন্তু স্বাদের জগত আমাকে সুখী করে।

ছোঁয়া সবচেয়ে অন্তরঙ্গ অনুভূতি; আমাদের শরীর ছোঁয়া চায়, আমরা ছুঁতে চাই; আমিও ছুঁতে চেয়েছি, ছোঁয়া চেয়েছি, এবং ছোঁয়া পেয়ে ও ছুঁয়ে সুখী হয়েছি। আমার ত্বক সুখী হয়েছে অজস্র ধরনের ছোঁয়ায়; আমি যতো ছুঁতে চেয়েছি, তার চেয়ে বেশি ছোঁয়া চেয়েছি; ছোঁয়া অনেকটা শান্ত পুকুরে ছোড়া ঢিলের মতো, ছোঁয়া পেলে আমার ত্বক জলের মতো কেঁপে ওঠে, চারদিকে ঢেউ খেলে যায়, ঢেউ কেঁপে কেঁপে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি সাধারণত ছুঁয়েছি হাত দিয়ে, কিন্তু আমি ছোঁয়া চেয়েছি সারা শরীরে; এবং দুটি বস্তুই সম্ভবত আমাকে ছুঁয়েছে সারা শরীরে—একটি জল, আরেকটি বায়ু। জলের ছোঁয়ার তুলনা হয় না। ছেলেবেলায় পুকুরে নেমে যে উঠতে চাই নি, মাঘের ভোরেও লাফিয়ে পড়েছি জলে, কেননা জলই শুধু আমাকে সারা শরীরে নিবিড়ভাবে ছুঁয়েছে। বাতাসের সাথে জলের পার্থক্য হচ্ছে বাতাস তার ছোঁয়া বুঝতে দেয় না, ত্বকে হাল্কা ছোঁয়া দিয়েই চ'লে যায় বা স্থির থাকে, কিন্তু জল নিবিড়ভাবে আবৃত ক'রে রাখে। জল কামনাময়। আমি ছুঁয়ে সুখ পেয়েছি। আকাশ আর আগুন ছুঁয়ে ফেলেছি কতোবার; ঘাস দেখলে এখনো ছুঁতে ইচ্ছে করে, পশু দেখলে ছুঁতে ইচ্ছে করে, কোনো কোনো নারী দেখলে ছুঁতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ছুঁই না; সব কিছু ছোঁয়া অনুমোদিত নয়। ওষ্ঠ দিয়ে ছোঁয়া নিবিড়তম ছোঁয়া, আমি যা কিছু ওষ্ঠ দিয়ে ছুঁয়েছি, তারাই আমাকে সুখী করেছে সবচেয়ে বেশি। আমাদের সমাজে ছোঁয়া খুবই নিষিদ্ধ ব্যাপার; আমরা খুব কম মানুষকেই ছুঁতে পারি, খুব কম মানুষকেই ছোঁয়ার অধিকার আছে আমাদের। ছোঁয়া এখানে পাপ; কোনো নারী যদি কোনো পুরুষকে ছোঁয়, কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে ছোঁয়, তাতে সূর্য খ'সে পড়ে না, আকাশে হুলস্থুল শুরু হয়ে যায় না; কিন্তু আমরা মনে করি মহাজগত তাতে খেপে উঠছে। শরীর খুবই আপত্তিকর আমাদের কাছে, একে অজস্র পাপের উৎস ভেবে আমরা ভয় পাই; পবিত্র বইগুলো সব সময় মনে করিয়ে দেয় যে আমরা পাপী, তাই আমাদের সুখ নয়, শাস্তি প্রাপ্য। কিন্তু আমি ছুঁয়েছি, ছোঁয়া পেয়েছি, তাতে চাঁদতারা খ'সে পড়ে নি। ছুঁয়ে ও ছোঁয়া পেয়ে আমি যে-সুখ পেয়েছি, তা আর কিছুতে পাই নি।

ইন্দ্রিয়গুলো, আমার মোহন ইন্দ্রিয়গুলো, সুখী করে আমাকে; কিন্তু আমি শুধু এগুলোর সুখেই সীমাবদ্ধ থাকি নি। আমি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারি, সরিয়ে রেখে সুখ পাই, খুবই ভিন্ন রকমের সুখ; পাঁচ ইন্দ্রিয়ের টসটসে সুখের থেকে খুবই ভিন্ন ধরনের সুখ পাই আমি আরেক জগতে, নিরিন্দ্রিয় ওই জগতকে, অন্য কোনো ভালো নামের অভাবে, বলতে পারি কল্পনা ও চিন্তার জগত। ইচ্ছে করলে আমি বাস্তব কাজ করতে পারি, এটা কঠিন নয় আমার জন্যে; কতো তুচ্ছ মানুষ পৃথিবীতে, বিশেষ ক'রে বাঙলাদেশে, কতো উচ্চ উচ্চ বাস্তব কাজ করছে, সমাজরাষ্ট্র ভাঙছে, গড়ছে, রাষ্ট্রকে চিৎ করছে, সমাজকে উপুড় করছে, কাৎ করছে, গর্ভবতী করছে, প্রচণ্ড বাস্তব কাজ ক'রে অমর হচ্ছে, আমি

তার দু-একটি করতে পারতাম না তা নয়; তবে আমার মনে হয় সব কাজের মধ্যে সহজ হচ্ছে বাস্তব কাজ, আর কঠিন অবাস্তব কাজ। বছরের পর বছর ধ'রে আমরা যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু কারো পক্ষে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ'রে স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। আজ দল বেঁধে নেমে সারা শহর পুড়িয়ে দিতে পারি, অতোটা নিষ্ঠুর না হয়ে শহরকে সারাদিন ধ'রে বিকল ক'রে রাখতে পারি, কিন্তু আমরা দল বেঁধে এক হাজার উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে উঠতে পারি না। কবিতার কথা ছেড়েই দিই, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে গরু সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে দিলে তাঁরা হয়তো তা লিখে উঠতে পারবেন না, কিন্তু হেলিকপ্টারে সারা দেশ ঘুরে দশখানা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রের কাছে কবিতার কোনো মূল্য নেই—রাষ্ট্র কোথাও কবির জন্যে কোনো পদ রাখে না, কিন্তু দশতলা দালান খুবই মূল্যবান; তবে একটি দশতলা দালানের মালিক হওয়ার থেকে অনেক কঠিন 'অবসরের গান' লেখা। জীবনানন্দ অবশ্য ওই কবিতাটির বদলে একটি একতলা দালান বানাতে পারলে ট্রামলাইনের পাশে একটু সাবধানে হাঁটতেন। তবে জীবনানন্দ ছাড়া কেউ ওই কবিতাটি লিখতে পারতেন না; দশতলার মালিক অনেকেই হ'তে পারেন, যাঁদের ঠিক যোগাযোগটি আছে, কিন্তু কোনো যোগাযোগের ফলেই ওটি লেখা সম্ভব নয়। কে মূল্যবান—জীবনানন্দ না রাষ্ট্রপতি? আমি আনন্দ পাই কল্পনায় এবং চিন্তায়; কল্পনা ও চিন্তায় আমি জীবনের বড়ো অংশ ব্যয় করেছি—আনন্দে। আমি দশতলা আর পাজেরো করতে পারতাম, ফুলের মালায় নিজের গলদেশও ভ'রে তুলে অমর হ'তে পারতাম; আমি কি পারতাম না?—কিন্তু ওইসব আমাকে আনন্দ দেয় না, আনন্দ পাই আমি কল্পনা ও চিন্তায়, যাতে সমাজরাষ্ট্রের কোনো দরকার নেই। এই আনন্দ ইন্দ্রিয়ের সুখের থেকে অনেক ভিন্ন, উৎকৃষ্টও হয়তো, কিন্তু তা আমি বলতে চাই না, আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি কখনোই নিন্দিত করতে চাই না। ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি ভালোবাসি, যেমন ভালোবাসি আমার মগজকে, যা আমি দেখি নি, যার ক্রিয়াকলাপ বুঝি না আমি, যা আমার কাছে কিংবদন্তির মতো।

তবে সব কিছুই নিরর্থক, জগত পরিপূর্ণ নিরর্থকতায়; রবীন্দ্রনাথও নিরর্থক, আইনস্টাইনও নিরর্থক; ওই গোলাপও নিরর্থক, ভোরের শিশিরও নিরর্থক; তরুণীর চুম্বনও নিরর্থক, দীর্ঘ সুখকর সঙ্গমও নিরর্থক, রাষ্ট্রপতিও নিরর্থক। কেননা সব কিছুরই পরিণতি বিনাশ। বিস্ময়কর বিশ্ব, রঙিন ফুল বা মানুষ বা বন্যশুয়োর, সূর্য বা নক্ষত্র, গ্রহউপগ্রহ সব কিছুর জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছে তাদের পরিণতি—বিনাশ, যার থেকে কোনো উদ্ধার নেই। এ-মহানিরর্থকতায় ভয় পেয়ে কতোগুলো শিশুতোষ রূপকথা তৈরি করতে পারি আমরা, যেমন তৈরি করেছি ধর্মের রূপকথা, তৈরি করেছি স্রষ্টা, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ আর নরক। এ হচ্ছে তাৎপর্যহীন জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার স্থূলতম প্রয়াস। জীবনের তাৎপর্যহীনতা ভাবুক মানুষকে পাগল ক'রে তুলতে পারে, তাই বিচিত্র ধরনের ভাবুক চেষ্টা

করেছে একে বিচিত্ররূপে তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তুলতে; ধর্ম একে তাৎপর্যপূর্ণ করতে চেয়েছে সবচেয়ে নিকৃষ্টরূপে, এবং একে আরো নিরর্থক ক'রে তুলেছে। এই যে আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থেকে সুখ পাচ্ছি, আমি ম'রে যাবো, এই হাস্যকর নিরর্থকতাকে কীভাবে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলতে পারি আমি? আমার জীবনকে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলার কোনো পূর্বনির্ধারিত উপায় নেই, কোনো পবিত্র বা অপবিত্র বই বা কোনো মহাপুরুষ বা প্রবর্তক আমাকে পথ দেখাতে পারেন না। তাঁরা খুঁজেছেন নিজেদের পথ, নিজেদের জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার পথ; আমি তাঁদের পথে চলতে পারি না, আমি খুঁজতে চাই আমার পথ, নিজের জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের। বেশ আগে একটি কবিতা লিখেছিলাম, নাম 'ব্যাধিকে রূপান্তরিত করছি মুক্তোয়'। কবিতাটির কথা আমার মনে পড়ে; কবিতাটি একবার পড়তে চাই :

> একপাশে শূন্যতার খোলা, অন্য পাশে মৃত্যুর ঢাকনা,
> প'ড়ে আছে কালো জলে নিরর্থ ঝিনুক।
> অন্ধ ঝিনুকের মধ্যে অনিচ্ছায় ঢুকে গেছি রক্তমাংসময়
> আপাদমস্তক বন্দী ব্যাধিবীজ। তাৎপর্য নেই কোনো দিকে—
> না জলে না দেয়ালে—তাৎপর্যহীন অভ্যন্তরে ক্রমশ উঠছি বেড়ে
> শোণিতপ্লাবিত ব্যাধি। কখনো হল্লা ক'রে হাঙ্গরকুমিরসহ
> ঠেলে আসে হলদে পুঁজ, ছুটে আসে মরা রক্তের তুফান।
> আকস্মিক অগ্নি ঢেলে ধেয়ে আসে কালো বজ্রপাত।
> যেহেতু কিছুই নেই করণীয় ব্যাধিরূপে বেড়ে ওঠা ছাড়া,
> নিজেকে-ব্যাধিকে-যাদুরসায়নে রূপান্তরিত করছি শিল্পে—
> একরত্তি নিটোল মুক্তোয়!

ঝিনুক ও মুক্তোর রূপকে জীবনের তাৎপর্যশূন্যতার মর্মান্তিক সৌন্দর্য উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম কবিতাটিতে। মুক্তো সুন্দর, প্রিয়, মূল্যবান; কিন্তু ঝিনুকের জন্যে তা ব্যাধি, ঝিনুক তার ব্যাধিকে এমন রূপ দেয় যা মানুষের কাছে মুক্তো। এই মহাজগত এক বিশাল ঝিনুক, যার দুটি ঢাকনার একটি শূন্যতা, অন্যটি মৃত্যু; কোথাও কোনো তাৎপর্য নেই; ওই ঝিনুকের মধ্যে রোগবীজাণুর মতো ঢুকে গেছি আমি। আমরা সবাই। আমি কী করতে পারি ওই নিরর্থক শূন্যতায়? পারি শুধু ব্যাধিরূপে বেড়ে উঠতে, ব্যাধিতে বিশ্ব ভ'রে দিতে; কিন্তু আমি তা করছি না, ব্যাধিকে ঝিনুকের ব্যাধির মতো রূপান্তরিত করছি শিল্পকলায়। এ হচ্ছে চূড়ান্ত অর্থহীনতাকে অর্থপূর্ণ করার এক সুন্দর ব্যর্থ করুণ প্রয়াস।

এ-প্রয়াস সুন্দর, কিন্তু ব্যর্থ; এতে কি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে জীবন? মনে পড়ে আলবেয়ার কামু ও তাঁর অ্যাবসার্ড বা নিরর্থকতাকে। আমি পুরাণ থেকে অনেক দূরে, পৌরাণিক উপাখ্যান ও চরিত্রগুলো আমার ভেতর ঢোকে না; পুরাণ আমার কাছে আদিম বিশ্বাস মনে হয় ব'লেই হয়তো, কিন্তু কামু বেছে নিয়েছিলেন গ্রিসীয় পুরাণের সিসিফাসকে। রাজা সিসিফাস মানুষ, নিয়তিদণ্ডিত, কিন্তু সে

নিয়তিকে মানতে রাজি হয় নি, দাঁড়াতে চেয়েছে মূর্খ বর্বর অন্ধ অসুন্দর নিয়তির মুখোমুখি। স্বৈরাচারী দেবতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে চায় নি; কিন্তু দেবতারা নিষ্ঠুর শক্তিধর প্রতিশোধস্পৃহ, তারা সিসিফাসকে বাধ্য করে একটি বিশাল পাথরখণ্ডকে ঠেলে ঠেলে পাহাড়ের চুড়োয় উঠোতে, কিন্তু উঠোনোর পরেই ওই পাথর গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের পাদদেশে, আবার সেটি ঠেলে ঠেলে উঠোতে হয় সিসিফাসকে। অনন্তকাল ধ'রে সে এই নিরর্থক পীড়াদায়ক দণ্ডে দণ্ডিত। একই ক্লান্তিকর কাজ সে ক'রে চলে চিরকাল, তার জীবন একই নিরর্থক পুনরাবৃত্তির সমষ্টি। আমরা এই নিরর্থক পুনরাবৃত্তি থেকে একটুও এগোই নি, কামু বলেছেন, আমাদের জীবন একই রোববারের পর সোমবার, সোমবারের পর মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের পর বুধবারের, একই নিরর্থকতার পুনরাবৃত্তি। এই নিরর্থকতার মুখোমুখি কীভাবে দাঁড়াতে পারি? কামুর মতে একটিই সত্যিকার দার্শনিক সমস্যা রয়েছে, তা হচ্ছে আত্মহত্যা। জীবনের এই মহানিরর্থকতায় মানুষ একটি কাজই করতে পারে, তা হচ্ছে আত্মহত্যা। জীবন কি যাপন করার উপযুক্ত? বেঁচে থাকার কি কোনো মানে হয়? কোনো অর্থ কি আছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' লেখার, বা মহাকাশে নভোযান পাঠানোর, বা নারীর নগ্ন স্তনে চুম্বনের, বা জন্মদানের?

বহু মানুষ বিশ্বাস করে বিধাতায়, পোষণ করে ধর্মীয় বিশ্বাস; তবে বিধাতা বা ধর্মীয় বিশ্বাস, যা মানুষের আদিম কল্পনার ফল, তা কোনো সাহায্য করতে পারে না, তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তুলতে পারে না জীবনকে; বরং জীবনকে ক'রে তোলে মিথ্যায় পূর্ণ। নির্বোধ/অন্ধ/লোভী/কপট/ভীতরাই শুধু তাতে শান্তি পেতে পারে, ভাবতে পারে নিজেদের জীবনকে অর্থপূর্ণ ব'লে, কেননা পরলোকে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে একটি দুর্দান্ত কামনাঘন বিলাসপূর্ণ জীবন; কিন্তু তা হাস্যকর। বিধাতা বা ধর্মের কাছে হাত পাততে পারি না আমরা, যদিও এগুলো প্রচণ্ডভাবে চলছে, তবে ওগুলোর প্রতারণার সময় শেষ হয়ে গেছে; ওগুলো মানুষকে কিছু দেয় নি, কিছু দিতে পারে না, বরং তার জীবনকে করে তুলেছে আরো নিরর্থক। কামুর ধারণা আমরা বাস করি অ্যাবসার্ড বা নিরর্থকতার কালে; ওই নিরর্থকতা আমাদের আক্রমণ করতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে, রাস্তার যে-কোনো মোড়ে, যে-কোনো গলিতে; তখন নিজের কাছে নিজেকেই মনে হয় অচেনা, বহিরস্থিত। মানুষের প্রশ্নের শেষ নেই, হাজার হাজার প্রশ্ন তার, সেগুলোর কোনো উত্তর নেই; মানুষ চায় সমাধান, কিন্তু সমাধান চাইতে গিয়েই মানুষ জাগিয়ে তোলে নিরর্থকতা। মানুষ যখন জীবনের অর্থ খুঁজতে চায়, বুঝতে চায় জীবনের অর্থ কী, তখন সে মুখোমুখি হয় নিরর্থকতার। জীবনের কোনো অর্থ নেই, কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই; সুধীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, তার সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া।

মানুষ অভিনয় ক'রে যেতে থাকে, কিন্তু একদিন মঞ্চ ভেঙে পড়ে। জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কামু এভাবে : 'জাগরণ, গাড়ি, চার ঘণ্টা কাজ, আহার, নিদ্রা, এবং সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, এবং শনিবার একই তালে পুনরাবৃত্ত—এই পথেই চলা অধিকাংশ সময়। কিন্তু একদিন দেখা দেয় 'কেন'।' তখন সব কিছু মনে হ'তে থাকে অ্যাবসার্ড, নিরর্থক। এই নিরর্থকতার উদ্ভব ঘটে আমাদের চৈতন্য ও বিশ্বের মধ্যে যখন ঘটে সংঘর্ষ। মানুষ, কামু মনে করেন, এই নিরর্থকতাকে এড়াতে পারে না যতোদিন সে বেঁচে থাকে; তাই, তাঁর মতে, অস্তিত্ব হচ্ছে 'চূড়ান্ত আশাহীনতা'। মানুষ এই নিরর্থকতাকে অতিক্রম করার কোনো উপায় দেখে না, কেননা বেঁচে থাকাই হচ্ছে নিরর্থকতা। সুধীন্দ্রনাথ এ-পরিস্থিতির কথাই বলেছিলেন 'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুবসখা/যাতনা কেবল যাতনা সুচির সাথী'র হাহাকারে। এই নিরর্থকতা থেকে মুক্তির এক উপায় মৃত্যু; মৃত্যু পারে নিরর্থকতার সমাপ্তি ঘটাতে। তাই আত্মহত্যা একটি উপায় নিরর্থকতা থেকে মুক্তির। তাহ'লে কি আমরা আত্মহত্যা করবো? কামু, এবং সবাই, বলবেন, না; আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, আত্মহত্যা ক'রে নিরর্থক জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করা সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কোনো কোনো মুহূর্ত আসে, যা তাকে আত্মহত্যা করার প্ররোচনা দেয়; কিন্তু সবাই আত্মহত্যা করে না, শুধু তারাই আত্মহত্যা করে বা সফল হয় আত্মহত্যায়, যারা হঠাৎ জেগে ওঠা নিরর্থক প্ররোচনা কাটাতে পারে না, যেমন পারে নি জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন'-এর তরুণ, যার জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলো উটের গ্রীবার মতো এক নিস্তব্ধতা। আমি কয়েকবার আত্মহত্যাকে সমাধান হিশেবে বিবেচনা করেছি, এবং বাতিল করেছি; একবার একটি কবিতা লিখেছি 'ছাদআরোহীর কাসিদা' নামে। রবীন্দ্রনাথ কি কখনো আত্মহত্যার কথা ভেবেছেন? অবশ্যই ভেবেছেন; তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগুলোতে এর নানা দাগ দেখতে পাই। আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, এটা একটি আস্তিত্বিক পাপ। মানুষ তার নিজের ইচ্ছায় মরবে না, বেছে নেবে না স্বেচ্ছামৃত্যু; মানুষকে মরতে হবে মিটমাট না ক'রে। জীবন, আমাদের সুন্দর জীবন, তার কোনো অর্থ নেই, অর্থের দরকার নেই; জীবনের অর্থ হচ্ছে জীবন, জীবনের অন্য অর্থ নেই ব'লেই জীবন সুন্দর। কোনো পূর্বনির্ধারিত পথ নেই মানুষের জন্যে; কোনো গ্রন্থ পথ দেখাতে পারে না তাকে, কোনো মহাপুরুষ বা প্রবর্তক তার জন্যে পথ প্রস্তুত করতে পারেন না; ওই মহাপুরুষেরা তৈরি করেছেন নিজেদের পথ, অন্যদের নয়। প্রত্যেককে খুঁজে বের করতে হয় নিজের পথ, তৈরি করতে হয় নিজের রাস্তা। অনেকের পথ আমাকে আলোড়িত করেছে, অনেক গ্রন্থ আমাকে আলো দিয়েছে; কিন্তু আমি ওইসব পথে চলি নি, ওই আলোতে পথ দেখি নি।

আশা। আমরা কি আশা করবো? আশা খুব প্রশংসিত, আশার প্রশংসায় পৃথিবী পঞ্চমুখ, কিন্তু আশার কিছু নেই পৃথিবীতে, আশা করার স্থান নয় জীবন।

স্থূল জীবন যাপনের জন্যে স্থূল ছোটো ছোটো আশা আমরা ক'রে থাকি, ভুলে থাকি জীবনের বিশাল আশাহীনতাকে; কিন্তু যদি আশা করি যে জীবনের নিরর্থকতাকে অতিক্রম করতে পারবো, তাহলে জীবনকে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলি না, বরং আত্মহত্যা করি দার্শনিকভাবে। আশার প্রলোভনে ভুললে কারো পক্ষে সৎ থাকা সম্ভব নয়, তখন সে পরিবৃত হয় মিথ্যা দিয়ে। কামুর অ্যাবসার্ড নায়ক সিসিফাসের মতো আমরাও ঘেন্না করি মৃত্যুকে, ভালোবাসি জীবনকে, মৃত্যুকেই বরণ করতে হবে অবশেষে, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করতেই হবে। মৃত্যু ছাড়া আর কিছু সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিত নই। আমরা ভয় পাই ওই চরম অন্ধকারকে; রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে,—যখন রোম্যান্টিকের চোখে দেখেছেন তখন প্রেমে পড়েছেন মৃত্যুর, কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন সত্যিই মৃত্যু হানা দিতে থাকে তিনি ভয় পেতে থাকেন, তাঁর কবিতা মৃত্যুর ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সিসিফাস নিয়তিকে মেনে নেয় শুধু নিয়তিকে অস্বীকার করার জন্যে, সে কখনো অসৎ নয়; সততা দিয়ে সে একরকমে তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তোলে তার জীবনকে। ওই তাৎপর্য নিরর্থকতাকে লুপ্ত করতে পারে না, তবে অস্বীকার করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। আমরা নিরর্থকতার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি, কিন্তু তা মেনে না নিয়ে, আপন পথ খুঁজে, পথ তৈরি ক'রে সার্থক করতে পারি নিজেদের। কোনো সার্থকতাই অবশ্য সার্থকতা নয়, সব কিছুই পরিশেষে নিরর্থক; অর্থপূর্ণ শুধু দুই অন্ধকারের মাঝখানের হঠাৎ ঝলকানিটুকু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্বাসের জগত

পাঁচ হাজার বছর ধ'রে মানুষ জন্ম নিয়েই দেখছে তার জন্যে প্রাণপণে প্রস্তুত হয়ে আছে পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন বিশ্বাসের জগত। নিজের জন্যে কোনো বিশ্বাস খুঁজে বের করতে হচ্ছে না তাকে, জন্মেই দেখছে পরিবার ও সমাজ, কখনো কখনো রাষ্ট্র, তার জন্যে বিশ্বাস তৈরি ক'রে রেখেছে, মনে করছে ওইটি শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস, এবং তাকেও পোষণ করতে হবে ওই বিশ্বাস। মানুষ জন্ম নিচ্ছে, বেড়ে উঠছে পূর্বপ্রস্তুত বিশ্বাসের মধ্যে; তার জন্যে বিশ্বাসের জামাকাপড় শেলাই করা আছে, তার দায়িত্ব ওই জামাকাপড়ের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে শান্তি পাওয়া। বিশ্বাসী হওয়া প্রশংসিত ব্যাপার; প্রথাগতভাবে ভালো মানুষ, সৎ মানুষ, মহান মানুষ বলতেই বোঝায় বিশ্বাসী মানুষ। তারা কী বিশ্বাস করছে তা বিবেচনার বিষয় নয়, বিবেচনার বিষয় হচ্ছে তারা বিশ্বাস করছে; তাই তারা ভালো, সৎ, এমনকি মহৎ। পৃথিবী জুড়ে মানুষ গ'ড়ে তুলেছে বিচিত্র বিশ্বাসের জগত, বিশ্বাস দিয়ে তারা ভাগ ক'রে ফেলেছে বিশ্বকে, তারা কাউকে বিশ্বাসের জগতের বাইরে থাকতে দিতে রাজি নয়। একটা কিছু বিশ্বাস করতে হবে মানুষকে, বিশ্বাস না করা আপত্তিকর। আপনার পাশের লোকটি স্বস্তি বোধ করবে যদি জানতে পারে আপনি বিশ্বাস করেন, তার বিশ্বাসের সাথে আপনার বিশ্বাস মিলে গেলে তো চমৎকার; আর খুবই অস্বস্তি বোধ করবে, কোনো কোনো সমাজে আপনাকে মারাত্মক বিপদে ফেলবে, যদি সে জানতে পারে আপনি বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস কয়েক হাজার বছর ধ'রে দেখা দিয়েছে মহামারীরূপে; পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী মহামারীর নাম বিশ্বাস।

বিশ্বাস কাকে বলে? আমরা কি বলি আমি পিঁপড়েয় বিশ্বাস করি, সাপে বিশ্বাস করি, জলে বিশ্বাস করি, বা বজ্রপাতে, বা পদ্মানদীতে বিশ্বাস করি? এসব, এবং এমন বহু ব্যাপারে বিশ্বাসের কথা ওঠে না, কেননা এগুলো বাস্তব সত্য বা প্রমাণিত। যা সত্য, যা প্রমাণিত, যা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; কেউ আমরা বলি না যে আমি বিদ্যুতে বিশ্বাস করি বা রোদে বিশ্বাস করি বা গাড়িতে বিশ্বাস করি, কেননা সত্য বা প্রমাণিত ব্যাপারে বিশ্বাস করতে হয় না, বিশ্বাস করতে হয় অসত্য, অপ্রমাণিত, সন্দেহজনক বিষয়ে। অসত্য, অপ্রমাণিত, কল্পিত ব্যাপারে আস্থা পোষণই হচ্ছে বিশ্বাস। 'বিশ্বাস কর' ক্রিয়াটি নিশ্চয়তা বোঝায় না, বোঝায় সন্দেহ; আর এ-ক্রিয়ার সাথে অকর্তাপদে

দু-রকম বিভক্তি হয়, এবং বাক্যের অর্থ বিস্ময়করভাবে বদলে যায়। আমি বলতে পারি 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না।' এ-বাক্যে প্রথম ঈশ্বর অধিকরণ কারক, এতে বসেছে 'এ' বিভক্তি; আর দ্বিতীয় ঈশ্বর কর্মকারক, এতে বসেছে 'কে' বিভক্তি; এবং বাক্যটি বোঝাচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও আমি তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি। বাঙলায় কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্যে অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। বিশ্বাস নিশ্চয়তা বোঝায় না, সন্দেহই বেশি বোঝায়; তবে বিশ্বাসীদের স্বভাব ভাষার স্বভাবের বিপরীত;—ভাষা যেখানে বোঝায় অনিশ্চয়তা, বিশ্বাসীরা সেখানে বোঝেন নিশ্চয়তা। মানুষের বিশ্বাসের শেষ নেই, কোটি কোটি বিশ্বাস পোষণ করে মানুষ। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে এখন যেসব বিশ্বাস চলছে, সেগুলো চিরকাল ধ'রে চলছে; এখনকার বিশ্বাসগুলোর বয়স খুব বেশি নয়, এগুলোর আগে লাখ লাখ বিশ্বাসের উদ্ভব ও বিনাশ ঘটেছে; দেবতা বা ঈশ্বর বা বিধাতা বা কোনো বিশেষ স্রষ্টায় বিশ্বাস সেদিনের, চারপাঁচ হাজার বছরের, কথা; মানুষের বয়স তাদের বিভিন্ন ধরনের দেবতা বা বিধাতাদের বয়সের থেকে অনেক বেশি।

বিশ্বাসের সাথে অন্ধকারের সম্পর্ক গভীর, বিশ্বাস অন্ধকারের আত্মজ; আলোর সম্পর্ক তার কম বা নেই। অন্ধকারের কাজ হচ্ছে বস্তুকে অদৃশ্য করা, তার রূপরেখাকে রহস্যময় করা; আলোর কাজ তাকে দৃশ্যমান করা; অন্ধকার রহস্য সৃষ্টি করে, আলো ঘোচায় রহস্য। আলোকিত ঘরে রহস্য নেই, দিনের বেলা রহস্য নেই; কিন্তু অন্ধকার ঘর রহস্যে বোঝাই, রাত রহস্যে পূর্ণ। বিশ্বজগত মানুষের কাছে অন্ধকার ঘর বা রহস্যময় রাতের মতো, তার অধিকাংশ এলাকা মানুষের অজানা, আর যতোটুকু জানা, তাও সবাই জানতে চায় না, অন্ধকারই তাদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। বিশ্বজগতকে আলো জ্বেলে জানতে না চেয়ে মানুষ তাকে রহস্যে ভ'রে তুলেছে, তার রূপ বদলে দিয়েছে; এর ফলে ঘটেছে বিশ্বজগতের রহস্যীকরণ। বিশ্বাস হচ্ছে রহস্যীকরণপ্রবণতা, যা বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্য জানতে চায় না, বরং মিথ্যেকে আকর্ষণীয় ও শক্তিশালী ক'রে তুলতে চায়। রহস্যীকরণপ্রবণতা মিথ্যেকেই ক'রে তুলেছে সত্য; এজন্যে সত্য শব্দটি এখন বিভ্রান্ত করে আমাদের। বিশ্বাসের সম্পর্ক ইন্দ্রজালের সাথে, বিজ্ঞানের সাথে নয়; এখনো মানুষ ইন্দ্রজাল দিয়ে আক্রান্ত, অভিভূত; বিজ্ঞান দিয়ে আলোকিত নয়। মানুষ বিশ্বজগত সম্পর্কে খুব কম জানে, কিন্তু যতোটুকু জানে, তাও কম নয়; মানুষের জানার বিষয়গুলো বিচার করলে বিস্মিত না হয়ে পারি না। মানুষ তার কল্পিত দেবতাদের থেকে অনেক বেশি প্রতিভাবান, শক্তিমান, এবং জ্ঞানী; তবে অধিকাংশ মানুষ ওই জ্ঞান থেকে বহুদূরবর্তী। পুরোনো পৃথিবীর বহু বিস্ময়ের কথা শোনা যায়, পুরোনো পৃথিবীর মহাপুরুষেরা বহু বিস্ময়কর কাজ করেছেন ব'লে বহু রটনা প্রচলিত, কিন্তু পুরোনো মহাপুরুষেরা তুচ্ছ যাদুর বেশি কিছু করতে পারেন নি, প্রকৃত বিস্ময়কর কাজ করেছে আধুনিক মানুষ।

মানুষ যতো বিশ্বাস পোষণ করে, তার প্রথম প্রধান উৎস পরিবার; তারপর তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার সভ্যতা। মুসলমান পরিবারে জন্ম নিলে প্রথম ভেতরে ঢুকবে মুসলমানের বিশ্বাসগুলো, পাশের বাড়ির হিন্দু পরিবারে জন্ম নিলে প্রথম তার ভেতরে ঢুকতো হিন্দুর বিশ্বাসগুলো; খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নিলে ঢুকতো খ্রিস্টানের বিশ্বাসগুলো, ইহুদি পরিবারে জন্মালে ঢুকতো ইহুদিরগুলো। বিশ্বাস কারো ভেতরে থেকে সহজাতভাবে উঠে আসে না, বিশ্বাস সহজাত নয়; মানুষ নিজের ভেতর থেকে কোনো বিশ্বাস অনুভব করে না, বিশ্বাস পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রিক; পরিবার তাকে যে-বিশ্বাসগুলো দেয়, সেগুলোকেই সে পবিত্র শাশ্বত ধ্রুব মনে করে; ভয়ে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে, লোভে সে এগুলোকে জড়িয়ে ধরে। কোনো বিশ্বাস পবিত্র শাশ্বত ধ্রুব নয়, যদিও প্রত্যেকে তার বিশ্বাসকে তাই মনে করে। পবিত্র শব্দটিই নিরর্থক, এর কোনো সর্বজনীন তাৎপর্য নেই; একজনের কাছে যা পবিত্র আরেকজনের কাছে তা ঘৃণার বস্তু হ'তে পারে, সাধারণত হয়ে থাকে, যেমন উগ্র ধার্মিকের কাছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের সব কিছুই ঘৃণ্য। ধার্মিক হিন্দু মুসলমানের পবিত্র গৃহ পোড়াতে দ্বিধা করে না, ধার্মিক মুসলমান অবলীলায় পদদলিত করে হিন্দুর পবিত্র দেবদেবীমূর্তি; খ্রিস্টান-ইহুদিও নির্দ্বিধায় একই আচরণ করে। তাই পবিত্রতার বোধ সর্বজনীন নয়, পবিত্রতার বোধ উঠে আসে নিজের বিশ্বাস থেকে, ভয় থেকে। আসলেই পবিত্রতা নিরর্থক শব্দ : কোনো কিছু পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে, পবিত্র হতে পারে না, পবিত্রতার কোনো বাস্তব রূপ নেই। কোনো কিছুই শাশ্বত নয়; মানুষের কোনো কোনো বিশ্বাস একশো দুশো বা দু-তিন হাজার বছর ধ'রে চলছে, তাও অবিকল একইভাবে চলছে না, কিন্তু মানুষ ওগুলোকেই শাশ্বত বলে ভাবছে; মনে রাখছে না পৃথিবী থেকে বহু বিশ্বাস লোপ পেয়ে গেছে, যেগুলোকে এক সময় শাশ্বত মনে করা হতো, যেগুলো কয়েক হাজার বছর টিকে ছিলো। ধ্রুব নয় কোনো কিছু; যদিও বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসকে তাই মনে করে। ধ্রুব বলতে বুঝবো তা যা অবিচল একক একমাত্র সত্য; কিন্তু বিশ্বাসের কোনো শেষ নেই, এবং বিশ্বাসগুলো পরস্পরবিরোধী। এগুলোর একটি ধ্রুব হ'তে পারে, সবগুলো ধ্রুব হ'তে পারে না; কিন্তু এগুলোর প্রতিটিই এতো ত্রুটিপূর্ণ যে এগুলোর একটিকেও ধ্রুব মনে করতে পারি না।

বিশ্বের রহস্যীকরণে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে ধর্ম; এবং ধর্ম সব কিছুকে গ্রাস ক'রে মানবপ্রতিভার সব কিছুকে বাধ্য ও উৎসাহিত করেছে বিশ্বের রহস্যীকরণে অংশ নিতে। ধর্মপ্রবর্তকেরা, ও তাঁদের অনুসারীরা, বুঝেছেন যে দখল করতে হবে শক্তিকেন্দ্র; এবং শক্তিকেন্দ্র দখল করতে পারলে আর কিছুই তাঁদের বাহুর বাইরে থাকবে না। মানুষের প্রতিভার সব এলাকায় যেতে চাই না আমি, থাকতে চাই শিল্পকলা, বিশেষ ক'রে সাহিত্যে, এবং দেখতে পাই যে সাহিত্য বিশেষভাবেই অংশ নিয়েছে বিশ্বজগতের রহস্যীকরণে। সাহিত্য তাই

একটি সুন্দর অন্ধকারের এলাকা। চিত্রকলায়ও এটা খুবই ঘটেছে; হিন্দু ও খ্রিস্টান চিত্রকরেরা উৎসাহের সাথে, হয়তো আর্থ অনুপ্রেরণায় অনেকটা, রহস্যীকরণে যোগ দিয়ে বিশ্বকে ঢেকে দিয়েছেন রহস্যের আবরণে। দেবদেবী, মেরি ও ক্রাইস্টের অজস্র ছবি এঁকেছেন ও মূর্তি তৈরি করেছেন তাঁরা, যেগুলোর কোনো কোনোটি আমার প্রিয়; কিন্তু ওই সব মূর্তি ও ছবির সৌন্দর্যের থেকে বিশ্বাসীদের কাছে ওগুলো আকর্ষণীয় রহস্যীকরণের জন্যে, বিশ্ব সম্পর্কের মনে ভুল বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে, তাদের মনের ভুল বিশ্বাসকে গভীর ক'রে তোলার জন্যে। মুসলমানদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ, বিশেষ ক'রে স্রষ্টা ও প্রবর্তকের ছবি আঁকা আত্মহত্যার থেকেও শোচনীয় ব'লে মুসলমান চিত্রকরেরা এ থেকে বিরত রয়েছেন। সাহিত্য রহস্যীকরণে কাজ করেছে প্রবলভাবে, বিশ্বের গৌণ ও প্রধান লেখকেরা কবিতা, গান, উপাখ্যান ও সন্দর্ভে দলবেঁধে অংশ নিয়েছেন বিশ্বজগতের রহস্যীকরণে। তাই সাহিত্য প্রধানত অপবিশ্বাসের জগত; এখনো সাহিত্যে যে-প্রবণতা দেখতে পাই, তা অন্ধকারের প্রবণতা, ভুল ধারণা সৃষ্টির প্রবণতা। অজস্র বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সাহিত্য হয়ে আছে এক ভুলের বিশ্ব, যদিও তার সৌন্দর্য অশেষ। শুধু সত্যের নয়, মিথ্যেরও সুন্দর রূপ রয়েছে; অনেক সময় মিথ্যের রূপই বেশি সুন্দর সত্যের রূপের চেয়ে, তাই কবিরা ও নানা ধারার লেখকেরা অজস্র মিথ্যের সৃষ্টি করেছেন সুন্দর রূপ। মিথ্যেকেই তাঁরা বিশ্বাস করেছেন সত্য ব'লে।

বিশ্বের সাহিত্যের বড়ো অংশ দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর; অর্থাৎ যা অসত্য, অপ্রমাণিত, সন্দেহজনক, তার ওপর, পরিবার ও প্রথা থেকে পাওয়া বিশ্বাস কবিরা প্রকাশ করেছেন তীব্র আবেগে, তাকে করেছেন রূপময়; কিন্তু তার ভিত্তিটাকে সরিয়ে নিলে ওই আবেগ ও রূপ সম্পূর্ণ কাঠামোসহ ভেঙে পড়তে পারে, একদিন পড়বে। অধিকাংশ কবিই পরিবার ও সমাজ থেকে পাওয়া বিশ্বাস যাচাই করেন নি, যাচাই করার শক্তি নেই অনেকেরই, তাঁরা ভেসে গেছেন আবেগে। কবিতা ও গানের বিনোদক ভূমিকা রয়েছে, তাঁরা দেখেছেন যাচাই না ক'রে আবেগে ভেসে গেলে বিনোদনের কাজটি সম্পন্ন হয় আরো ভালোভাবে। জনগণ প্রাপ্ত বিশ্বাসে স্বস্তি পায়, ওই বিশ্বাসকে যখন কেউ প্রবল ক'রে তোলে তখন তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত উপভোগ্য, তখন তারা একই সাথে ভোগ করে শিল্পকলা ও বিশ্বাস। শিল্পকলার সৌন্দর্য অবশ্য অধিকাংশ মানুষই উপভোগ করতে পারে না, তারা উপভোগ করে তার ভেতরের মানবিক ও বিশ্বাসগত আবেগ, এবং কবিরা তা কাজে লাগিয়ে থাকেন। কবিতায় বিশ্বাস যতোটুকু থাকে ততোটুকু অকবিতা বিশ্বাসের বাইরে যতোটুকু থাকে ততোটুকু কবিতা; যুগে যুগে বিশ্বাস ভেঙে পড়ে, কিন্তু সৌন্দর্য অতো অল্প সময়ে ভেঙে পড়ে না। বিশ্বাসের কবিতা হচ্ছে ভুল কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো আবেগগত সৌন্দর্য।

রবীন্দ্রনাথকে মনে হয় বিশ্বাসের পরম রূপ; বিশ্বকে রহস্যীকরণের এক প্রধান ঐন্দ্রজালিক। তাঁর কবিতা ও গানে, এবং বহু প্রবন্ধে, পাই বিশ্বাসের কাঠামোর ওপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথ যে-বিশ্বাস পোষণ করেছেন, তা ভেতর থেকে উঠে আসে নি তাঁর; উঠে এসেছে পরিবার থেকে, এবং তাকে তিনি উপনিষদের বহু সুন্দর মিথ্যেয় সাজিয়েছেন জীবন ভ'রে। তিনি বিশ্বাস করতেন এক পরমসত্তায়, ওটা তাঁর নিজের উপলব্ধি নয়, পরের উপলব্ধি; তাঁর পিতা বহুদেবতাবাদী ধর্ম ছেড়ে একদেবতাবাদী পরমসত্তায় বিশ্বাস না আনলে, তাঁর পরিবার ওই একক পরমসত্তার স্তবে মুখর না হ'লে তিনিও থেকে যেতেন বহুদেবতাবাদী। রবীন্দ্রনাথের পরমসত্তায় বিশ্বাসের সাথে প্রথাগত ধর্মের বিশেষ মিল নেই; তাঁর বিশ্বাসের প্রথাগত ধর্মের স্বর্গনরক নেই, আবশ্যিক আরাধনা নেই, তাঁর পরমসত্তা সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে নেই। তিনি পরমসত্তার সাথে পাতিয়েছিলেন এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যা অনেকটা প্রবল শক্তিমান প্রেমিকের সাথে আবেগকাতর অসহায় প্রেমিকার সম্পর্কের মতো, তাঁর পরমসত্তা অনেকটা ধর্ষকামী—যে সুখ পায় পীড়ন ক'রে, তার পীড়ন মধুময়, আর তিনি নিজে অনেকটাই মর্ষকামী—যিনি সুখ পান পীড়িত হয়ে, পরমসত্তার পীড়নে দলিত দ্রাক্ষার মতো তাঁর ভেতর থেকে মধু উৎসারিত হয়। সম্পর্কটি অনেকখানি হৃদয়গত ও শারীরিক। বিশ্বজগতের রহস্যীকরণের কাজ রবীন্দ্রনাথ করেছেন বিচিত্ররূপে; এবং এ-কাজে তিনি একটি শব্দ বারবার ব্যবহার করেছেন, শব্দটি হচ্ছে *সত্য*। বিশ্ব রহস্যীকরণে তাঁর চাবিশব্দ *সত্য*, যখনই তিনি তাঁর বুঝতে-না-পারা পরম উপলব্ধি বা বিশ্বাসের কথা বলতে চেয়েছেন, যা সম্পর্কে তাঁর নিজেরই ধারণা অস্বচ্ছ, তখনই তিনি ব্যবহার করেছেন এ-শব্দটি; এবং অনুরাগীরা এক সুখকর বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করার স্বাদ পেয়েছেন। 'সত্য যে কঠিন,/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' বা 'সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে' ইত্যাদি উক্তিতে কবিতা কম, বিভ্রান্তি বিপুল; তবে রহস্যীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, *সত্য* একরকম অলৌকিক সামগ্রী এ-বোধ তৈরি হয়েছে চমৎকারভাবে।

সত্য শব্দটি রহস্যীকরণের কাজে তিনি কতোভাবে ব্যবহার করেছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ দিই ধর্ম বইটির একটি প্রবন্ধ থেকে :

১ সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন (উৎসব, *ধর্ম*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৩, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, ৩৩৫)।

২ বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না (উৎসব, ওই, ৩৩৫)।

৩ মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ (উৎসব, ওই, ৩৩৫)।

৪ আমরা সত্যকে যে-পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্যে সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি (উৎসব, ওই, ৩৩৬)।

৫ সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আর্বিভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় (উৎসব, ওই, ৩৩৬)।

৬ তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ (উৎসব, ওই, ৩৩৭)।

সত্য শব্দটি উদ্ধৃতিগুলোতে নিরর্থক, যদিও রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় শব্দ এটি, শব্দটি সুস্পষ্ট কোনো বোধ প্রকাশ না ক'রে করছে রহস্যীকরণ; আর শেষ উদ্ধৃতির বক্তব্য তাঁর নিজেরও নয়, যদিও এটি তাঁর খুবই প্রিয়, জীবনে বহুবার নানা রূপে এটি প্রকাশ করেছেন তিনি; কীটসের বিখ্যাত 'Beauty is truth, truth beauty'-কে একটু রূপান্তরিত করেছেন, 'সুন্দর' বা 'সৌন্দর্য'-এর বদলে ব্যবহার করেছেন 'আনন্দ'; বলতে পারতেন 'আনন্দই সত্য, সত্যই আনন্দ'; কিন্তু দুটিকে অভিন্ন না ক'রে করেছেন পরস্পরের উৎস। রহস্যীকরণের কাজ তিনি অজস্ররূপে করেছেন বাস্তবকে বাস্তবরূপে, পরিচিত মূর্ত বস্তুকে মূর্ত বস্তুরূপে না দেখে রহস্যের প্রকাশরূপে দেখতেই তাঁর ভালো লাগতো। *শান্তিনিকেতন* বইটির প্রথম প্রবন্ধের প্রথম পংক্তিতেই পাই :

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকাল বেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা এক মুহূর্তেই ভেঙে যায় ('উত্তিষ্ঠত জাগ্রত', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৩, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭, ৪৪৯)।

বেশ ভালো পড়তে, একটুখানি অপার্থিব আবেগেও আক্রান্ত হই, মনে হয় বেশ একটা রমণীয় রহস্যালোকের মধ্যে প'ড়ে আছি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সকাল বেলার ওই আলো 'ঈশ্বরের আলো' কেনো? এ-আলো হ'তে পারতো শুধুই 'আলো', বা 'সূর্যের আলো'; 'ঈশ্বরের আলো' বলার সাথে সাথে আমাদের পরিচিত রোদ রহস্যময় বস্তুতে পরিণত হয়, রহস্যীকরণ ঘটতে থাকে দিকে দিকে। সূর্যের আলোকে তিনি সূর্যের আলো ব'লে মানতে পারেন না, তাঁর মন ভ'রে ওঠে না হয়তো, তিনি ওই আলোতে তাঁর বিশ্বাসের ছোঁয়া চান, বস্তুজগতকে রঙিন রহস্যময় ক'রে তুলতে চান তাঁর বিশ্বাস দিয়ে। এমন কাজ পৃথিবী জুড়েই করেছেন বিশ্বাসীরা, যাঁদের অনেকে ভুগেছেন বিশ্বাসের প্রচণ্ড দুরারোগ্য উন্মত্ততায়, যেমন ভুগেছেন অনেক অতীন্দ্রিয় উন্মাদ, বা উইলিয়ম ব্লেইক, যাঁর কাছে ভোরের তরুণ অরুণকে অরুণ মনে হয় নি, মনে হয়েছে দেবদূতরা দলে দলে স্তব করছে পরমেশ্বরের। আমরা জানি সূর্যের আলো ঈশ্বরের আলো নয়, এটা নিরন্তর জ্বলন্ত গ্যাসের কাজ, আর ভোরের সূর্যে দেবদূতরাও স্তবগান করে না, ওই ঈশ্বর আর তাঁর দেবদূতরা অবাস্তব অলীক কল্পনামাত্র। পুরোনো প্যালেস্টাইন বা পুরোনো ভারতের সত্যদ্রষ্টারা আজ হঠাৎ এসে টেলিভিশন, বিমান, নিয়ন আলো দেখলে এগুলোও তাঁদের মনে হবে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ; এবং অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা ক'রে ফেলবেন নানা রকমের বেদ ও সংহিতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যেগুলোকে বলেছেন 'পূজা', সেগুলোতে বিশ্বজগতের রহস্যীকরণপ্রক্রিয়া নিয়েছে চূড়ান্ত রূপ; ধর্মপ্রবর্তক বা প্রচারকের মতো তিনি কাজ

করেন নি, কবি তিনি এবং তাঁদের থেকে বহু দূরবর্তী, তাঁদের মতো তাঁর হাতে শেকল নেই, মানুষ বন্দী করার জন্যে তিনি বেরিয়ে পড়েন নি, মানুষকে তিনি করতে চেয়েছেন মুক্ত, কিন্তু অলীক পরমসত্তায় বিশ্বাস আলোবাতাসের মতো এগুলোতে কাজ ক'রে চলছে। এগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর; এগুলো উপভোগ করার জন্যে বেশ খানিকটা বিশ্বাস দরকার। তবে বিশ্বাস করেন না যাঁরা, পরমসত্তা যাঁদের কাছে হাস্যকর, তাঁরা এগুলো কীভাবে উপভোগ করেন, বা আদৌ কি উপভোগ করেন? রবীন্দ্রনাথের প্রভু বা পরমসত্তায় বিশ্বাস হাস্যকর আমার কাছে, তবে আমি উপভোগ করি এগুলো; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেনো উপভোগ করি? এমন হ'তে পারে আমি এখনো রহস্যীকরণপ্রক্রিয়ার শিকার হয়ে আছি, নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারি নি তার প্রভাব থেকে, তবে বোধ করি এগুলো উপভোগ করি আমি এগুলোর তীব্র আবেগ, মানবিক অনুভূতির অতুলনীয়তা, অসাধারণ সৌন্দর্য, পার্থিব চিত্রের পর চিত্র, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতির জন্যে। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা, আবেগতীব্রতা ও রূপময়তার জন্যে মাঝেমাঝে যা বিশ্বাস করি না, তাও আমাকে অভিভূত করে, শিউরে দেয়। তাঁর পরমসত্তা অবশ্য সুধীন্দ্রনাথকথিত 'ইহুদির হিংস্র ভগবান' নয়, চণ্ডরোষে ধেয়ে আসার জন্যে সে উদ্যত হয়ে নেই; তাঁর পরমসত্তা পরম প্রেমিক, সুন্দর, প্রিয়তমের মতো কখনো কখনো সুখকররূপে নিষ্ঠুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরমসত্তাকে শুধু দয়াময় প্রেমিক হিশেবেই দেখতে পছন্দ করতেন না, নিষ্ঠুরতাও চাইতেন তাঁর কাছে, তা অবশ্যই মোহন নিষ্ঠুরতা। তিনি সব কিছু পরিবৃত দেখতেন পরমসত্তার অস্তিত্ব দিয়ে। তা যেমন হতে পারে এমন প্রাত্যহিক : 'যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,/সবারে আমি নমি।/যে-কেহ মোরে দিয়েছে দুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,/ সবারে আমি নমি।', বা তা হ'তে পারে এমন মহাজাগতিক : 'তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।' প্রাকৃতিক সব কিছুতে তিনি দেখছেন পরমসত্তার স্পর্শ :

সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ ॥

এ হচ্ছে রহস্যীকরণ, সূর্য গ্রহ চাঁদ কারো আশীর্বাদ নয়, এগুলো এক বিশাল মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফল (এর স্থূল রূপও পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পসুন্দর স্তব নজরুলের হাতে হয়ে উঠেছে এমন স্থূল : এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি/(খোদা) তোমার মেহেরবানি)। *পুরোনো বাইবেল*-এর 'গীতসংহিতা'র ১৯-সংখ্যক সঙ্গীতের শুরুর দুই পংক্তি এমন :

আকাশমণ্ডল প্রচার করে ঈশ্বরের গৌরব,
আর ভূলোক প্রকাশ করে তাঁর হস্তকর্ম।

রাজা ডেভিড বা অন্য কেউ যিনি এ-গান লিখেছিলেন, তাঁর কাছে আকাশমণ্ডলকে খুবই বিশুদ্ধ পবিত্র ব্যাপার মনে হয়েছিলো, যা চারপাশের মাটি পাথর জলের জগত থেকে অনেক পরিশুদ্ধ। ওই গীতরচয়িতা আকাশমণ্ডল দেখে

বিস্মিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি যেমন সূর্য কী নক্ষত্র কী বোঝেন নি, তেমনি তাদের অকল্পনীয় বিশালত্ব সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা ছিলো না। তাঁর কাছে সূর্য আর নক্ষত্র ছিলো ভিন্ন ব্যাপার, এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র; মহাকাল ও মহাজগতের অনন্ততা ও বিশালত্ব বুঝি আমরা, তিন হাজার বছর আগের মানুষের মহাজগত মহাকালের অনন্ততা অসীমতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না, ধারণা করার শক্তিও দেখা দেয় নি। তাঁর বিস্ময়ের পর তিন হাজার বছর কেটে গেছে, বহু কিছুর সাথে চাঁদ তারা সূর্যও হারিয়েছে মহিমা; আমরা এখন জানি ওগুলো কী। আকাশমণ্ডল কোনো বিশুদ্ধ পবিত্র স্থান নয়, তার সদস্যরাও কারো গৌরব প্রকাশ বা প্রচার করে না; এবং আমরা, আমাদের পৃথিবীও আকাশমণ্ডলেরই সদস্য, আমরাও ভ্রমণ ক'রে চলছি সূর্যের চারদিকে—মহাজগতে। হ্বেইনবার্গ, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও *প্রথম তিন মিনিট* ও *চূড়ান্ত তত্ত্বের স্বপ্ন*-এর লেখক, বলেছেন, 'আমাদের চারপাশের পাথরগুলো যতোটুকু ঈশ্বরের গৌরব প্রচার করে নক্ষত্রগুলো তার থেকে একটুও কম বা একটুও বেশি প্রচার করে না ঈশ্বরের গৌরব।' এগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ঈশ্বরের, কোনো দেবতার; আর সূর্য গ্রহ চাঁদ আলো বাতাস মেঘ বৃষ্টি কোনো প্রভুর আশীর্বাদ নয়। কিন্তু বাইবেলের গীতিকার ও একালের সঙ্গীতকার লিখেছেন একই গান, যা সুন্দর লাগে, কিন্তু মহাজগতের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে না; সব কিছুকে ঢেকে দেয় রহস্যে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথাগত বিশ্বাসী ছিলেন না, প্রথাগত গ্রন্থনির্ভর ধার্মিকদের মতো তিনি নিশ্চিত ছিলেন না চরম পরিণতি সম্পর্কে। যদিও মৃত্যুই চরম পরিণতি, তিনি জানতেন, তবু আরো কিছু আশা তাঁর ছিলো; সন্দেহও ছিলো। যা তিনি এতো আদর্শায়িত ক'রে দেখেছেন, তা মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাওয়ার মতো এতোই নিরর্থক, এটা ভাবা কষ্টকর ছিলো তাঁর কাছে। একটি ব্যাকুল গানে তিনি প্রশ্ন করেছেন :

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে?

এর কাতরতা আমাকে মুগ্ধ করে, সুর আলোড়িত করে; কিন্তু এমন প্রশ্ন আমি করবো না। মোহগ্রস্ত নই আমি, আমি সৎ থাকতে চাই, সিসিফাসের মতো মেনে নিতে চাই জীবনের নিরর্থকতা, এবং অস্বীকারও করতে চাই নিরর্থকতাকে। কিছুতেই বিভ্রান্ত হ'তে চাই না, মোহের কাছে সমর্পণ করতে চাই না নিজেকে; আমি জানি পথের শেষ মৃত্যুতে, সব কামনা ও সাধনার শেষে রয়েছে নির্বিকার মাটি ও ক্ষুধার্ত আগুন, কিন্তু আমি ভেঙে পড়তে চাই না। রূপময় জীবনের শেষে মানুষের এই পরিণতিকে এক অপূর্ব কবিতায় পরিণত করেছিলেন জীবনানন্দ। মৃত্যুর আগে তো আমরা অজস্র রূপ আর রসের ভেতর দিয়ে চলেছি; নির্জন খড়ের মাঠে পৌষের সন্ধ্যায় আমরা হেঁটেছি, মাঠের পারে দেখেছি কুয়াশার ফুল ছড়িয়ে চলছে নদীর নরম নারী; দেখেছি অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল জোনাকিতে

ভ'রে গেছে, দেখেছি বুনোহাঁস গুলির আঘাত এড়ায়ে উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভেতরে, আলো আর বুলবুলিকে খেলা করতে দেখেছি হিজলের জানালায়, আমরা দেখেছি প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ। কিন্তু এই রূপময় জীবনের পরে কী, আর কী বুঝতে চাই আমরা? জীবনানন্দ হাহাকার ক'রে ওঠেন নি, মেনে নিয়েছেন সুন্দর নিরর্থকতাকে :

> আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
> সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে
> ধূসর মৃত্যুর মুখ;—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
> নিরুত্তর শান্তি পায়;—যেন কোন্, মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
> কি বুঝিতে চাই আর?... রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক
> শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!

রবীন্দ্রনাথে শুনতে পাই 'এত কামনা'র হাহাকার, জীবনানন্দে কামনা আরো রূপময়—সব রাঙা কামনা—কিন্তু হাহাকার নেই, এর শেষে জেগে আছে নিরর্থক দেয়ালের মতো ধূসর মুখ। যতো স্বপ্ন যতো সোনা ছিলো জীবনে, তা যেনো কোনো যাদুকরের খেলার সামগ্রী। জীবনানন্দ আর বুঝতে চান নি, বোঝার কিছু নেই ব'লে শেষে শুধু মুগ্ধ করেছেন দুটি অধরা চিত্রকল্প দিয়ে, যে-দুটি শুধু ঢেউ তুলে চলে স্থির জলে—রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক/শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!

বিশ্বাসীদের সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর, তবে ওই ভিত্তিটা দাঁড়ানো শূন্যতার ওপর। তাঁরা ওই শূন্যতার দিকে তাকাতে চান না। বিশ্বাসীরা সাধারণত ভীত ও লুব্ধ মানুষ, তাদের ভেতরে ভয় ও লোভ একসাথে কাজ করে, শূন্যতাকে ভয় পেয়ে তারা স্বর্গের কল্পিত পূর্ণতাকে আঁকড়ে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ওই ধরনের বিশ্বাসী ছিলেন না, তাহলে তিনি ধর্মপ্রবর্তক হতেন, কবি হতেন না। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে একবার তাকিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিটির দিকে। তাঁর যে এই গভীর সর্বব্যাপী বিশ্বাস, তা কি উঠে এসেছিলো তাঁর নিজের ভেতর থেকে? যাকে তিনি সত্য আর পরম ব'লে মেনেছিলেন, তা কি তাঁর একান্ত আপন সত্য উপলব্ধি? যে-সুন্দর নিঠুরের কাছে তিনি সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে, যার চরণধুলার তলে মাথা নত রাখতে ভালোবাসতেন তিনি, যার ইচ্ছে তিনি পূর্ণ দেখতে চাইতেন নিজের জীবনে, যার অঙ্গদ সুন্দর কিন্তু খড়্গ আরো মনোহর মনে হতো তাঁর, সুখে না থেকে যার কোলে থাকতে চাইতেন তিনি, যার সাথে নিত্য বিরোধ তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো, যার সম্মুখে তিনি দাঁড়াতে চাইতেন প্রতিদিন, তাকে কি তিনি পেয়েছিলেন নিজে? না কি পেয়েছিলেন প্রথা থেকে? বিশ্বাস কয়েক হাজার বছর ধ'রে সবাই পাচ্ছে প্রথা থেকে, তিনিও তাই পেয়েছিলেন। *পত্রপুট*-এর পনেরো সংখ্যক কবিতায়, যে-কবিতাটির নাম দিতে পারি 'ব্রাত্য', তিনি স্বীকার করেছেন আসল সত্য। তিনি বলেছেন :

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
আজ আপন মনে ভাবি,
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।

তাঁর স্বীকারোক্তিতেই দেখছি তাঁর পরম বিশ্বাস নিজের নয়, প্রথাগত; তাঁর পরমসত্তাকে পেয়েছেন তিনি পরিবার ও সমাজের কাছে থেকে, পেয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থে—গ্রন্থের কোনো শেষ নেই, গ্রন্থের প্রতারণারও কোনো শেষ নেই; প্রতারক গ্রন্থ লিখতে পারেন, বিভ্রান্ত গ্রন্থ লিখতে পারেন, অসৎ গ্রন্থ লিখে চালাতে পারেন বিধাতার নামে; তাই বুঝতে পারি তাঁর নিজের ভেতর থেকে উঠে আসে নি তাঁর বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ নির্মম সংকীর্ণ স্বার্থপরায়ণ ধর্মের কবলে নিজেকে সমর্পণ করেন নি, কতোগুলো বইয়ের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি; কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ কল্পজগতটিই দাঁড়িয়ে আছে শোচনীয় শূন্যতার ওপর, যে-শূন্যতা রহস্যীকরণে তিনি নিজেকে ব্যয় করেছেন সারা জীবন। তিনি নিজে যদি খুঁজতেন নিজের বিশ্বাস, তাহলে হয়তো বিশ্বাস করতেন না; তাঁর সে-মানসিকতা ছিলো না, পরিবারের পরমসত্তাকে অস্বীকার করার মতো প্রথাবিরোধীও ছিলেন না তিনি। তাঁর মতো অসাধারণ মানুষই যেখানে বিশ্বাস লাভ করেন পরিবার, প্রথা, সমাজ, গ্রন্থ থেকে, এবং ভুল বিশ্বাসকে দীর্ঘ জীবন ধ'রে মহিমামণ্ডিত করতে থাকেন, সেখানে সাধারণ মানুষ আর কী করতে পারে! প্রথা মেনে নেয়ার সুবিধা অনেক, না মানার বিপদ অজস্র।

যখন আধুনিক কবিতা, আধুনিক শিল্পকলা, বিশশতকের স্বভাব বিষয়ে পড়া শুরু করি আমি কৈশোর পেরিয়ে নতুন যৌবনে পড়ার চাঞ্চল্যকর বয়সে, ভালো লাগতে থাকে ওই কবিতার অভাবিত চিত্রকল্প, অপ্রথাগত সৌন্দর্য, এতোদিন ধ'রে শেখা অনেক কিছুকেই মনে হ'তে থাকে হাস্যকর, তখন বহু বইয়ে বিশশতকের একটি ব্যাখ্যায় আমি আহত হই। বহু সমালোচক, এখন তাঁদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি আমি, বিশশতকে নিন্দা করেন বিশ্বাসহীনতার শতক ব'লে তাঁদের কাছে শতকটিকে মনে হয় মরুভূমি—বিশ্বাসহীনতার মরুভূমি, যা টিএস, এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যান্ড। প্রথম আমি বুঝতে পারি নি, বুঝে উঠতে অনেক দিন লাগে, এবং হাসি পায়। আমি বুঝতে পারি ওই সমালোচকদের মনে, যেমন

এলিঅটের ভেতরে, বাস করে পুরোনো বিশ্বাস, অজস্র বাজে ধারণা, তাই এ-মহান শতাব্দীকে তাঁদের এমন মনে হয়। বিশশতক বিশ্বাস বাদ দিয়েছে, এতে এটি মরুভূমি হয়ে ওঠে নি, হয়ে উঠেছে সৎ; এর থেকে সৎ শতাব্দী আর নেই। এর আগে তথাকথিত সভ্য মানুষ তিরিশচল্লিশটি বিশ্বাসের শতাব্দী যাপন করেছে, কিন্তু ওই বিশ্বাস মানুষের কোনো কাজে আসে নি, ওই বিশ্বাস মানুষকে অসুস্থ বন্দী দরিদ্র অসহায় পীড়িত ক'রে রেখেছে; ওই বিশ্বাস ছিলো মোহগ্রস্ত আর সুবিধাবাদীদের পরিকল্পিত বিশ্বাস। অতীতের দিকে তাকিয়ে বিশশতকের থেকে উৎকৃষ্ট কোনো শতক দেখতে পাই না আমি, আমার মনে হয় না অন্য কোনো শতক আমার জন্যে এর চেয়ে বেশি বসবাসযোগ্য হতো। আগের কোনো শতকে আমি হতাম হয়তো ক্রীতদাস, বা ভূমিদাস, কোনো শতকে আমার জীবন কেটে যেতো প্রভুদের স্তবগানে, আমি থাকতাম অসুস্থ, অন্ধ, স্বাধিকারহীন। বিশশতক, দুটি মহাযুদ্ধ ও বহু রোগে আক্রান্ত বিশশতক, আমাকে যা দিয়েছে, তা আর কোনো শতক দিতে পারতো না। এলিঅটের কবিতার অজস্র চিত্রকল্প আর উক্তিতে আমি মুগ্ধ। এ-মুহূর্তেও মনে আসছে:

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table;

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.
And time for you and time for me,
And time yet for a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions
Do I dare
Disturb the universe?

I have measured out my life with coffee spoons

I grow old...I grow old...
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

I have heard the mermaids singing, each to each.
I do not think that they will sing to me.

Every street-lamp that I pass
Beats like a fatalistic drum

Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.

After such knowledge, what forgiveness? Think now

History has many cunning passages, contrived corridors,
And issues, deceives with whispering ambitions

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.

What are roots that clutch, what bracnches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relif,
And the dry stone no sound of water,

'You gave me Hyacinths first a year ago;
'They called me the Hyacinth girl.'

Unreal city,
Under the brown fog of a winter dawn.
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many,

Sweet Thames, run softly till I end my song,
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.

Gentile or Jew
O you who turn the wheel and look to windward,
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you.

Here is no water but only rock
Rock and no water and sandy road
The road winding above among the mountains
Whice are mountains of rocks without water

Where the hermit-thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water.

Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you

আর উদ্ধৃত করছি না, অনুবাদের চেষ্টাও করতে চাই না; এগুলো ষাটের দশকে যেভাবে আলোড়িত করতো আমাকে, যেভাবে আমার চোখের সামনে দাঁড়

করাতো অবর্ণনীয় দৃশ্যের পর দৃশ্য, আজো করে। ইথারিত রোগীর মতো সন্ধ্যা, বা কফির চামচে জীবন পরিমাপ, বা প্রলয়ের ঢাকের মতো প্রতিটি বাতিস্তম্ভের বেজে চলা, বা এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস আজো অভিভূত করে আমাকে। আজো আমি গুনগুন করতে ভালোবাসি :

> Here is no water but only rock
> Rock and no water and sandy road

বা

> Who is the third who walks always beside you?

তবে আমি এগুলোর যে-ভাষ্য পাই, এবং এলিঅট বোঝাতে চেয়েছেন, তা মেনে নিই না। এখানে জল নেই শুধুই পাথর, পাথর এবং জল নয় শুধু বালুপথ—এ-দৃশ্য ও ধ্বনি আমি উপভোগ করি; তবে আমার ভালো লাগে না জল মানে বিশ্বাস আর পাথর মানে অবিশ্বাস, এ-ব্যাখ্যা। বিশ্বাসের কোনোই দরকার নেই, দরকার রহস্যমুক্ত সত্যের। পরিহাস ব'লে মনে হয় পরের পংক্তিটি—Who is the third who walks always beside you? মনে হয় বেশ একটা অলৌকিক অপার্থিব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিবরণ পড়ছি; আমরা ছিলাম দুজন হঠাৎ তৃতীয় একজনের অস্তিত্ব অনুভব করছি, গুনতে গেলে পাচ্ছি দুজনকে, কিন্তু দেখতে গেলে দেখছি আমাদের দুজনের মধ্যে রয়েছে আরেকজন। খুবই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক ব্যাপার মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, এলিঅট নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও লেখেন নি পংক্তিটি, লিখেছেন দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রীর অভিজ্ঞতা থেকে ধার ক'রে। প্রচণ্ড শীতে আর ক্ষুধায় মৃত্যুর ভীতির মধ্যে দক্ষিণ মেরুযাত্রী একজনের মনে এ-বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিলো, যে-বিভ্রম ওই পরিস্থিতিতে জাগা স্বাভাবিক, যা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, তাকেই এলিঅট ধর্মীয় উপলব্ধির রহস্যে পরিণত করেছেন। অলৌকিক উপলব্ধি এমনই অসৎ।

এলিঅট তাঁর ধর্মীয় ও রাজনীতিক রক্ষণশীলতা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে ধর্মবিশ্বাসে তিনি ক্যাথলিক আর রাজনীতিক বিশ্বাসে রাজতন্ত্রবাদী। তাঁর কবিতা ও নাটকে খ্রিস্টধর্মীয় রক্ষণশীলতা বারবার প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর *দি রক*-এর একটি অংশ প'ড়ে আমি বেশ মজা পাই, চমৎকার চমৎকার উক্তি আমোদ দেয় আমাকে, কিন্তু এর সবটাই বাজে কথা :

> O perpetual revolution of configured stars,
> O perpetual recurrence of determined seasons,
> O world of spring and autumn, birth and dying!
> The endless cycle of idea and action,
> Endless invention, endless experiment,
> Brings knowledge of motion, but not of stillness;
> Knowledge of speech, but not of silence;
> Knowledge of words, and ignorance of the Word.

All our knowldege brings us nearer to our ignorance,
All our knowldege brings us nearer to death,
But nearness to death no nearer to GOD.
Where is the lirfe we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
The cycles of Heaven in twenty centuries
Bring us farther from GOD and nearer to the Dust.

I journeyed to London, to the timekept City,
Where the River flows, with foreign flotations,
There I was told: we have too many churches
And too few chop-houses. There I was told:
Let the vicars retire. Men do not need the church
In the place where they work, but where they spend their Sundays.
In the City, we need no bells:
Let them waken the suburbs.
I journeyed to the suburbs, and there I was told;
We toil for six days, on the seventh we must motor
To Hindhead, or Maidenhead.
If the weather is foul we stay at home and read the papers.
In the industrial districts, there I was told
Of economic laws.
In the pleasant countryside, there it seemed
That the country now is only fit for picnics.
And the Church dose not seem to be wanted
In country or in suburb: and in the town
Only for important weddings.

হায় নক্ষত্রমণ্ডলির অনন্ত আবর্তন,
হায় নির্ধারিত ঋতুসমূহের অনন্ত পুনরাবর্তন,
হায় বসন্ত ও শরৎ, জন্ম ও মৃত্যুর জগত!
চিন্তা ও কর্মের অন্তহীন চক্র,
অন্তহীন আবিষ্কার, অন্তহীন পরীক্ষানিরীক্ষা,
আনে গতির জ্ঞান, স্থিতির জ্ঞান নয়;
ভাষার জ্ঞান, নৈঃশব্দের জ্ঞান নয়;
শব্দের জ্ঞান, এবং শব্দ সম্পর্কে অজ্ঞানতা।
আমাদের সব জ্ঞান আমাদের নিকটবর্তী করে আমাদের অজ্ঞানতার,
আমাদের সব অজ্ঞানতা আমাদের নিকটবর্তী করে মৃত্যুর,
তবে মৃত্যুর কাছাকাছি হওয়া ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়া নয়।
কোথায় জীবন যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি জীবনযাপনের মধ্যে?
কোথায় প্রজ্ঞা যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি জ্ঞানের মধ্যে?

কোথায় জ্ঞান যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি তথ্যের মধ্যে?
বিশটি শতক ধ'রে নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তন
আমাদের দূরে সরিয়ে নেয় ঈশ্বরের থেকে, এবং কাছাকাছি করে ধুলোর।

আমি গেলাম লন্ডনে, সময়নিয়ন্ত্রিত নগরে,
যেখানে বয়ে চলে নদী, বিদেশী নৌবহরসহ।
সেখানে আমাকে বলা হলো : আমাদের বড়ো বেশি আছে উপাসনালয়,
এবং খুব কম আছে খাবারদোকান। সেখানে আমাকে বলা হলো :
অবসর দাও পুরোহিতদের। মানুষের কর্মস্থলে কোনো দরকার নেই উপাসনালয়ের,
উপাসনালয় দরকার যেখানে তারা রোববার কাটায়।
নগরে, আমাদের দরকার নেই ঘন্টাধ্বনির :
ঘন্টাধ্বনি জাগাক শহরতলিকে।
আমি গেলাম শহরতলিতে, এবং সেখানে আমাকে বলা হলো :
ছ-দিন আমরা খাটাখাটি করি, সপ্তম দিনে আমাদের যেতেই হয়
হাইন্ডহেড, বা মেইডেনহেডে।
যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে আমরা ঘরে বসে পড়ি খবরের কাগজ।
শিল্প-এলাকায় আমাকে বলা হলো
আর্থিক আইনের কথা।
মনোরম পল্লী-অঞ্চলে গিয়ে মনে হলো পল্লী এখন উপযুক্ত শুধু বনভোজনের।
উপাসনালয়ের কোনো দরকার নেই পল্লীতে, বা শহরতলিতে;
আর শহরে দরকার শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিবাহানুষ্ঠানের জন্যে।

পড়তে বেশ লাগে, শুনতেও বেশ লাগবে,—এটা নাটকের অংশ; তবে এর বহু 'উপলব্ধি' বড়ো রকমের বাজেকথা, বিশ্বের রহস্যীকরণের জন্যে বানিয়ে তোলা, যদিও বাজেকথাগুলো অনেকের মনে হতে পারে মহৎ উপলব্ধি; আর দ্বিতীয়াংশে উপাসনালয়বিমুখতার যে-বিবরণ রয়েছে, তাতে ব্যথিত হওয়ার কিছু নেই, মানুষ এগুলোর কবল থেকে যে মুক্ত হচ্ছে, এগুলোকে যে গুরুত্বহীন মনে করছে, তাতে আনন্দিত হওয়ার কথা। তাঁর কয়েকটি উপলব্ধি যাচাই করতে পারি। এলিঅট চিন্তা ও কর্মের অন্তহীন চক্র, অন্তহীন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষা আর গতির জ্ঞানকে ভালো ব্যাপার মনে করছেন না, চাচ্ছেন স্থিতির জ্ঞান বা ধ্যান; তবে স্থিতি বা ধ্যান বাজেকথা মাত্র, তিনি নিজেও স্থিতি বা ধ্যানের চর্চা করতেন না, ব্যাংকে ও পরে প্রকাশনাসংস্থায় কাজ করতেন, পালিয়ে বেড়াতেন উন্মাদ প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেন তরুণী ব্যক্তিগত সহকারিণীকে। ধ্যানের কথা বাতিল বইগুলোতে খুবই পাওয়া যায়, তবে চিন্তা, কর্ম, আবিষ্কার, আর পরীক্ষানিরীক্ষার পাশে ধ্যান বা স্থিতি হাস্যকর ব্যাপার। 'আমাদের সব জ্ঞান আমাদের নিকটবর্তী করে আমাদের অজ্ঞানতার',—একে কি সত্য ব'লে মানতে হবে? জ্ঞান কি মুক্ত করছে না আমাদের অজ্ঞানতা থেকে? এখনকার কিশোররাও কি অনেক ব্যাপারে বেশি জানে না আরিস্ততল, মোজেস বা

মহর্ষীদের থেকে? জ্ঞান আমাদের অজ্ঞান করে না, বরং ক্রমশ আমরা নির্মোহ সত্যের দিকে এগোই, জ্ঞানী হই, যেমন আমরা পুরোনো ধ্যানীদের থেকে জানি অনেক বেশি। তাঁরা আসলে কোনো সত্যই উদঘাটন করেন নি, উচ্চারণ করেছেন কিছু বিভ্রান্ত শ্লোক, ওই বিভ্রান্ত শ্লোক উচ্চারণকে জ্ঞান বলতে পারি না। এলিঅট যে-জীবন, প্রজ্ঞা, জ্ঞানের কথা বলেছেন, যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি ব'লে আর্তনাদ করছেন, তা কিংবদন্তিমাত্র; ওই জীবন, প্রজ্ঞা, জ্ঞানের থেকে বিশশতকের জীবন, জ্ঞান, তথ্য অনেক উন্নত। ঐশী গ্রন্থগুলোর প্রণেতারা আজকের জ্ঞানের বিকাশের কথা কখনো ভাবতেও পারেন নি। আর ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়া? শুধু হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। জনগণের উপাসনালয়বিমুখতায় খুবই মর্মাহত এলিঅট; বুঝতে পারি যে বিশশতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির থেকে জনগণ অনেক বেশি এগিয়েছে চেতনায়। তারা কতকগুলো ভুল বিশ্বাসের মধ্যে প'ড়ে নেই; তারা উঠে এসেছে আদিম বিশ্বাস থেকে, বিশ্বকে রহস্যমুক্ত করছে তারা, আর আধুনিক কবি, আদিম মানুষের মতো, করছেন বিশ্বের রহস্যীকরণ।

এলিঅটের মতে চিরকালের শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে, যাঁর মহিমা তিনি বর্ণনা করেছেন বহুবার, যাঁর *দি ডিভাইন কমেডি* বা *স্বর্গীয় মিলন* পৃথিবীর বিখ্যাততম কাব্যগুলোর একটি। বিশ্বাস ও কবিতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি আমি, বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে, কিন্তু কবিতার মূল্য আছে; তাই এর কাব্যত্ব অনুভব করি আমি কিন্তু যে-বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কাব্যটি, তা শিশুসুলভ ও হাস্যকর। এর রূপকার্থ—পরমসত্তার সঙ্গে বিশ্বাসী আত্মার মিলন প্রবীণ শিশুদের কাছে মধুর, তাদের এটা পরম রূপকথার স্বাদ দেয়; আমি কৌতুক বোধ করি। মধুসূদন *মেঘনাদবধকাব্য*-এর অষ্টম, *প্রেতপুরী*, সর্গ দান্তের কাব্যের *নরক* সর্গের অনুসরণে লিখেছিলেন, তবে দান্তের মতো বিশদ হওয়ার ধৈর্য বা সুযোগ ছিলো না মধুসূদনের। এ-কাব্যের *নরক* খণ্ডের তৃতীয় সর্গে নরকের তোরণে বড়ো বড়ো বর্ণে লেখা আছে:

> THROUGH ME THE ROAD TO THE CITY OF DESOLATION,
> THROUGH ME THE ROAD TO SORROW DIUTURNAL.
> THROUGH ME THE ROAD AMONG THE LOST CREATION....
> LAY DOWN ALL HOPE, YOU THAT GO IN BY ME.

এর দ্রুত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন মুধুসূদন:

> আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
> ভীষণ তোরণ-মুখে;—"এই পথ দিয়া
> যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;—
> হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।"

দান্তের কাব্য ও প্রতিভাকে অস্বীকার করার কথা ওঠে না, তাঁর কবিত্ব মুগ্ধ করে আমাকে, কিন্তু অস্বীকার করি তাঁর বিশ্বাসকে। তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয়; বিশ্ব, পৃথিবী, নরক, স্বর্গ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা হাস্যকর। বার্ট্রান্ড রাসেল নিজেকে খ্রিস্টান বলতে অস্বীকার করেছিলেন যে-সমস্ত কারণে, তার একটি হচ্ছে নরক—ঈশ্বরের অগ্নিকুণ্ড, তার অবাধ পীড়নসুখের এলাকা; তাঁর মতে যে-ঈশ্বর নরকেরও ঈশ্বর, যে তার সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্যে পরিকল্পনার কোনো শেষ রাখে নি, যে এতো হিংস্র, তাকে মানা যায় না। ঈশ্বরকে প্রচণ্ড শাস্তিদাতারূপে ভাবতে পারেন না রাসেল; যে এমন শাস্তি দিতে পারে, তাকে মহৎ ব'লে ভাবাও কঠিন। নরক পরিকল্পনায় সব ধরনের ঈশ্বরের থেকে নিপুণ দান্তে, তারা নতুন নরক নির্মাণের দরকার বোধ করলে দান্তেকে নরকের স্থপতির দায়িত্ব দিলে যে অভাবিত হিংস্র নরক পাবে, তা দেখে তারাই ভয় পাবে;—আমি ভেবে পাই না একটি মানুষ কতোটা নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ হ'লে এমন বিশদভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন নরকের, এবং তাতে অন্তহীন শাস্তি দিতে পারেন তাঁর সব ধরনের শত্রুকে। দান্তের নরকের পীড়নের কোনো তুলনা পাই না, শুধু কিছুটা পাই হিটলারের বন্দীশিবির ও সোলঝিনিথসিনের *গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ*-এ।

দান্তের কাব্য মৃত্যুর পর পরমসত্তার (একটি ভুল বিশ্বাস) সাথে আত্মার (আরেকটি ভুল বিশ্বাস) মিলনের রূপক। পরমসত্তা, নরক, শুদ্ধিস্থল, স্বর্গ কিছুই দান্তের নিজের কল্পনা নয়, এগুলো পেয়েছেন তিনি ক্যাথলিক বিশ্বাস থেকে; সেগুলোকে ভ'রে তুলেছেন নিজের কল্পনায়, ওই কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস। এ-কাব্যের সব বিশ্বাসই ভুল। শুরু বিয়াত্রিচেকে নিয়ে; কৈশোরে প্রথম দেখেছিলেন এই পবিত্র স্বর্গীয় মুখ, যা কখনো ভোলেন নি, এবং ওই মুখের অধিকারিণী হয়ে ওঠে তাঁর কাছে শুদ্ধতমা। শুদ্ধতাও এক কৌতুককর ব্যাপার, বিশ্বাসীদের অন্তরে তা কখনো মলিন হয় না, যদিও আমরা জানি কিছুই অমলিন শুদ্ধ নয়। বিয়াত্রিচের বিয়ে হয়ে যায় এক ব্যাংক-কর্মকর্তার সাথে, দান্তে নিজেও বিয়ে করেন; কিন্তু তাঁর হৃদয়ে জেগে থাকে শুদ্ধতমার জন্যে শুদ্ধতম প্রেম। কতো সহস্রবার বিয়াত্রিচে ঘুমালো পতিদেবতার নিচে, কতোভাবে তৃপ্ত করলো পতির বিচিত্র শখ, কতোবার শীৎকার ক'রে উঠলো, গর্ভবতী হলো কতোবার, দান্তেও কতোবার উঠলেন তাঁর নারীর ওপরে, ভেঙে পড়লেন কতোবার; কিন্তু তা কখনো ব্যাপার নয়, বিশ্বাসীদের শুদ্ধতা শৃঙ্গারে মলিন হয় না। বিয়াত্রিচেকে তিনি পথেঘাটে যতোবার দেখেছেন ততোবার মনে হয়েছে তিনি দেখেছেন ঈশ্বরকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভালো বিষয় হ'তে পারেন দান্তে, মনোবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেন কী উন্মত্ততায় ভুগতেন দান্তে—প্রতিভাস, ভ্রান্তবিশ্বাস, না মতিভ্রমে? সব মহাধার্মিক ঈশ্বরদ্রষ্টাই মনোবিকলনগ্রস্ত। ফ্লোরেন্সের ওই তরুণীর মধ্যে তিনি দেখেন ঈশ্বরের সশরীরী গৌরব, যার মধ্যে একাকার হয়ে আছে খ্রিস্টীয়

উপাসনালয়, মা মেরি, আর ক্রাইস্ট নিজে। তিনি নরক, শুদ্ধিস্থল, ও স্বর্গের যে-ভূগোল নির্দেশ করেছেন, খুবই নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করেছেন দান্তে, যে-ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে মনে করেছেন ধ্রুব, তা আজকের চোখে শুধু ভুলই নয়, হাস্যকরও। তিনি নরক কল্পনা করেছেন একটি চোঙাকৃতি সুড়ঙ্গরূপে, যা জেরুজালেমের নিচ থকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের দিকে নেমে গেছে। ওই নরককে ভাগ করেছেন তিনি স্তরে স্তরে, একেক স্তরে দণ্ডিত করেছেন একেক ধরনের পাপীকে। তাঁর নিজের শত্রুদের তিনি দিয়েছেন কঠিন শাস্তি। তারপর কল্পনা করেছেন পারগ্যাটোরি বা শুদ্ধিস্থল, যেখানে, ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুসারে, বাস করে পাপমুক্ত আত্মারা, যা অবস্থিত দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো এক দ্বীপের কোনো এক পর্বতের চুড়োয়। এখানে রয়েছে সাতটি স্তর, যাতে ঘুরে ঘুরে আত্মারা মুক্তি পায় সাতটি সাংঘাতিক পাপ থেকে, এবং উপযুক্ত হয়ে ওঠে স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের। স্বর্গ হচ্ছে স্বর্গবাসের প্রবেশপত্র পাওয়া আত্মাদের বাসস্থান। স্বর্গকে তিনি স্থাপন করেন, মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত দশ আসমানে, যার ওপর ফুটে আছে অতীন্দ্রিয় রহস্যগোলাপ।

বিশ্ব সম্পর্কে কী ধারণা ছিলো বিশ্বাসী দান্তের? মধ্যযুগে এ সম্পর্কে যতোটুকু জানা হয়েছিলো, তিনি জানতেন ততোটুকু; তাঁর পবিত্র বই ও বিশ্বাস তাঁকে যে-সব ভুল ধারণা দিয়েছিলো, তিনি পোষণ করতেন সে-সব ভুল ধারণাই। দান্তের ঈশ্বর বিশ্ব সম্পর্কে বেশি জানতো না, যতোটুকু জানতো তাও শিখেছিলো আলেকজান্দ্রিয়ায় টলেমির বইপত্র থেকে। ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের কল্পনা আগে থেকেই ছিলো, টলেমি তা বিধিবদ্ধ করেন, যা ষোড়শশতকে, দান্তের দু-শো বছর পর, বাতিল করে দেন কোপারনিকাস; এবং প্রতিষ্ঠা করেন সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব। তবে মহাবিশ্ব এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; একটি গরিব নক্ষত্র সূর্য, তাকে কেন্দ্র ক'রে মহাজগতের একপ্রান্তে আছে সৌরলোক; আরো কোটি কোটি নক্ষত্রলোক আছে মহাবিশ্বে। এসব জানা ছিলো না ঈশ্বরের, ও দান্তের। দান্তে বিশ্বাস করতেন পৃথিবীই বিশ্বের কেন্দ্র, আর ওই বিশ্ব বেশি বড়ো ছিলো না, এখনকার মহাবিশ্বের কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের একভাগের কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের খণ্ডাংশমাত্র। আলোর গতি ও আলোকবর্ষের কথা ঈশ্বর ও দান্তে কখনো ভাবতে পারেন নি। টলেমি বিশ্বজগতের ক্রিয়াকলাপের ভেতরে ঢোকেন নি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাকেই মনে করেছেন সত্য, আর তাকে অন্যরা মনে করেছে চিরসত্য, এবং ওই সত্য ঈশ্বরের ধ্রুবসত্য হয়ে ঢুকে গেছে ঈশ্বরের বইগুলোতে।

সূর্য উঠতে দেখি আমরা, দেখি ডুবতে; টলেমিও দেখেছিলেন সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। এ দেখেই মনে করেছিলেন সূর্য এভাবেই ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে, যা খুবই বড়ো ভুল। সূর্য ওঠেও না ডোবেও না; পৃথিবীই ঘুরছে নিজের অক্ষরেখার

ওপর ও সূর্যকে ঘিরে নিজের কক্ষপথে। প্যালেস্টাইন অঞ্চলের ধর্মবইগুলোতে এ-ভুলই ঈশ্বরের সত্য ব'লে ঘোষিত হয়েছে। চাঁদ, সূর্য, ও গ্রহগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় এগুলো ঘুরছে পৃথিবীকে ঘিরে; টলেমি এগুলোর গোলাকার পথগুলোকে ভাগ করেছিলেন সাতটি পথে। এগুলোই ধর্মগ্রন্থের পবিত্র সাত আসমান : পৃথিবী থেকে ক্রমশ দূরবর্তী চাঁদ, বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), সূর্য, মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), ও শনির (Saturn) কক্ষপথ (তখনো ইউরেনাস, নেপচুন, এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহাণুগুলো আবিষ্কৃত হয় নি; আবিষ্কারের পর ধার্মিকেরা আরো তিন আসমান যোগ ক'রে দশ আসমানে বিশ্বাস আনেন)। মধ্যযুগের ইউরোপের কতো না কবিই মুগ্ধ ছিলেন 'স্ফেয়ার' বা কক্ষপথের অশ্রুত সঙ্গীতে, এ নিয়ে কতোই কবিতা লিখেছেন তাঁরা। এই সাত আসমানের পরে স্থির নক্ষত্রদের পথ বা অষ্টম আসমান, তারপর, আদিচালকের (Primum Mobile : First Mover) অবস্থান, যা নিজে চলে না কিন্তু চালায় সব কিছু। এই নয় কক্ষ বা পথ বা আসমানের পর হচ্ছে দশম স্বর্গ, ঈশ্বরের ও তার সন্তদের প্রকৃত বাসভবন। এর কোনো অবস্থান নেই, গতি নেই, চলাচল নেই; এটা শাশ্বত ও অনন্ত। এমন কল্পনায় বিশ্বাসীদের চোখ জলে ভ'রে যায়, ঈশ্বরের মহিমা অনুভব ক'রে তারা স্বর্গের সুখ অনুভব করে। কিন্তু এ হচ্ছে অপকল্পনার চমৎকার উদাহরণ। মানুষের সব ধরনের কল্পনা আমার ভালো লাগে, কিন্তু সেগুলোতে আমি বিশ্বাস করি না, মজা পাই। দান্তের কাব্য সুন্দর, কিন্তু বিশ্বাস ভুল; তাঁর বিশ্বাসের কাজ হচ্ছে বিশ্বকে মিথ্যেয় বা রহস্যে ঢেকে দেয়া।

বাঙলা লেখকদের লেখা পড়ার সময় বিব্রত বোধ করি বারবার। আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যেও মৌলিকত্ব শোচনীয়রূপে কম, যখন তাঁরা চিন্তা করেন তখন তাঁরা অনেকটা শিশু; তাঁদের অধিকাংশই অবিকশিত, অনেকাংশে অজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞানের অভাবে আদিম বিশ্বাস প্রবল তাঁদের; তাঁরা স্বস্তি পান কুসংস্কারে, পুরোনো বাজেকথায়। কুসংস্কারকীর্তনে তাঁরা অকুণ্ঠ। তরুণ বয়স থেকেই অস্বস্তি বোধ করি আমি নজরুলের লেখা পড়ার সময়; তিনি মাঝারি লেখক ব'লে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত লেখক ব'লে। তিনি ভারী বোঝার মতো চেপে আছেন বাঙালি মুসলমানের ওপর; বাঙালি মুসলমান তাঁকে নির্মোহভাবে বিচার করতে পারবে না বহু দিন। বাঙালি মুসলমান প্রগতিশীলেরাও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল আর তারা পড়ে না, নজরুলকেও পড়ে না, শুনে শুনে বিশ্বাস করে যে নজরুল বিদ্রোহী। প্রচারে প্রচারে তাঁকে আমি বিদ্রোহী ব'লেই মনে করেছি যখন বালক ছিলাম, বেশ কিছু পদ্যেগদ্যে দেখেছিও তাঁর বিদ্রোহীরূপ, কিন্তু তিনি বাঙলা ভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার-উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান। বেশি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। গানের পরে গানে তিনি লিখেছেন 'নামাজ পড়, রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই।/ তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর

নাই'; 'শোনো শোনো য়্যা এলাহি আমার মুনাজাত।/ তোমারি নাম জপে যেন হৃদয় দিবস-রাত'; 'আল্লাহ নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়'; 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,/ যেনো গোরে থেকেও মোয়াজ্জিমের আজান শুনতে পাই'; 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি! মোরে নিয়ে যা রে মদিনা'; 'খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে'; 'আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়/ আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগতময়।' অবশ্য এগুলোকেও অনেকে মনে করতে পারেন খুবই বিদ্রোহী ও প্রগতিশীল কাণ্ড; কিন্তু এখানে কোনো বিদ্রোহীকে পাচ্ছি না, পাচ্ছি একজন ইসলাম অন্ধকে।

রবীন্দ্রনাথ করতেন রহস্যীকরণ, তিনি কোনো প্রথাবদ্ধ ধর্মের গীতিকার ছিলেন না; তিনি তাঁর বিশ্বাসকে জড়িয়ে দিতেন মহাজগতের সাথে। নজরুলে সেই রহস্যীকরণ নেই, তিনি স্থূলভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশ্বাস বা উদ্দীপনা। নজরুলের বিশ্বাসও সন্দেহজনক, মনে হয় তিনি এক বিশ্বাসের সাথে আরেক বিশ্বাসের পার্থক্য বোঝেন না। বিধিবদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো কঠোর, একটি মানলে আরেকটি মানা যায় না, ইসলাম মানলে হিন্দুধর্ম মানা যায় না, একই সাথে কেউ হ'তে পারে না মুসলমান ও হিন্দু; কিন্তু নজরুল তাঁর এক বিশ্বাস থেকে আরেক বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আগের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে। আমি বিস্মিত হই। যিনি লেখেন 'আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়/আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগতময়', তিনি কী ক'রে লিখতে পারেন 'কালী কালী মন্ত্র জপি বসে লোকের ঘোর শ্মশানে'; 'বল্ রে জবা বল্! কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল'; 'তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা আমার প্রথম পূজার ফুল' ও আরো এমন বহু পৌত্তলিক পদ। তিনি কি একই সাথে হ'তে পারেন খাঁটি মুসলমান, আর কালীভক্ত? অনেকে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেন যে নজরুল দুই সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়েছিলেন; যদি তিনি তাই ক'রে থাকেন তাহলে তিনি মিলন ঘটিয়েছিলেন দুই খারাপের। আমি কি এমন মিলন ঘটাতে পারি? আমি কি আজ আল্লার স্তব লিখে কাল কালীমায়ের পায়ে সঁপতে পারি নিজেকে? নজরুলের কী কোনো বিশ্বাস ছিলো? না কি তিনি স্বতস্ফূর্ত উদ্গীরণ করেছেন বিদ্রোহ; আর বাণিজ্যিক প্রেরণায় লিখে গেছেন একই সাথে হামদ, নাত, আর কালীকীর্তন? নজরুলের ইসলামি আর শাক্ত গানগুলো তাঁকে প্রচুর অর্থ এনে দিয়েছিলো, আমরা জানি, আর ওই অর্থই হয়তো তাঁকে মাতিয়েছিলো কুসংস্কৃত উদ্দীপনায়।

বাঙলার লেখকদের মধ্যে চেতনায় সবচেয়ে আধুনিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; সভ্যতা ও মানুষের বিবর্তন বুঝেছিলেন তিনি ভালোভাবে, এবং ঈশ্বর নামের অলীক ব্যাপারটি ছিলো তাঁর কাছে স্পষ্ট। তিরিশের আধুনিক কবিরা অবিশ্বাসী ছিলেন; তবে তাঁরা এড়িয়ে গেছেন ব্যাপারটি, শুধু সুধীন্দ্রনাথ এড়িয়ে যান নি। বারবার ঈশ্বর এসেছে তাঁর কবিতায়, তাঁর ঈশ্বর ঠিক হিন্দু নয়, ঈশ্বর বলতে তিনি মুসার

ঈশ্বরকেই বুঝেছেন বেশি। তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, পরিহাস করেছেন, ওই অলীক কল্পনার মূলও দেখিয়েছেন। 'উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা', সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বলেছি পিশাচহস্তে নিহত বিধাতা।' ইউরোপে উনিশশতকের শুরু থেকেই ঈশ্বরের মৃত্যুর সংবাদ রটতে থাকে, যা চরম সংবাদে পরিণত হয় নিটশের 'ঈশ্বর মৃত : গড ইজ ডেড' ঘোষণায়। বহু শতক ধ'রেই অসুস্থতায় ছিলো ইউরোপি ঈশ্বর, নিটশে তার মৃত্যুর সংবাদটি সংবাদপত্রের শিরোনামের মতো প্রচার করেন। কিন্তু সে কি অচিকিৎসায় বা বার্ধক্যজনিত রোগে মারা গেছে? না, তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিটশের *প্রফুল্ল বিজ্ঞান* (১৮৮২) বইটিতে এক পাগল বাজারে গিয়ে চিৎকার করতে থাকে, 'আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি! আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি।' তার কথা শুনে বাজারের লোকজন হেসে ওঠে; মজা করার জন্যে তারা জিজ্ঞেস করে ঈশ্বর কি হারিয়ে গেছে, না কোথাও লুকিয়েছে, না কি ভ্রমণে বেরিয়েছে? তখন ওই পাগল ঘোষণা করে : 'ঈশ্বর মারা গেছে। ঈশ্বর মৃত। আর আমরাই খুন করেছি তাকে।' সুধীন্দ্রনাথই সম্ভবত প্রথম, বাঙলা ভাষায়, ঈশ্বরের নিহত হওয়ার সংবাদটি দেন।

বেদবেদান্তের পাতা ছিঁড়ে মরুর বায়ে উড়িয়ে দিয়ে একসাথে তিনি বাতিল করেছেন প্যালেস্টাইনি ও আর্য ঈশ্বর। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শূদ্রের অলক্ষ্যভেদে নিহত আমার ভগবান।' এতে মনে পড়ে *মহাভারত*-এর কৃষ্ণের মৃত্যুর ঘটনা। প্রত্যাদেশকেও বাতিল করেছেন সুধীন্দ্রনাথ, এবং পরিহাস করেছেন ধর্মবোধকে। ধার্মিকেরা 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন' তত্ত্বে বিশ্বাসী, যাকে দর্শনে পরিণত করেছেন বহু দার্শনিক, যেমন লাইবনিৎস, আর একে পরিহাসও করেছেন অনেকে, যেমন ভলতেয়ার *কাঁদিদ*-এ দেখিয়েছেন উপদংশও দয়ালু ঈশ্বরের দয়া, মঙ্গলের জন্যেই তিনি দান করেছেন উপদংশ; আর সুধীন্দ্রনাথ গভীর বেদনায় বলেছেন : 'শর্বরীর রুগ্ন মুখ ভ'রে গেলে মারী গুটিকায়/ভাবিব না উৎসুক অমরা/আমাকে ও-পার থেকে আরাত্রিকে আহ্বান পাঠায়।' তাঁর কাছে ভগবান হচ্ছে 'ভগবান, ভগবান, য়িহুদির হিংস্র ভগবান',—জিহোভা, ইহুদি মহাপুরুষদের কল্পিত প্রচণ্ড ঈশ্বর, যে ক্ষিপ্ত হয় সহজে, যে এতোই পবিত্র যে তার নাম নেয়াও নিষেধ, তাই তার নাম এমনভাবে বানান করা হয়, JHWH, যাতে তা উচ্চারণও করা না যায়। সুধীন্দ্রনাথ প্রচুর ধর্ম আর ঈশ্বর দেখেছেন, তাদের সর্বশক্তির অনেক উপাখ্যান শুনেছেন, কিন্তু তার পরিচয় পান নি। অবিশ্বাসে বলেছেন :

> ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই?
> তুমি কি সত্যই
> আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন?
> তপন্ত তপন
> সাহারা-গোবির বক্ষে জ্বলে না কি তোমার আজ্ঞায়?

তাঁর ভগবান সংজ্ঞাটি চমৎকার : আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন। ভারতীয় ভগবানকে তিনি বলেছেন 'যাযাবর আর্যের বিধাতা', আর 'গুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান'। ঈশ্বর কার স্বার্থ দেখে? চিরকাল ঈশ্বর বাস করে গরিবের উঠোনে, আর স্বার্থ দেখে অসুরদের : 'তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু অসুরের তরে?' বিধাতার ক্রিয়াকলাপ দেখে পরিহাস করেছেন সুধীন্দ্রনাথ :

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।

অগ্রজের অটল বিশ্বাস কিসে? ঈশ্বরে? না, তারা বিশ্বাস করেছে, নিজেদের ক্ষমতায়। তারা সৃষ্টি করেছে সর্বশক্তিমানদের, লাগিয়েছে নিজেদের কাজে, এবং নিজেরা রয়ে গেছে কুয়োর ব্যাঙ। সুধীন্দ্রনাথের প্রার্থনা যেনো পূরণ করেছে বিধাতা, তাই এখন বিশ্বজুড়ে দেখা দিচ্ছে অটল বিশ্বাসী কূপমণ্ডূকগণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাইটিংগেলের প্রতি

যা কিছু প্রিয় আমার, যা কিছুর জন্যে নিরর্থক জীবনধারণকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় অনেকখানি, বেঁচে থাকাকে সুখকর মনে হয়, তা রাষ্ট্র নয় সংঘ নয়, সুধীদের কর্মীদের রাজনীতিবিদদের বিবর্ণতা নয়, সেগুলো খুবই সামান্য ব্যাপার, আর সেগুলোর শুরুতেই রয়েছে কবিতা। সমাজ, বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রের কবিতার দরকার নেই; কোনো রাষ্ট্রই মনে করে না যে তার সুষ্ঠু পরিচলনের জন্যে কবিতা দরকার, দরকার কবি। ১০০০ মানুষের জন্যে আমাদের ৫০ জন চিকিৎসক দরকার, এক জেলার জন্যে দরকার ১০০ প্রকৌশলী, ৩০০ নির্বাহী কর্মকর্তা, ৪টি নির্বাচিত ১টি মনোনীত প্রতিনিধি, এবং ১৫০০ পতিতা, কিন্তু কোনো কবির দরকার নেই। তবে ব্যক্তির দরকার কবিতা, সমাজের দরকার কবিতা, সভ্যতার দরকার কবিতা। মানুষ সৃষ্টিশীল, তার সম্ভাবনা অশেষ, কবিতা মানুষের সৃষ্টিশীলতার এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

কবিতার বিচিত্ররূপে মুগ্ধ হই আমি, যদিও সব কবিতাকে সমান মূল্য দিই না, যা কিছু দেখতে কবিতার মতো তাকেই কবিতা মনে করি না, কিন্তু যা কবিতা হয়ে উঠেছে, যা আমার ভেতরে ঘন্টা বাজায়, তার জন্যে আমার ভালোবাসা অন্তহীন। 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে'র সরল বর্ণনা যেমন সুখ দেয় আমাকে, বর্ষার উৎসবে পাড়া জেগে ওঠার উল্লাসে যেমন চমকে দেয়, তেমনি সুখী করে আমাকে 'হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে', বা 'জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ; নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা'। আমি তেমনি সুখী হই, দেখতে পাই অরণ্যের সামনে সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছে সে, তাকে মাইল মাইল যেতে হবে ঘুমোনোর আগে, দেখতে পাই সেই ব্ল্যাকবার্ডের চোখে, সমগ্র পর্বতমালার মধ্যে একমাত্র যা-ই শুধু অভিভূতকর, দেখতে পাই সেই পাখিটিকে মৃত্যুর জন্য যার জন্ম হয় নি, বা কোনো লাল চুলের ভিখিরিমেয়েকে, দুটি চোখের মতো যার বুক দীপ্তিময় লাবণ্যের চাপে, দেখতে পাই আকন্দ ধুন্দুল জোনাকিতে ভ'রে গেছে, যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে। অজস্র দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখতে পাই, শুনতে পাই ধ্বনির পর ধ্বনি, আর অনুভব করি এমন কিছু যার দৃশ্য নেই গন্ধ নেই ধ্বনি নেই রঙ নেই, রয়েছে অপার গভীর বিপুল বিস্তার।

কীভাবে সৃষ্টি হয় কবিতা? কী থাকে কবিতায়? কবিতায় কী থাকে, তা খুঁজে খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়, মানবিক-অমানবিক সব কিছুই তো থাকে কবিতায়, থাকে ভাষার ইন্দ্রজাল, অপরিসীম কল্পনা; কিন্তু কীভাবে সৃষ্টি হয় কবিতা, তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারি না। কোনো শিল্পকলা সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়; আগে থেকেই একটি মহৎ, বা চমৎকার কবিতা লেখার ছক কেউ তৈরি ক'রে দিতে পারে না। কেউ আগে থেকে ব'লে দিতে পারে না কী বিষয় কীভাবে লিখলে লেখাটি হয়ে উঠবে অসাধারণ কবিতা। কবিতার কাঠামো, তার ছন্দ ও মিল বা অমিল সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষা দেয়া সম্ভব, কিন্তু প্রতিটি প্রকৃত কবিতাই অভূতপূর্ব, রচিত হওয়ার আগে তার রচয়িতাও সেটি সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলতে পারেন না। কবিতা লেখা হয়ে যাওয়ার পরই শুধু উপলব্ধি বা অনুভব বা বিচার ক'রে দেখা সম্ভব সেটি কবিতা হয়েছে কিনা, বা হয়েছে কতোটা অসাধারণ। বিজ্ঞানের একটি মূলকথা ভবিষ্যদ্বাণী, কোনো সূত্র যদি নির্ভুল হয়, তবে তা সম্ভাব্য ব্যাপারগুলো সম্পর্কে করতে পারে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী; শিল্পকলায় এটা অসম্ভব। প্রতিটি শিল্পসৃষ্টিই অনন্য, সৃষ্টি হওয়ার আগে সেটি সম্পর্কে কেউ ধারণা করতে পারে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো অবধারিত; পূর্ব আবিষ্কারগুলো বিজ্ঞানীদের অবধারিতভাবে পৌঁছে দেয় পরবর্তী আবিষ্কারগুলোতে। আইনস্টাইনের আবিষ্কারের জন্যে একান্তভাবে আইনস্টাইন জরুরি নন; তিনি ওই তত্ত্ব আবিষ্কার না করলে অবধারিতভাবে অন্য কেউ তা আবিষ্কার করতেন, হয়তো কিছুটা সময় লাগতো; কিন্তু শেক্সপিয়র *হ্যামলেট* বা রবীন্দ্রনাথ 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' না লিখলে তা চিরকাল অরচিত থেকে যেতো। কোনো শিল্পসৃষ্টিই অবধারিত নয়, প্রতিটি শিল্পসৃষ্টিই ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কোনো ইঙ্গিত করে না ভবিষ্যতে 'অবসরের গান' রচিত হবে; কিন্তু নিউটনের সূত্রগুলো ইঙ্গিত করে যে একসময় অবধারিতভাবে প্রস্তাবিত হবে আইনস্টাইনীয় আপেক্ষিকতত্ত্ব। শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়, কিন্তু তার চরিত্র ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অনেকটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শিল্পস্রষ্টাদের মধ্যে কবিদেরই রয়েছে প্রবল সমালোচক সত্তা; অন্যরা সাধারণত চুপ থাকেন শিল্পকলায় নিজেদের শাখা সম্পর্কে, কিন্তু কবিরা চিরকালই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কবিতা, উদঘাটন করতে চেয়েছেন কবিতার উৎসারণ প্রক্রিয়া। তাই কবিরাই হয়ে উঠেছেন শ্রেষ্ঠ মৌলিক সমালোচক। আধুনিক কালের পশ্চিম ও পুবের প্রধান কবিরাই কবিতা ও সাহিত্যের প্রধান সমালোচক; তাঁরা মূল্যায়ন করেছেন কবিতা, ব্যাখ্যা করেছেন শিল্পকলা, বিশেষ ক'রে কবিতার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

কবি কি কবিতার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠ পুরুষ? কবিরা তাই দাবি করেন, যেমন দাবি করেছেন অনেকের মতো এজ্‌রা পাউন্ড। পাউন্ড বলেছেন :

> গাড়ি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে কি আপনি যাবেন তাঁর কাছে, যিনি গাড়ি তৈরি করেছেন এবং চালিয়েছেন, নাকি যাবেন তাঁর কাছে, যিনি শুধু শুনেছেন গাড়ির কথা?

আর দুজন মানুষ যাঁরা গাড়ি বানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আপনি কার কাছে যাবেন, যিনি ভালো গাড়ি বানিয়েছেন তাঁর কাছে, নাকি তাঁর কাছে যিনি বানিয়েছেন জোড়াতালি দেয়া একটা বস্তু?

প্রশ্নের ভেতরেই রয়ে গেছে উত্তরটি যে আমরা ভালো গাড়ি প্রস্তুতকারকের কাছেই যাবো, যেমন যাবো ভালো কবিতালেখকের কাছে। কিন্তু অসুবিধা রয়েছে গাড়ি ও কবিতাকে এক ক'রে দেখার; তার মধ্যে প্রধানটি হচ্ছে গাড়ি উৎপাদিত হয় প্রস্তুতকারকের সুনিশ্চিত পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে, তাঁর সুনিশ্চিত পরিকল্পনার বাস্তবরূপ তাঁর যানটি। প্রস্তুতকারককে আগে থেকেই জানতে হয় তিনি কী করতে যাচ্ছেন; কোনো প্রস্তুতকারকই একটু একটু ক'রে তৈরি ও সংশোধন ও তৈরি ক'রে শেষে দেখেন না তিনি কী তৈরি করলেন। তৈরি করার পর তিনি দেখেন না তার উৎপাদিত বস্তুটি গাড়ি হলো কিনা? কবিতা গাড়ির মতো উৎপাদিত হয় না, রচিত হওয়ার পর বিবেচিত হয় তা কবিতা হয়েছে কি হয় নি। তাই গাড়ি হচ্ছে উৎপাদন, কবিতা হচ্ছে সৃষ্টি। ভালো গাড়ি-উৎপাদক গাড়ি উৎপাদিত হওয়ার আগেই চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন তাঁর গাড়ির ক্রিয়াকলাপ, উপযোগিতা ও অন্যান্য সব কিছু; কিন্তু কবিতাসৃষ্টির সমস্যা হচ্ছে ভালো বা মহৎ কবিও তাঁর কবিতার সব কিছু বুঝিয়ে দিতে পারেন না, নিজেও বোঝেন না; কেননা কবিতার মধ্যে রহস্যের ভাগ অনেক বেশি। গাড়িতে কোনো রহস্য নেই, কবিতা ভ'রেই রয়েছে রহস্য। অনেক ভালো কবি যেভাবে কবিতা লিখতে চান বা অন্যদের লেখার পরামর্শ দেন, নিজেরা সেভাবে লেখেন না, বা পারেন না; তাই ভালো কবিও সব সময় নির্ভরযোগ্য নন। তবে কবির, ভালো বা প্রধান কবির, কবিতাবিষয়ক কথা মূল্যবান; তা জানিয়ে দেয় তাঁদের কবিতার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, অন্যদের বা সব কবিতার নয়, তাঁদের কবিতার।

কোনো কবি যখন ব্যাখ্যা করেন কবিতার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, তখন কবিতা বলতে তিনি কোনো বিমূর্ত শাশ্বত বিশ্বজনীন ব্যাপারে বোঝেন না, বোঝেন নিজের কবিতা। তিনি বলেন নিজের কবিতাসৃষ্টির প্রক্রিয়ার কথা, যেভাবে তিনি নিজে কবিতা সৃষ্টি করেন বা করতে চান, তা বোঝার চেষ্টা করেন তিনি ওই ব্যাখ্যায়, তবে সব সময় বুঝে ওঠেন না। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ বলেন ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ নিজে কীভাবে কবিতা লেখেন বা লেখার কথা ভাবেন, রবীন্দ্রনাথও বলেন নিজেরই কথা; কীভাবে অন্যরা লেখেন বা ভবিষ্যৎ কবিরা লিখবেন, সেকথা বলেন না, যদিও আমরা কখনো কখনো মনে করি কবিতা লিখতে হবে ওই মহৎদের পরামর্শ অনুসারে। শিল্পকলা এমন এলাকা যেখানে, শুধু নিজের অন্তরের পরামর্শ ছাড়া, কারো পরামর্শই গ্রহণযোগ্য নয়; মহৎ কবির পরামর্শও নিরর্থক গৌণ কবির কাছে। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শুধু পরামর্শ দিতে পারেন রবীন্দ্রনাথকে, এলিঅট পারেন এলিঅটকে; আর কাউকে নয়। শিল্পকলায় অন্যের পরামর্শ গ্রহণ হচ্ছে আত্মহত্যা। তবে অন্যের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য না হ'লেও শোনার মতো, অন্যের

অভিজ্ঞতা সাহায্য করতে পারে নিজের শিল্পকলার পথ তৈরিতে। কবিরা নিজেদের কবিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব'লে যা রটনা করেন পদ্যে বা গদ্যে, তা তাঁরা যে সব সময় মানেন বা মেনে চলতে পারেন, তা নয়; কারণ সৃষ্টি আর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা ভিন্ন ব্যাপার। শিল্পসৃষ্টিতে অসচেতন প্রক্রিয়ার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কবি জানেন না কখন কোন শব্দ বা চিত্রকল্প এসে জুড়ে বসবে তার পংক্তি বা স্তবকে।

কবিতা চিরকাল এক থাকে না। ভাষা ও ব্যক্তিগত মানবিক বোধের উৎকৃষ্ট সমন্বয়ই কবিতা; আর যুগে যুগে ভাষা ও মানবিক বোধের বিভিন্ন প্রান্তের ওপর পড়ে জোর, এবং কবিতা হয়ে ওঠে ভিন্ন। পশ্চিমের আধুনিক কবিরা, যাঁদের প্রভাব খুবই ব্যাপক আধুনিক বাঙলা কবিতার ওপর, কবিতা সম্পর্কে পেশ করেছেন বহু ব্যক্তিগত তত্ত্ব; সেগুলোর মধ্যে সাড়াজাগানো একটি হচ্ছে কবিতার নৈর্ব্যক্তিকতা ও বিজ্ঞানধর্মিতা, কিন্তু খুব বেশি কবি তা মেনে চলতে পারেন নি। বিজ্ঞান এক শতকেরও বেশি সময় ধ'রে প্রলুব্ধ ক'রে আসছে সাহিত্যকে, ওই প্রলোভনে প্রথম ধরা দিয়েছিলেন প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকেরা। জোলা উপন্যাসকে ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞান, কিন্তু শেষে দেখা গেছে বিজ্ঞানের থেকে মানবিক উপাদানের জন্যেই তাঁর, প্রাকৃতবাদীদের, উপন্যাস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবিদের অনেকেই বিজ্ঞানকে ঈর্ষা করেছেন, ভুলভাবে কবিতাকে সম্ভ্রান্ত ক'রে তুলতে চেয়েছেন; কবিতায় আয়ত্ত করতে চেয়েছেন বিজ্ঞানের অবস্থা, চেয়েছেন কবিতার নৈর্ব্যক্তিকীকরণ। এর প্রধান প্রবক্তা টি এস এলিঅট। তাঁর মতে শিল্পীদের অগ্রগতি হচ্ছে ধারাবাহিক আত্মবিসর্জন, ধারাবাহিক ব্যক্তিত্ব নির্বাপণ। তাঁর মতে এ-নৈর্ব্যক্তিকীকরণ প্রক্রিয়াই শিল্পকলা অর্জন করে বিজ্ঞানের অবস্থা। সৃষ্টির এ-প্রক্রিয়াকে তিনি তুলনা করেছেন গবেষণাগারের একটি নিরীক্ষাপ্রক্রিয়ার সাথে, কবির মন তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে প্ল্যাটিনাম টুকরোর মতো অনুঘটক। রোম্যান্টিকের কাছে কবির মনই ছিলো বিধাতা, মন যা সৃষ্টি করে তা-ই শুধু সত্য; আর তাঁর কাছে মন হয়ে ওঠে অনুঘটকমাত্র, যার কাজ নিজে অপরিবর্তিত থেকে বিভিন্ন আবেগের বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। এলিঅট নিজে খুব বিজ্ঞানপ্রবণ ছিলেন না বরং ধর্মের মতো অপবিশ্বাসের প্রতিই ঝোঁক ছিলো তাঁর বেশি; আর এখানে তিনি যে-বিজ্ঞানটুকু চর্চা করেছেন, তাও খুব উচ্চতর রসায়ন নয়, একেবারেই প্রাথমিক রসায়নশাস্ত্র। মন প্ল্যাটিনামের মতো নিষ্ক্রিয় পদার্থ নয়। এলিঅট পরে অবশ্য এমন কথা বলেছেন, যাতে বাতিল হয়ে যায় তাঁর নৈর্ব্যক্তিকীকরণতত্ত্ব। তিনি বলেছেন যাঁদের রয়েছে ব্যক্তিত্ব ও আবেগ, শুধু তাঁরাই জানেন ওই ব্যক্তিত্ব ও আবেগ থেকে মুক্তির কী অর্থ। তবে নৈর্ব্যক্তিক কবিতাও কবিতা, তা লিখেছেন অনেকেই, এলিঅটও; তার অসাধারণ রূপও অসাধারণ, কিন্তু কবিতাকে নৈর্ব্যক্তিক হ'তেই হবে, তা নয়। তাঁর একটি উক্তি—ভালো কবিতা বোঝার অনেক আগেই সংক্রামিত হয়—একসময় খুবই

গৃহীত ছিলো; কিন্তু এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে ওটি সম্পর্কে। সত্যিই কি ভালো কবিতা বোঝার অনেক আগেই ভেতরে ঢোকে, মনে বা হৃদয়ে? অনেক বাজে জিনিশও কি ঢুকে যায় না আমাদের মনে, এবং অনেক ভালো জিনিশও কি বুঝতে অনেক সময় লাগে না আমাদের, বা কখনোই বুঝে উঠি না আমরা? ভালোর থেকে খারাপই তো মানুষের মনে বেশি ঢোকে; আমরা কি দেখতে পাই না উৎকৃষ্ট কবি ও কবিতা উপেক্ষিত আর নন্দিত নিকৃষ্ট কবি ও কবিতা? সুধীন্দ্রনাথের 'যযাতি' বাঙলার অনেক কবিরও মনে এখনো ঢোকে নি, অনেকের মনে কখনোই ঢুকবে না; কিন্তু বিজ্ঞাপনের বা হিন্দি গানের বহু নিকৃষ্ট ধ্বনিপুঞ্জ ঢুকেছে তাদের মনে। আমরা কি মনে করবো 'যযাতি'র থেকে ওগুলো উৎকৃষ্ট কবিতা?

ইয়েট্‌স্ যখন কবি, এমনকি অপবিশ্বাসী কবি, তখন তিনি অসাধারণ; তবে অপবিশ্বাস ব্যাখ্যা করার সময় তিনি হাস্যকর; তিনি যখন কবিতা লেখার কথা বলেন, তখন বলেন কবিতা লেখারই কথা। অডেন চমৎকার কথা বলেছেন যে আজকাল সব ধরনের যোগ্যতাহীন হ'লেই তরুণতরুণীরা মনে করে তাদের রয়েছে কবিপ্রতিভা। কিন্তু তরুণতরুণীদের যোগ্য বা প্রতিভাবান ক'রে তোলার জন্যে তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন কবি হওয়ার যে-পাঠক্রম, তা কোনোক্রমেই কাউকে কবি হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। কবি যে অশিক্ষিত হবেন, বা অশিক্ষিত হ'লেই কেউ কবি হবেন, তা নয়; কবি অবশ্যই শিক্ষিত হবেন, তবে শিক্ষা কাউকে কবি হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। অডেনের পাঠক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার পর ভালো প্রশংসাপত্র পাবে অনেকেই, কিন্তু তাদের অনেকেরই কবি না হওয়ার সম্ভাবনা বিপুল। সম্পূর্ণ বাজে কথা হয়েও কোনো লেখা হ'তে পারে, হাউজম্যানের ভাষায়, 'র‍্যাভিশিং পোয়েট্রি'; কবিতার জন্যে শিক্ষা দরকারী নয়; কিন্তু আধুনিক কালে শিক্ষা কবিতার সঙ্গে শত্রুতা না ক'রে মিত্রতাই করেছে বেশি। শিক্ষা ছাড়া জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথকে পেতাম না আমরা, পেতাম এমন অনেককে যেমন পেয়েছি অডেনকে। অডেনের পাঠক্রম হাস্যকর, কিন্তু আমি অশিক্ষিত কবি চাই না; কবিতা চাই, কবি শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যা-ই হোক। তবে একালে অশিক্ষিত কবি হওয়ার বিপদ খুবই বেশি, বাঙলায় তা এখন বেশ চোখে পড়ে। অশিক্ষিত হওয়ার একটি সুবিধা হচ্ছে তাতে প্রলাপ বকা বা মাতলামো বা ফাজলামো করা যায় দ্বিধাহীনভাবে, এবং তাকে কবিতা ব'লে মনে করতে লজ্জা তো লাগেই না, বরং তাতেই অশিক্ষিতরা গৌরব বোধ করে।

পশ্চিমের কয়েকজন আধুনিক কবি কবিতা সম্পর্কে কী বলেন, তা দেখতে পারি। কয়েকজনের কবিতা সম্পর্কে কথা এমন :

ডব্লিউ বি ইএট্‌স্

কবি সব সময় লেখেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে, জীবনের ট্র্যাজেডি থেকে জন্ম নিতে পারে তাঁর উৎকৃষ্টতম রচনা, তা যা-ই হোক, অনুশোচনা, ব্যর্থ প্রেম, বা

নিতান্ত নিঃসঙ্গতা; যেমন হয় প্রাতঃরাশ টেবিলে তেমন সরাসরি কারো সাথে তিনি কথা বলেন না, সব সময়ই থাকেন এক অলীক ছায়ামূর্তিপরম্পরা। দান্তে ও মিল্টনের ছিলো পুরাণ, শেক্সপিয়রের ছিলো ইংরেজি ইতিহাস বা প্রথাগত রোমান্সের চরিত্র; এমনকি যখন কবি বেশিরভাগই প্রতিভাত হন নিজে, যখন তিনি রেলি এবং ক্ষমতাবানদের দেন মিথ্যা, অথবা শেলি 'এমন স্নায়ু যার ওপর লতিয়ে চলে অননুভূত পার্থিব পীড়ন,' অথবা বায়রন যখন 'আত্মা ক্ষয় করে বক্ষকে' যেমন 'তলোয়ার ক্ষয় করে তার খাপকে,' তিনি কখনোই সে-আকস্মিকতা ও অসামঞ্জস্যের সমষ্টি নন যা বসে প্রাতঃরাশের জন্যে; তিনি পুনর্জন্ম নিয়েছেন এমন এক ভাবরূপে, যা অভিপ্রেত, সম্পূর্ণ।

শৈলি প্রায় সবখানিই অসচেতন। আমি যা করতে চেয়েছি তা আমি জানি, আমি যা করেছি তা সামান্যই জানি।... আমি পরিকল্পনা নিই ছোটো ছোটো লিরিক বা কাব্যনাটক লেখার যাতে প্রতিটি উক্তি হবে সংক্ষিপ্ত ও সংহত, বোনা হবে নাট্যিক উদ্বেগ, এবং আমি তা করেছি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে কেননা তখনকার তরুণ ইংরেজ কবিরা সংকটমুহূর্তে লিখছিলেন আবেগে, যদিও তাঁদের ধীর-অগ্রসর ধ্যান ফিরে আসতো অনতিবিলম্বে। তখন, এবং এ-ইংরেজি কবিতা আমার নেতৃত্বই মেনে নিয়েছে, আমি ইংরেজি কবিতার ভাষা, ও সংরক্ত স্বাভাবিক উক্তির ভাষাকে অভিন্ন ক'রে তোলার চেষ্টা করেছি। স্বগতভাষণের সময় যে-ভাষা সবচেয়ে স্বাভাবিকভাবে আসে আমি তাতেই লেখার চেষ্টা করেছি, যেমন আমি প্রাত্যহিক জীবনে সারাদিন ক'রে থাকি... বছর বিশেক আগে আমি আবিষ্কার করি যে আমাকে খুঁজতে হবে, ওয়র্ডস্ওঅর্থ যেমন মনে করেছিলেন, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত শব্দ, তা নয় : আমাকে খুঁজতে হবে একটি শক্তিশালী ও সংরক্ত বাক্যসংগঠন, এবং যতি ও স্তবকের মধ্যে সম্পূর্ণ অভিন্নতা। যেহেতু সংরক্ত বিষয়বস্তুর জন্যে আমার দরকার সংরক্ত বাক্যসংগঠন, তাই আমি নিজেকে বাধ্য করেছি প্রথাগত ছন্দরীতি গ্রহণ করতে যা বিকশিত হয়েছে ইংরেজি ভাষার সাথে। এজ্রা পাউন্ড, টার্নার, লরেন্স প্রশংসনীয় মুক্তছন্দ লিখেছেন, আমি পারি নি।

এজ্‌রা পাউন্ড

তাই হচ্ছে 'চিত্রকল্প' যা বিশেষ মুহূর্তে ত্বরিত উপস্থিত করে এক মনন ও আবেগগত গূঢ়েষা। আমি 'গূঢ়েষা' শব্দটি ব্যবহার করছি হার্ট প্রমুখ নতুনতর মনোবিজ্ঞানীদের পারিভাষিক অর্থে, যদিও প্রয়োগের সময় আমরা পুরোপুরি একমত নাও হ'তে পারি।

এমন 'গূঢ়েষা'র উপস্থাপন তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করে এক আকস্মিক মুক্তির অভিভাব; সময় সীমা ও স্থান সীমার সেই অভিভাব; সেই আকস্মিক বিকাশের অভিভাব, যার অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি শ্রেষ্ঠতম শিল্পকলারাশির মুখোমুখি। বহুখণ্ড রচনাবলীর থেকে সারাজীবনে একটি চিত্রকল্প উপহার দেয়াও উত্তম।... যারা নিজেরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লেখে নি তাদের সমালোচনায় কান দিয়ো না। গ্রিক কবি ও নাট্যকারদের লেখা, ও ছন্দ বিশ্লেষের জন্যে গ্রিসীয়-রোমীয় ব্যাকরণবিদদের বানানো তত্ত্বের মধ্যে যে গরমিল রয়েছে তার কথা ভেবে দেখো।

এমন কোনো অনাবশ্যক শব্দ, বিশেষণ ব্যবহার কোরো না যা কোনো কিছু প্রকাশ করে না। 'শান্তির অস্পষ্ট এলাকা'র মতো উক্তি ব্যবহার কোরো না। এটা চিত্রকল্পকে ভোঁতা ক'রে ফেলে। এটা মূর্ত বস্তুর সাথে মিশিয়ে দেয় বিমূর্তকে। লেখক যখন বুঝতে পারে না যে স্বাভাবিক বস্তুই সব সময় উপযুক্ত প্রতীক, তখনই হয় এর উৎপত্তি।
বিমূর্তকরণ থেকে বিরত থাকো। উৎকৃষ্ট গদ্যে যা বলা হয়ে গেছে নিম্নমানের পদ্যে তা আবার বোলো না। এটা কখনো মনে কোরো না যে উৎকৃষ্ট গদ্যের অবর্ণনীয় শিল্পকলাকে এড়িয়ে তোমার রচনাকে পংক্তির পরিমাপে কেটে তুমি প্রতারণা করতে পারবে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে।
আজ বিশেষজ্ঞ যাতে ক্লান্তি বোধ করে আগামীকাল জনগণ তাতে ক্লান্তি বোধ করবে। কখনো মনে কোরো না যে কাব্যকলা কোনোভাবেই সঙ্গীতকলার থেকে সহজ, বা ভেবো না যে একজন পিয়ানোশিক্ষক সাধারণত যতোটা সময় সঙ্গীতকলা চর্চায় ব্যয় করে অন্তত ততোটা প্রয়াস কাব্যকলা চর্চায় ব্যয় করার আগে তুমি কোনো বিশেষজ্ঞকে খুশি করতে পারবে। যতোটা পারো মহৎ শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হও, তবে তোমার ঋণ সরাসরি স্বীকার, বা গোপন করার মতো শোভনতা থাকা দরকার।
প্রভাবিত হওয়া বলতে তোমার প্রিয় এক বা একাধিক কবির রচনা থেকে বিশেষ ধরনের অলঙ্কারধর্মী শব্দাবলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসাকে বোঝো না।
কোনো অলঙ্কারই ব্যবহার কোরো না বা ভালো অলঙ্কার ব্যবহার কোরো।

টি এস এলিঅট

ঐতিহ্যের, উত্তরাধিকারের, একমাত্র রূপ যদি হয় আমাদের অব্যবহিতপূর্ব প্রজন্মের সাফল্যের কৌশলগুলো অন্ধ বা ভীরুভাবে অনুসরণ করা, তাহলে 'ঐতিহ্য'কে সুস্পষ্টভাবে নিরুৎসাহিত করতে হবে। আমরা এমন অনেক সরল স্রোতকে বালুকায় হারিয়ে যেতে দেখেছি; আর অভিনবত্ব পুনরাবৃত্তির থেকে উৎকৃষ্ট। ঐতিহ্য আরো ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না, এবং আপনি যদি এটা চান তবে আপনাকে তা অর্জন করতে হবে কঠোর শ্রমে। প্রথমত এর রয়েছে ইতিহাসবোধ, যা আমরা অপরিহার্য ব'লে গণ্য করতে পারি তাঁর জন্যে যিনি পঁচিশ বছর বয়স্ক হওয়ার পরও কবিতা লিখতে চান; এবং ইতিহাসবোধের অন্তর্ভুক্ত শুধু অতীতের অতীতত্ব নয়, বরং তার উপস্থিতির বোধ; ইতিহাসবোধ কাউকে শুধু তার নিজের প্রজন্মকে অস্থিতে ধারণ ক'রে লিখতে বাধ্য করে না, বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করে এমন অনুভূতি যে হোমার থেকে শুরু ক'রে সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য এবং তার মধ্যে তার নিজের দেশের সাহিত্যের যেনো রয়েছে এক যুগপৎ অস্তিত্ব এবং তা সৃষ্টি করে এক যুগপৎ শৃঙ্খলা। এ-ইতিহাসবোধ, যা হচ্ছে শাশ্বতের বোধ ও সমকালের বোধ, এবং একইসাথে শাশ্বত ও সমকালের বোধ, লেখককে করে এতিহ্যমণ্ডিত। একই সাথে এটাই লেখককে তীব্রভাবে সচেতন করে কালপ্রবাহে তার নিজের স্থান সম্পর্কে, তার সমকালীনত্ব সম্পর্কে।
কোনো কবির, কোনো শিল্পের শিল্পীরই, একলা সম্পূর্ণ অর্থ নেই। তার তাৎপর্য, তার মূল্যায়ন হচ্ছে মৃত কবি ও শিল্পীদের সাথে তার সম্পর্কের মূল্যায়ন। আপনি

তাকে একলা মূল্যায়ন করতে পারেন না; প্রতিতুলনার জন্যে তাকে মৃতদের মধ্যে বসাতে হবে। আমি একে শুধু ঐতিহাসিক সমালোচনা ব'লে মনে করি না, একে মনে করি নান্দনিক সমালোচনার একটি সূত্র ব'লে।

যা ঘটে তা হচ্ছে শিল্পীর আপন সত্তা ধারাবাহিকভাবে বিসর্জন, কেননা তিনি বিশেষ মুহূর্তে এমন জিনিশের প্রতি সমর্পিত যা অধিকতর মূল্যবান। শিল্পীর ক্রমাগ্রসরণ হচ্ছে ধারাবাহিক আত্মোৎসর্গীকরণ, ব্যক্তিসত্তার ধারাবাহিক নির্বাপণ।

এ-নৈর্ব্যক্তিকীকরণ প্রক্রিয়া ও তার সাথে ঐতিহ্যের সম্পর্কের ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। এ-নৈর্ব্যক্তিকীকরণ প্রক্রিয়ায়ই, বলা যেতে পারে, শিল্পকলা, বিজ্ঞানের অবস্থার দিকে এগিয়ে চলে। আমি তাই, ইঙ্গিতপূর্ণ সাদৃশ্যরূপে, আমন্ত্রণ জানাই সে-ক্রিয়া বিবেচনা করার জন্যে যা ঘটে যখন এক টুকরো প্ল্যাটিনাম ঢুকিয়ে দেয়া হয় অম্লজান ও সালফার ডাইঅক্সাইডপূর্ণ আধারে।...

সাদৃশ্যটি ছিলো বিক্রিয়াসংগঠকের। পূর্বোল্লিখিত গ্যাস দুটি যখন মেশানো হয় প্ল্যাটিনাম সূত্রের উপস্থিতিতে, তখন সেটি উৎপাদন করে সালফিউরাস অ্যাসিড। শুধু প্ল্যাটিনামের উপস্থিতিতেই ঘটে এ-মিশ্রণ; তবে এ-নবগঠিত অ্যাসিডে প্ল্যাটিনামের কোনো চিহ্নও থাকে না, এবং প্ল্যাটিনাম টুকরোটি থাকে অস্পৃষ্ট : এটা থাকে নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ, এবং অপরিবর্তিত। কবির মন প্ল্যাটিনামের টুকরো। এটা লোকটির নিজের অভিজ্ঞতার ওপর আংশিক বা একচেটে ক্রিয়া করতে পারে; তবে, শিল্পী যতো বিশুদ্ধ হবেন ততোই সম্পূর্ণভাবে তার ভেতর বিচ্ছিন্নতা ঘটবে সে-লোকটির যে ফলভোগ করে আর সে-মনের যে সৃষ্টি করে; ততোই বিশুদ্ধভাবে মন পরিপাক ও পরিবর্তিত রূপ দেবে সংরাগকে, যা তার উপাদান। তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ, যে-আবেগ জেগেছে তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ফলে, তার জন্যে কোনোভবেই কবি উল্লেখযোগ্য বা আকর্ষণীয় নন। তাঁর বিশেষ আবেগ হ'তে পারে সরল, বা আকাঁড়া, বা একঘেয়ে। তাঁর কবিতার আবেগ হবে অত্যন্ত জটিল বস্তু, তবে তাতে থাকবে না সে-সব মানুষের আবেগের জটিলতা যাদের জীবনে রয়েছে খুবই জটিল বা অস্বাভাবিক আবেগ। আসলে কবিতায় বাতিকগ্রস্ততার এক ভ্রান্তি হচ্ছে যে তা নতুন মানবিক আবেগ প্রকাশের খোঁজে থাকে; এবং ভুল জায়গায় অভিনবত্ব খোঁজ ক'রে আবিষ্কার করে বিকৃতিকে। নতুন আবেগ খোঁজা কবির কাজ নয়, তার কাজ সাধারণ আবেগগুলো ব্যবহার করা, এবং তাকে কবিতায় পরিণত করতে গিয়ে এমন অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে যা আসলেই আবেগ নয়। যে-আবেগের অভিজ্ঞতা তার নেই, আর যে-আবেগ তার পরিচিত দু-ই তার কাজে লাগে। ফলত, আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে 'আবেগের প্রশান্ত পুনশ্চয়ন' একটি অযথাযথ সূত্র।

শিল্পকলার আবেগ নৈর্ব্যক্তিক।

কবিতায়, সাধারণ অর্থে, 'অর্থ'-এর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে (আবারও আমি বিশেষ ধরনের কবিতার কথাই বলছি, সব ধরনের নয়) পাঠকের একটি অভ্যাসকে তৃপ্ত করা, তার মনকে বিনোদিত ও শান্ত রাখা, যখন কবিতা তার ভেতরে কাজ ক'রে যায় : অনেকটা তেমনভাবে যেমন কাল্পনিক চোর গৃহ-কুকুরের জন্যে রাখে এক টুকরো চমৎকার মাংস।

ডব্লিউ এইচ অডেন

এটা বিস্ময়কর যে দু-লিঙ্গেরই অসংখ্য তরুণতরুণীকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে তারা জীবনে কী হ'তে চায়, তখন তারা 'আমি উকিল, সরাইখানাচালক, কৃষক হ'তে চাই'র মতো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন উত্তর যেমন দেয় না, তেমনি দেয় না 'আমি অভিযাত্রী, গাড়িদৌড়বিদ, ধর্মপ্রচারক, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হ'তে চাই'র মতো রোম্যান্টিক উত্তরও। বিস্ময়করভাবে বিপুলসংখ্যক বলে 'আমি লেখক হ'তে চাই,' এবং লেখা বলতে তারা 'সৃষ্টিশীল' লেখা বুঝিয়ে থাকে। এমনকি যদি তারা বলে 'আমি সাংবাদিক হ'তে চাই,' তখন তারা একথা বলে এ-মোহ থেকে যেনো এ-পেশায় থেকেও তারা সৃষ্টি করতে পারবে; যদি তাদের আসল বাসনা হয় টাকা করা, তবে তারা বেছে নেবে বিজ্ঞাপনের অতিবৈতনিক উপসাহিত্যিক কাজ। এ-সম্ভাব্য লেখকদের বড়ো অংশেরই কোনো লক্ষণীয় সাহিত্যপ্রতিভা নেই। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়; কোনো পেশার জন্যেই লক্ষণীয় প্রতিভা খুব সুলভ নয়। যা বিস্ময়কর, তা হচ্ছে কোনো পেশার জন্যেই লক্ষণীয় কোনো প্রতিভা ছাড়াও এতো বেশি সংখ্যক তরুণতরুণী লেখাকেই সমাধান ব'লে মনে করে। কেউ কেউ হয়তো আশা করবেন যে তাদের হয়তো চিকিৎসা বা প্রকৌশল বা অন্য কিছুর প্রতিভা রয়েছে, তবে আসলে তা ঠিক নয়। আমাদের যুগে, যদি কোনো তরুণ প্রতিভাহীন হয় তাহলেই সে মনে করে যে তার রয়েছে লেখার প্রতিভা।

কবিদের জন্যে আমার দিবাস্বপ্নের মহাবিদ্যালয় পাঠক্রম হবে নিম্নরূপ :

১) ইংরেজি ছাড়াও কমপক্ষে একটি ধ্রুপদী ভাষা, গ্রিক বা হিব্রু, এবং দুটি আধুনিক ভাষা শিখতে হবে।

২) এসব ভাষায় লেখা কবিতার হাজার হাজার পংক্তি কণ্ঠস্থ করতে হবে।

৩) পাঠাগারে সাহিত্য সমালোচনামূলক কোনো বই থাকবে না, এবং ছাত্রদের একমাত্র সমালোচনামূলক অনুশীলন হবে প্যারোডি লেখা।

৪) সব ছাত্রকে ছন্দ, অলঙ্কার ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পাঠ নিতে হবে, এবং প্রতিটি ছাত্রকে গণিত, প্রাকৃতিক ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, খনিবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, পুরাণ, প্রার্থনাবিদ্যা, পাকপ্রণালি প্রভৃতি পাঠের মধ্য থেকে তিনটি পাঠ নিতে হবে।

৫) প্রতিটি ছাত্রকে একটি গৃহপালিত পশু পালতে হবে এবং একটি বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

কবিকে শুধু কবি হিশেবে নিজেকে শিক্ষিত করলেই চলবে না; সে কীভাবে জীবিকা অর্জন করবে সে-কথাও তাকে ভাবতে হবে। উৎকৃষ্টতম হচ্ছে সে এমন একটি পেশা নেবে যাতে তাকে কোনোভাবেই শব্দ ব্যবহার করতে না হয়।

ডাইল্যান টমাস

শুরুতে আমি কবিতা লিখতে চেয়েছি, কেননা আমি শব্দের প্রেমে পড়েছিলাম। আমার জানা প্রথম কবিতা হচ্ছে ছেলেভোলানো ছড়া, এবং ওগুলো আমি নিজে পড়তে শেখার আগে আমি শুধু সেগুলোর শব্দগুলোকে ভালোবেসেছি, শুধু শব্দগুলোকে। সেগুলোর অর্থ কী, সেগুলো কিসের প্রতীক, তা ছিলো গৌণ ব্যাপার।...আমি যতোই পড়তে থাকি, তার সবটা অবশ্য পদ্য ছিলো না, শব্দের

প্রকৃত জীবনের প্রতি আমার ভালোবাসা বাড়তে থাকে, এক সময় আমি বুঝতে পারি আমাকে সব সময় থাকতে হবে তাদের নিয়ে ও তাদের মধ্যে। আমি জানতাম আমি হবো শব্দের লেখক, আর কিছু নয়। আমার কাছে প্রথম ব্যাপার ছিলো তাদের ধ্বনি ও অর্থ অনুভব করা ও জানা; ওই শব্দ দিয়ে আমি কী করতে যাচ্ছি, কী কাজে তাদের আমি লাগাতে যাচ্ছি, তাদের দিয়ে আমি কী বলতে যাচ্ছি, তা ছিলো পরের ব্যাপার।

একদিন যারা কবি হবে, তারা যে-কবিতার স্বাদ প্রথম পায়, তা চিরজীবী দাগ কাটে তাদের মনে; যেমন ডাইল্যান টমাসের মনে ও কবিতায় সব সময়ই ছিলো ছেলেভোলানো ছড়ার দাগ। পড়তে শেখার পর তারা পাঠ্যপুস্তকে প্রথম পরিচিত হয় এমন কবিতার সাথে, যার শিরোনামের নিচে বা ওপরে থাকে কবির নাম। পাঠ্যপুস্তক তাদের কবিতার সাথে ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলে, সৃষ্টি করতে থাকে বুকের ভেতরে নতুন ধরনের আবেগ, স্বপ্ন দেখাতে থাকে, যে-স্বপ্ন দেখতে হয় জেগে জেগে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক রক্ষণশীল, তাতে চিরকালের ও সমকালের শ্রেষ্ঠ কবিতার উপস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়, খারাপ ও অকবিদের কবিতাই থাকে বেশি; এবং উচ্চতর শ্রেণীতে যাওয়ার পরও সমকালের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না পাঠ্যপুস্তকে। আমাদের অঞ্চলে পাঠ্যপুস্তক ধ'রে রাখে সরকারি রুচি, ও ওই সময়ের কিছু নিকৃষ্ট মানুষের কাব্যবোধ, যারা পদ্য বুঝলেও কখনো কবিতা দ্বারা আলোড়িত হয় না। এলিঅট যে বলেছিলেন উৎকৃষ্ট কবিতা বোঝার অনেক আগেই সংক্রামিত হয়, এটা সত্য নয় তাদের বেলা; তাই পাঠ্যপুস্তক সম্ভাব্য কবিদের উপকারে আসে না। কোনো বিশেষ সময়ে সে-ই সম্ভাব্য কবি, যে তার কবিতা লেখা শুরুর কালের আধিপত্যশীল কবিতাকে অস্বীকার করে, খোঁজে নতুন কবিতা। শুরুতেই কেউ নতুন সিঁড়িতে পা রাখতে পারে না, প্রচলিত সিঁড়িতে পা রেখেই পা বাড়াতে হয় অন্য ও নিজস্ব সিঁড়ির দিকে। কবিকে তৈরি ক'রে নিতে হয় নিজের কাব্যতত্ত্ব। দশকে দশকে জন্ম নেয় না প্রধান কবি, মহৎ কবি জন্ম নেয়া অনেকটা শতাব্দীর ঘটনা। প্রধান কবি জন্ম নেয়া শুধু প্রতিভার নয়, কালেরও আনুকূল্যের ব্যাপার; কবিতার একটি আধিপত্যশীল ধারা যখন নিষ্ফলা হয়ে আসে, তখনই আসে নতুন ধারা ও প্রধান কবি বা কবিদের কাল।

কবিতার বয়স কয়েক হাজার বছর, তবে কবিতা সম্পর্কে আমরা আজো নিশ্চিত নই, হয়তো কখনোই নিশ্চিত হবো না। কবিতা সম্পর্কে নানা বাজেকথা চলে এখানে, চলে পৃথিবী জুড়েই, এগুলোর একটি হচ্ছে দর্শন; বলা হয় কবির থাকতে হবে নিজস্ব দর্শন, কবিতায় থাকতে হবে দর্শন। কবিকে কি হ'তে হবে দার্শনিক? দর্শনের কাছে কি আমরা দাবি করবো যে দর্শনে থাকতে হবে কবিতা, দার্শনিককে হ'তে হবে কবি? কবিতায় নানা চিন্তা থাকবে, আছে শুরু থেকেই, চিন্তা কবিতায় কবিতা হয়ে আসবে, যেমন এলিঅট অতিশয়োক্তি করেছেন যে চিন্তা কবিতায় গোলাপের সুগন্ধের মতো আসবে; কিন্তু কবিতায় দর্শন থাকবে, এটা দর্শন ও কবিতা সম্পর্কে খুবই ভুল ধারণা। যাঁরা এটায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা

ভেতরে ভেতরে কবিতার প্রতিপক্ষ; তাঁরা কবিতা উপভোগ করেন না, কবিতাকে কবিতার জন্যে মূল্যবান মনে করেন না, এমনকি সন্দেহ পোষণ করেন কবিতা সম্পর্কে, কবিতার সৌন্দর্য তাঁদের তৃপ্তি দেয় না। তাই তাঁরা মূল্যবান কিছু চান, তাঁদের কাছে মূল্যবান হচ্ছে 'দর্শন'। কবিতা ও দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন জর্জ বোয়াস; তিনি খোলাখুলি বলেছেন কবিতায় যে-চিন্তা বা দর্শন মেলে অধিকাংশ সময়ই তা অত্যন্ত পচা ও ভুল; ষোলো বছরের বেশি বয়স্ক কেউ কবিতায় কী বলা হচ্ছে তার জন্যে কবিতা পড়ে না। এলিঅট বলেছেন দান্তে বা শেক্সপিয়র কেউই প্রকৃত অর্থে যাকে চিন্তা বলে, তেমন চিন্তা করেন নি। যেসব কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ দর্শন রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতাই ধরা যাক, সেগুলো খুঁজলে কী পাই আমরা? সেগুলোতে পাই জীবন, মৃত্যু, জীবনের তাৎপর্য, সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্পর্কে কতকগুলো খুবই তুচ্ছ পুরোনো কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দর্শন খুঁজলে কী পাই? তাঁর ভালো কবিতাগুলোতে দর্শন পাই না, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই এতো ভালো যে দর্শনের কোনো দরকার পড়ে না সেগুলোর, তাঁর খারাপ কবিতাগুলোতেই পাই তথাকথিত দর্শন। কী পাই সেগুলোতে? পাই কতকগুলো পুরোনো প্রশ্ন আর পুরোনো উত্তর বা নিরুত্তরতা। রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতা একটু বিচার করতে পারি, যেটি তাঁর ভাবুক ভক্তদের খুবই ভাবিত করে, গভীর দর্শন কবিতাটিতে লুকিয়ে আছে ভেবে তাঁরা কবিতাটির মুখোমুখি ভয়ে ভয়ে দাঁড়ান। কবিতাটির নাম 'প্রথম দিনের সূর্য' (শেষ লেখা), লিখেছিলেন মৃত্যুর তিন দিন আগে :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি?
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিমসাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি?
পেল না উত্তর॥

কবিতাটির 'প্রথম দিনের সূর্য', 'প্রশ্ন', 'সত্তার নূতন আবির্ভাব', 'কে তুমি', 'শেষ প্রশ্ন', 'মেলে নি উত্তর', 'পেল না উত্তর' এগুলোকে বড়ো দার্শনিক জিজ্ঞাসা ব'লে মনে করেন ভাবুকেরা, এবং এগুলোর মধ্যে পরম উত্তরও লুকিয়ে আছে ভেবে তাঁরা মুগ্ধ হন। কবিতাটি ভালো ক'রে পড়লে বুঝি এটি সুন্দর ধাঁধা;—ধাঁধার মতোই প্রথম বুঝতে একটু কষ্ট হয়, এবং ধাঁধার মতোই বুঝে

ফেলার পর মনে হয় তুচ্ছ। ধাঁধার শুরু 'প্রথম দিনের সূর্য' পদটিতেই। 'প্রথম দিনের সূর্য' পদটি শুরুতেই পাঠককে একটু চমকে দেয়, মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সূর্যের জন্মের পর সূর্যের প্রথম দিনের কথা বলেছেন, যে-সূর্য জন্মেই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলো, 'কে তুমি?' এর ভেতরে অবশ্য সূর্যের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা লুকিয়ে আছে; মনে হয় মহাজগতের সব কিছু ছিলো আগে থেকেই, হঠাৎ দার্শনিক সূর্য জন্ম নিয়ে নিজের সম্পর্কে তুললো এক দার্শনিক প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রথম দিনের সূর্য ব'লে কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের এক স্বভাব ছিলো পরিচিতের অপরিচিতীকরণ ও রহস্যীকরণ। 'সত্তা' শব্দটি সে-কাজই করছে; যদি তিনি স্পষ্ট ব'লে দিতেন এই সত্তা কোনো রহস্যমণ্ডিত বস্তু নয়, সত্তা বলতে তিনি নিজেকেই বোঝাচ্ছেন, 'সত্তার' শব্দের বদলে ব্যবহার করতেন যদি 'আমার' সর্বনামটি, তাহলে ধাঁধা কেটে যেতো। কবিতাটির সারকথা হচ্ছে জন্মের মুহূর্তে সূর্য তাঁকে প্রশ্ন করেছিলো 'কে তুমি', আর মৃত্যুর আগেও সূর্য একই প্রশ্ন করছে তাঁকে, কিন্তু কোনো প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায় নি। তিনি জানেন না তিনি কে। কবিতাটি দর্শন নয়, একটি ছোট্ট ধাঁধা, এমন প্রশ্ন মানুষ সহস্রবার করেছে। কবিতাটি দর্শন নয়, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু দুঃখ হচ্ছে কবিতাও নয় এটি, এর থেকে অনেক ভালো কবিতা 'আমাদের ছোটো নদী' বা 'তালগাছ'। তরুণ যৌবনে যেদিন তাঁর প্রাণের ভেতরে পশেছিলো রবির কর, তখন উৎসারিত হয়েছিলো নির্ঝর, কবিতার ঝর্নাধারা; কিন্তু মৃত্যুর আগের ম্লান সূর্য জন্ম দিলো কবিতা নয়, ধাঁধা। দর্শন ও ছেলেমানুষির মধ্যে ব্যবধান লোপ পেয়ে যায় কখনো কখনো, যার পরিচয় পাই *শেষ সপ্তক*-এর নবম কবিতাটির এ-স্তবকে :

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে।
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

এর কাতরতাটুকু দাগ কাটে, তাও খুব বেশি নয়; কিন্তু এর দর্শনটুকু সম্পূর্ণ ছেলেমানুষি। রবীন্দ্রনাথের দুর্মর সমস্যা তিনি বিশ্বাস করেন বিশ্বজগতের মহৎ উদ্দেশ্যে, যার কোনো উদ্দেশ্য নেই। রবীন্দ্রনাথ 'নিরর্থকতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কবিতাটিতে, যেটি আমি আগের দু-পরিচ্ছেদে বারবার ব্যবহার করেছি, বলেছি সব কিছুই নিরর্থক, জীবনের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু নিরর্থকতাকে মেনে নিয়েই দাঁড়াতে হবে নিরর্থকতার বিরুদ্ধে, ঝিনুকের ব্যাধিকেই রূপান্তরিত করতে হবে মুক্তোয়। ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ ওই নিরর্থকতাকে মেনে নিতে পারেন নি, যেমন শিশু মেনে নিতে পারে না পিতামাতার মৃত্যু। 'সইবে না

সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি'—এটা অসহায়ের শেষ হাহাকার—দর্শন নয়। আমরা তো তাঁকেই ব্যবহার করতে পারি উদাহরণ হিশেবে;—রবীন্দ্রনাথ, যিনি মানবপ্রজাতির এক শ্রেষ্ঠরূপ, তিনি কেনো ম'রে যান, এবং তখনও পৃথিবীতে বেঁচে থাকে তুচ্ছ পতঙ্গ, পশু, বর্বর মানুষ? তখন কীভাবে সহ্য করা হয় সৃষ্টির ছেলেমানুষি? তাঁর বিশ্বাস ছিলো মরুপথে যে-নদী ধারা হারায়, আর না ফুটতে ঝ'রে পড়ে যে-ফুল, তারাও হারায় না; কোনো মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তোলে। বিশ্বাস বা দর্শন হিশেবে এটা পুরোপুরি ভুল বা হাস্যকর, যদিও তাঁর কবিতাটি অসাধারণ। দর্শন বাজে হয়েও কবিতা অসাধারণ হ'তে পারে, আর গুরুগম্ভীর দারুণ দর্শনসম্পন্ন হয়েও কবিতা হ'তে পারে শোচনীয়রূপে নিকৃষ্ট।

বাজে দর্শন কোনো দর্শন নয়, যদিও বাজে দার্শনিকতার অভাব নেই; কিন্তু খারাপ কবিতাও কবিতা—খারাপ কবিতা। দর্শনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করা, নানা দুরূহ সমস্যা সমাধান করা; কবিতার লক্ষ্য তা নয়। দর্শনের লক্ষ্য একটি, কবিতার লক্ষ্য অনেক; দর্শনের লক্ষ্য বিরহস্যীকরণ, আর কবিতা ক'রে থাকে রহস্যীকরণ। দার্শনিক নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে দর্শন চর্চা করেন না; সাহিত্যে, কবিতায়, শিল্পীর আত্মপ্রকাশই বড়ো ব্যাপার। দর্শন কঠোরভাবে নৈর্ব্যক্তিক; কবি অধিকাংশ সময়ই ব্যক্তিক। কবিতা হচ্ছে শিল্পকলা, দর্শন তা নয়; কখনো কখনো কোনো কোনো দার্শনিক রচনা শিল্পকলা হয়ে উঠতে পারে, তবে দার্শনিক রচনার লক্ষ্য শিল্পকলা হওয়া নয়। কবিতার বড়ো কাজ আবেগ জাগানো, ইন্দ্রিয়গুলোকে স্বাদে গন্ধে ঘ্রাণে ভ'রে তোলা, দর্শনের কাজ তা নয়; কবিতা যদি আমাদের কোনো ইন্দ্রিয়কে অভিভূত না করে, আবেগ না জাগায়, তাহলে তা কবিতাই হয়ে ওঠে না। শিল্পকলার, কবিতার সাথে কামের রয়েছে একটি গভীর সম্পর্ক, কোনো কিছুই উৎকৃষ্ট শিল্পকলা হয়ে ওঠে না যদি না তার ভেতরে বয়ে চলে কামের উজ্জ্বল ধারা। কবিরা নানা দর্শনে যুগে যুগে অনুরাগ বোধ করেছেন, প্রভাবিত হয়েছেন নানা দর্শন দিয়ে, কিন্তু কবিতায় তাঁরা প্রকাশ করেছেন খুবই কম। কবিতায় দর্শন থাকে ততোখানি যতোখানি থাকে চুম্বনে।

মনে পড়ছে কীটসকে, আমার প্রিয় কবিদের একজন, যিনি দর্শন থেকে দূরে ছিলেন, ভয় পেতেন দর্শনকে। মনে পড়ে তাঁর প্রতিবাদ :

> Do not all charms fly
> At the mere touch of cold philosophy?....
> Philosophy will clip an Angel's wings.

তিনি ভয় পেতেন দর্শনের নিরাবেগ শীতলতাকে—চিন্তা নয়, তাঁর প্রিয় ছিলো ইন্দ্রিয়ভারাতুরতা; তবে তাঁর কোনো কোনো উক্তি, যেমন Beauty is truth, truth beauty, নিয়ে নির্বোধ ছদ্মদার্শনিক মাতামাতি প্রচুর হয়েছে। উক্তিটি শাশ্বত সত্য প্রকাশ করে না; এটি আকর্ষণীয় এক অভাবিত সুন্দর অতিশয়োক্তির জন্যে, শাশ্বত সত্যের জন্যে নয়, যদিও অনেকে এটিকে শাশ্বত সত্যের প্রকাশ মনে ক'রে সুখ

পান। উক্তিটিতে সত্য নয়, পাচ্ছি তীব্র আবেগে উৎসারিত অবিস্মরণীয় অতিশয়োক্তি, তাই এটি কবিতা; দর্শন কখনোই এমন সুন্দর ও স্মরণীয় নয়। সৌন্দর্য বা সুন্দর সত্য হ'তে পারে, সত্যও হ'তে পারে সুন্দর; কিন্তু সৌন্দর্য ও সত্যের সমীকরণ কোনো চরম সত্য প্রকাশ করে না। সৌন্দর্যমাত্রই সত্য নয়, যেমন সত্যমাত্রই সুন্দর নয়। অনেক সুন্দর হ'তে পারে শোচনীয় মিথ্যে, যেমন এ-উক্তিটিও সত্য নয়, যদিও সুন্দর; আবার অজস্র সত্য হ'তে পারে বিবমিষাজাগানো অসুন্দর। যারা এর দার্শনিকতায় বিহ্বল হন, তাঁরা কবিতা উপভোগ করেন না, কবিতায় চান কবিতার বদলে অন্য কিছু।

কীটসকে নেন নি আমাদের রোম্যান্টিকেরা, নিয়েছেন এক আধুনিক; হয়তো জীবনানন্দ হয়ে উঠতেন না জীবনানন্দ যদি না কীটস কবিতা লিখে যেতেন তাঁর একশো বছর আগে। উনিশশতকের শেষ দশক থেকেই তিনি প্রিয় বাঙলার কবিদের; তাঁকে দেখা হতো এক গ্রিক দেবতারূপে, যাঁর যন্ত্রণা ছিলো অনন্ত মৃত্যু যাঁকে গ্রহণ করেছিলো তরুণ বয়সে। তাঁকে বাঙালি সাধারণত স্মরণ করেছে সেই কবিরূপে, যিনি উচ্চারণ করেছিলেন দুটি অমর উক্তি: Beauty is truth, truth beauty, এবং A thing of beauty is for ever। এ-উক্তি দুটি এক সময় বারবার উদ্ধৃত করতেন সমালোচকেরা, এবং অনেকে যাঁরা হয়তো তাঁর কবিতা কখনো পড়েন নি। উক্তি দুটির মধ্যে প্রথমটিই বেশি প্রিয় ছিলো বাঙালির, কেননা তারা এতে শুধু সৌন্দর্য পেতো না, সাথে সত্যও পেতো, যে-সত্যের জন্যে অসত্যমগ্ন বাঙালির কাতরতার শেষ নেই। অর্থাৎ কবিতাটুকু নয়, এর দর্শনটুকু বেশি প্রিয় ছিলো তাদের; সৌন্দর্যে তাদের চরিত্রহীন হওয়ার ভয় ছিলো, তাই বেশি ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাইতো তারা সত্যকে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপিপাসার শেষ ছিলো না, তবে তারও ভয় ছিলো সৌন্দর্যকে, সত্য ছাড়া সৌন্দর্যকে তিনি বেশ ভয় পেতেন, কে জানে কখন সৌন্দর্য আবার কোন রসাতলে ডুবোয়। সারাজীবনে পদ্যে ও গদ্যে সত্য সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনি বহু কথা বলেছেন, কীটসের উক্তিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের ভেবে ব্যবহার করেছেন বহু বার; কিন্তু যখনই তিনি উদ্ধৃত করেছেন উক্তিটি, তখনই ভুল করেছেন, বা নিজের বিশ্বাস অনুসারে সাজিয়েছেন শব্দগুলোকে। কীটসের Beauty is truth, truth beauty-কে রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই উদ্ধৃত করেছেন Truth is beauty, beauty truth-রূপে। কেনো এমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ? কীটসের কাছে সৌন্দর্য আগে, রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য আগে কেনো? সৌন্দর্যকে প্রধান মনে করতে কি কোনো অপরাধবোধে ভুগতেন রবীন্দ্রনাথ?

আধুনিকদের আগে কীটসের সবচেয়ে বড়ো অনুরাগী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নয়, মোহিতলাল মজুমদার—রক্ষণশীল কবি ও সমালোচক। তাঁর 'পান্থ' কবিতায় 'সত্যেরে চাহি না তবু সুন্দরের করি আরাধনা' প'ড়ে বুঝি কতোটা আলোড়িত আর পীড়িত ছিলেন তিনি Beauty is truth, truth beauty দিয়ে। তিনি নিজের

ছদ্মনামও রেখেছিলেন সত্যসুন্দর দাস, যখন আধুনিক সাহিত্যকে প্রবলভাবে রোখার তাঁর সাধ হয়েছিলো। শুধু কবিতা নয়, কীটসের কাব্যতত্ত্বের তিনি ছিলেন অনুরাগী। তবে জীবনানন্দই একমাত্র বাঙালি কবি, যিনি কীটস থেকে নিয়েছিলেন সৃষ্টিশীলতার সাথে, লিখেছিলেন একরাশ ইন্দ্রিয়-ও প্রকৃতি-ও রূপ-ভারাতুর কবিতা। সব কবিতা নয়, জীবনানন্দ ঋণ নিয়েছিলেন দুটি কবিতা—'Ode to a Nightingale' এবং 'Ode to Autumn' থেকে; তবে প্রথমটির প্রভাবই বেশি তাঁর ওপর। 'মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো-প্রিয়ার মতন', 'মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধরে' এসেছে কীটসের 'I have been half in love with easeful death,/ Call'd him soft names in many a must rhyme' থেকে। 'শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে', 'অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়', 'মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়/সকালবেলার রৌদ্রে', 'অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা' প্রভৃতি জন্মেছে কীটসের 'The weariness, the fever, and the fret', 'The murmurous haunt of flies on summer eves', 'O, for a draught of vintage! that hath been/ Cool'd a long age in the deep-delved earth' প্রভৃতি থেকে। কীটসের emperor and clown থেকে জন্মেছে 'আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়—/ যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়', Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth থেকে জন্মেছে 'হাতে হাত ধরে ধরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে/কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে'। জীবনানন্দের 'হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' হয়তো অনুপ্রাণিত হায়েছিলো কীটসের 'Much have I travell'd in the realms of gold./ And many goodly states and kingdoms seen' দিয়ে। কীটস আছেন বাঙলা কবিতার অন্তরেও।

কীটসের 'Ode to a Naightingale'-এর কোনো বাঙলা অনুবাদ আমি দেখি নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এক সময় জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু রোম্যান্টিক ছিলেন না; বাছবিচার না ক'রে তিনি যান্ত্রিকভাবে অনুবাদ করেছিলেন বিশ্বের কবিতা, যেগুলো অনুবাদ হিশেবে ব্যর্থ। ওগুলোর নাম দিয়েছিলেন তিনি *তীর্থ-সলিল*। তাতে পাই কীটসের দুটি কবিতার অনুবাদ : 'দুখ-শর্ব্বরী মাঘে', ও 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী'। প্রথমটি অনুবাদ 'In drear-nighted December'-এর, এবং দ্বিতীয়টি *La belle dame sans Merci*-র একটি ব্যালাডের অনুবাদ। দুটিই বেশ খারাপ অনুবাদ; এবং আমি দুঃখ পাই যে তিনি কীটসের কোনো ঔডের অনুবাদ করেননি; এবং সুখী বোধ করি যে তিনি কীটসের কোনো ঔডের অনুবাদ করেন নি।

আঠারো বছর বয়সে, পাঠ্যকবিতা হিশেবে, প্রথম পড়েছিলাম 'Ode to a Nightingale'; যিনি পড়িয়েছিলেন, পুরোপুরি নষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন তিনি কবিতাটি, কিন্তু কবিতাটি আমার ভেতরে ভেঙে ঢুকেছিলো; আমি কিছু

বুঝেছিলাম, অনেক বুঝি নি, কিন্তু এর সুর আর রূপ আমাকে মথিত করেছিলো, যেমন করে আজো। বহুবার কবিতাটি অনুবাদের কথা ভেবেছি আমি, কিন্তু এর রূপ ও আবেগ, এবং শব্দের গুঞ্জন অনুবাদ অসাধ্য মনে হয়েছে। বাঙলায় কিছুতেই ধরা পড়ে না 'My heart aches, and a drowsy numbness pains/My sense'-এর যন্ত্রণা, বিবশতা, ও গুঞ্জন; ধরা পড়ে না 'Fade far away, dissolve, and quite forget/What thou among the leaves hast never known/The weariness, the fever, and the fret'-এর করুণ বিষণ্ন নিঃশব্দ হাহাকার; অনূদিত হ'তে চায় না 'The murmurous haunt of flies on summer eves'-এর ধ্বনিগুঞ্জনময় রূপভারাতুরতা। ইংরেজিতে যা সরল গভীর সেই 'I have been half in love with easeful death', ও Thou wast not born for death, immortal bird'-এর সরল গভীরতা টিকে থাকে না অনুবাদে। কবিতাটি পুরোপুরি কবিতা, এর কোনো দর্শন নেই। কবিতাটি অনুবাদের চেষ্টা করছি।

নাইটিংগেলের প্রতি

জন কীটস্

১

আমার হৃদয় ব্যথা করছে, আর নিদ্রাতুর এক বিবশতা পীড়ন করছে
আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে, যেনো আমি পান করেছি হেমলক,
কিংবা সেবন করেছি কোনো অসহ্য আফিম
এক মুহূর্ত আগে, আর ভুলে গেছি সব :
এমন নয় যে আমি ঈর্ষা করছি তোমার সুখকে,
বরং তোমার সুখে আমি অতিশয় সুখী,—
আর তুমি, লঘু-ডানা অরণ্যের পরী,
সবুজ বিচের মধ্যে
কোনো সুরমুখরিত স্থলে, আর অসংখ্য ছায়ার তলে,
সহজিয়া পূর্ণ কণ্ঠে গেয়ে যাচ্ছো গ্রীষ্মের সঙ্গীত।

২

আহা, এক ঢোক মদের জন্যে! গভীর মাটির তলে
বহুকাল ঢাকা থেকে যেই মদ হয়েছে শীতল,
দেহে যার পুষ্প আর গেঁয়ো সবুজের স্বাদ,
নাচ, আর প্রোভেন্সীয় গান, আর রোদে পোড়ার উল্লাস!
আহা, উষ্ণ দক্ষিণভরা একটি পেয়ালার জন্যে,
পরিপূর্ণ খাঁটি, রক্তাভ হিপ্পোক্রেনে,
কানায় কানায় উপচে পড়ছে বুদ্বুদ,

এবং রক্তবর্ণরাঙা মুখ;
যদি পান করতে পারতাম, আর অগোচরে ছেড়ে যেতে পারতাম পৃথিবী,
এবং তোমার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে বনের আঁধারে :

৩

মিলিয়ে যেতাম দূরে, গলতাম, এবং যেতাম ভুলে
যা তুমি পত্রপল্লবের মধ্যে কখনো জানো নি,
ক্লান্তি, জ্বর, এবং যন্ত্রণা
এখানে, যেখানে মানুষেরা ব'সে শোনে একে অন্যের আর্তনাদ;
যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মাথায় কাঁপে গুটিকয়, বিষণ্ন, অবিশিষ্ট শাদা চুল,
যেখানে বিবর্ণ হয় যুবকেরা, আর প্রেতের মতোন কৃশ হয়ে মারা যায়;
যেখানে ভাবতে গেলেই ভ'রে উঠতে হয় দুঃখে
এবং সীসাভারী চোখের হতাশায়,
যেখানে সৌন্দর্য রক্ষা করতে পারে না তার দ্যুতিময় চোখ,
অথবা আজকের প্রেম ক্ষয় হয় আগামীকাল আসার আগেই।

৪

দূরে! আরো দূরে! কেননা তোমার কাছে উড়ে যাবো আমি,
তবে বাক্কাস ও তার চিতাদের রথে চ'ড়ে নয়,
যাবো আমি কবিতার অদৃশ্য ডানায়,
যদিও অবোধ মগজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিবশ,
এর মাঝেই তোমার সঙ্গে আমি! সুকোমল এই রাত,
এবং দৈবাৎ চন্দ্ররানী উপবিষ্ট তার সিংহাসনে,
তাকে ঘিরে আছে তার সব তারার পরীরা;
কিন্তু এখানে কোনো আলো নেই,
শুধু সেইটুকু ছাড়া যেটুকু আকাশ থেকে বাতাসে উড়াল দিয়ে
শ্যামল আঁধার আর শ্যাওলা আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে এখানে এসেছে।

৫

দেখতে পাচ্ছি না আমি আমার পায়ের কাছে ফুটেছে কী ফুল,
বা কোন কোমল গন্ধ ঝুলে আছে শাখায় শাখায়,
তবে, সুবাসিত অন্ধকারে, অনুমান করি প্রত্যেক মধুকে
যা দিয়ে এই কুসুমের মাস ভ'রে দেয়
ঘাস, ঝোপ, আর বুনো ফলের গাছকে;
শুভ্র হথর্ন, আর বন্যগোলাপ;
পাতার আড়ালে দ্রুত বিবর্ণ ভাইওলেটরাশি;
আর মধ্য-মের জ্যেষ্ঠ সন্তান,

শিশিরের মদে পূর্ণ আসন্ন কস্তুরিগোলাপ,
গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় মৌমাছির গুঞ্জরণমুখর আবাস।

৬

অন্ধকারতলে আমি শুনি; কেননা অজস্রবার
জড়িয়ে পড়েছি আমি সহজ মৃত্যুর আধোপ্রেমে,
প্রিয় নাম ধ'রে তাকে কতোবার ডেকেছি কবিতার পংক্তিতে,
আমার নিঃশব্দ নিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে দেয়ার জন্যে;
যে-কোনো সময়ের থেকে এখন মৃত্যুকে মনে হচ্ছে বেশি বরণীয়,
ব্যথাহীন থেমে যাওয়া এই মধ্যরাতে,
যখন তোমার আত্মা ঢেলে দিচ্ছো তুমি
এরকম তুরীয় আবেগে!
তারপরও গেয়ে যাবে তুমি, এবং আমার কানে সাড়া জাগবে না—
তুমি গাইবে প্রার্থনাসঙ্গীত আমি মিশে যাবো তখন মাটিতে।

৭

মৃত্যুর জন্যে তোমার জন্ম হয় নি, মৃত্যুহীন পাখি!
কোনো ক্ষুধার্ত প্রজন্ম ধ্বংস করতে পারবে না তোমাকে;
যে-সুর শুনছি আমি ক্ষয়িষ্ণু এ-রাতে সে-সুরই
সুপ্রাচীন কালে শুনেছিলো সম্রাট ও ভাঁড়েরা :
হয়তো। এ-একই গান ঢুকেছিলো
রুথের বিষণ্ন হৃদয়ে, যখন, স্বদেশকাতর,
অশ্রুভারাতুর সে দাঁড়িয়েছিলো বিদেশি জমিতে;
একই গানে বারবার
মুগ্ধ হয়েছে ভয়ঙ্কর সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের দিকে খোলা
যাদুবাতায়ন, পরিত্যক্ত পরীদের দেশে।

৮

পরিত্যক্ত! এ-শব্দ ঘণ্টাধ্বনির মতো আমাকে জাগিয়ে
তোমার নিকট থেকে পৌঁছে দেয় নিজেরই কাছে।
বিদায়! কল্পনাও তার খ্যাতি অনুসারে
প্রতারণা করতে পারে না, প্রতারক পরী।
বিদায়! বিদায়! তোমার করুণ গান মিশে যাচ্ছে
নিকট বনভূমিতে, স্তব্ধ নদীর ওপরে,
পাহাড়ের ঢালে; এবং এখন মিশে গেছে
পার্শ্ববর্তী উপত্যকার উন্মুক্ত ভূমিতে :
এটা কি কল্পনা ছিলো, না কি ছিলো জাগ্রত স্বপ্ন?
পালিয়েছে সে-সঙ্গীত :—আমি কি জেগে আছি নাকি নিদ্রিত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাসমুদ্রে ছোট্ট চর : আমাদের গ্রাম

বিশ্বাসকে আলো ব'লে শেখানোর একটি রীতি রয়েছে, ছেলেবেলায় আমিও তাই শিখেছিলাম; পরে দেখেছি বিশ্বাস আলো নয়, অন্ধকার; আর বিশ্বাসের অন্ধকারে ঢেকে আছে মহাজগত। যদিও মহাজগতের অধিকাংশ এলাকাই অন্ধকার, মহাজাগতিক অনন্ত দূরত্বব্যাপী কোনো নক্ষত্রের আলো নেই, তবু কোনো কোনো এলাকা অসংখ্য নক্ষত্রে আলোকিত। কিন্তু বিশ্বাসের জগতটি পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশ্বাসের বইগুলো অন্ধকারের বই, ওগুলোর কাজ মানুষের মনকে গভীর অন্ধকারে আবৃত করা। মহাজগত সম্পর্কে খুবই কম জানি আমরা, আর যতোটুকুও জানি, তাও জানতে দেয়া হয় না। গত তিনশো বছরে পশ্চিমে বিজ্ঞান বেশ এগিয়েছে, বের করেছে মহাজগতের অনেক শৃঙ্খলা; তবু অধিকাংশ মানুষ আজো আদিম পর্যায়েই—তারা মানসিকভাবে আদিম। যুক্তির থেকে অন্ধতার বেশি অনুরাগী তারা, সত্যের থেকে তাদের বেশি প্রিয় মিথ্যে। এটা অবশ্য সাধারণ মানুষদের অপরাধ নয়, অপরাধটি অসাধারণদের। ওই অসাধারণ মানুষেরা পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধ'রে দখল ক'রে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র। নিজেদের স্বার্থে তারা তৈরি করেছে শাসনব্যবস্থা, মানুষকে ভাগ করেছে নানা বর্ণে ও শ্রেণীতে, তৈরি করেছে ধর্ম ও নানা ধরনের দেবতা ও বিধাতা, এবং দেবতা ও বিধাতাদের দিয়ে ভীত ক'রে রেখেছে মানুষদের। শাসকদের অনুগত মহাপুরুষেরাও, যাঁদের অমর ব'লে মান্য করি আমরা, সাহিত্য, দর্শন, ও আরো অজস্র শাস্ত্রে প্রচার করেছে শাসকদেরই বক্তব্য। রাজনীতি ও ধর্ম শুরু থেকেই মানুষের বিকাশের বিরুদ্ধে; এবং আজো তাই। প্রধানত রাজনীতি ও ধর্মের সুবিধাভোগীরা মানুষকে বুঝতে দেয় নি আমরা যেখানে আছি সেটি কী, কী সম্পর্ক আমাদের ওই আকাশ আর তারকাপুঞ্জের সাথে। তারা শুনিয়েছে কাল্পনিক গল্প, ওই গল্পগুলোকে তারা বলেছে ধর্ম, মানুষকে বাধ্য করেছে ওই গল্পগুলো বিশ্বাস করতে ও মেনে চলতে। তাই বিশ্বাসের অন্ধকারে ঢেকে আছে অজস্র সূর্য, সংখ্যাহীন তারকাপুঞ্জ, আর মহাজগত। পবিত্র ব'লে বিখ্যাত বইগুলোতে আলো বা জ্ঞান নেই, আলো আর জ্ঞান আছে সে-বইগুলোতে, বিশ্বাসীদের চোখে যেগুলো অপবিত্র।

অধিকাংশ মানুষ আজো বাস করে মহাজাগতিক অন্ধকারে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা ভাবে স্বর্গ আর নরকের কথা; কেঁপে ওঠে নরকের ভয়ে, সুখী হয়

স্বর্গের বিলাসের কথা ভেবে। এর সবটাই ঘটেছে পৃথিবী ও মহাজগত সম্পর্কে ভুল ধারণার ফলে। আমাদের গ্রামটিকে ভালোবাসি আমরা, তবে তাকে রহস্যপূর্ণ মনে করি না; কেননা আমরা তার সব কিছু জানি। কিন্তু নদীর অপর পারের গ্রামগুলোকে মনে হয় রহস্যময়, মনে হয় ওখানে এমন সুখ আর ছায়া আছে, যা নেই আমাদের গ্রামে। তা থাকতে পারে; ওই গ্রামে থাকতে পারে অপূর্ব এক তমালতরু, যা নেই আমাদের গ্রামে; থাকতে পারে এমন স্নিগ্ধ সরোবর, যা নেই আমাদের গ্রামে; থাকতে পারে এমন একটি গর্ত, যা নেই আমাদের গ্রামে। কিন্তু ওই গ্রামেও রহস্যের কিছু নেই, ওই গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রামকে রহস্যপূর্ণ মনে করে না, যদিও নদীর পারে দাঁড়িয়ে রহস্যপূর্ণ মনে করে আমাদের গ্রামটিকে। মহাজগতকে যদি জানতাম আমরা, তাহলে বিস্মিত হতাম, কেননা বিস্ময়কর বহু কিছু রয়েছে মহাজগত জুড়ে; কিন্তু এখন যেমন ভয়ের চোখে দেখি, নানা রকম বিধাতা দেখতে পাই দূরে, তেমন কিছু দেখতে পেতাম না। ওই তারা বা সূর্যই শুধু নয়, আমরাও মহাজগতের অধিবাসী, আমরাও ঘুরে চলছি মহাজাগতিক গগনে; কিন্তু আমরা কোনো দেবতা দেখি নি, বিধাতা দেখি নি, যদিও এদের কথা দিনরাত শুনতে পাই। বিশ্বাসীরা ভীত আর লোভী মানুষ; অন্ধকারে থাকতেই তাদের আনন্দ।

মহাজগত বা মহাবিশ্ব অনন্ত; আমরা তার একধারে প'ড়ে আছি। মহাজগতকে বোঝার জন্যে একটি রূপকের সাহায্য নিতে পারি : অনন্ত মহাজগত যেনো এক মহাসমুদ্র, আর ওই মহাসমুদ্রে আমাদের পৃথিবী একটি ছোট্ট চরের মতো। দ্বীপ না ব'লে চর বলতেই আমার ভালো লাগছে। অনন্ত মহাসমুদ্রে আমরা একটি ছোটো চরের, ছোটো গ্রামের, অধিবাসী; এই চরের, এই গ্রামের, নাম আমরা রেখেছি পৃথিবী। এটি তারা নয়, গ্রহ; এটি একটি তারাকে ঘিরে ঘুরছে, তারাটির নাম রেখেছি আমরা সূর্য। এই সূর্যকে ঘিরে যে-এলাকাটুকু, যেখানে ঘুরছে কয়েকটি গ্রহ, তার নাম সৌরজগত। এটি বিশাল এলাকা, কিন্তু মহাজগতের এটি এক ক্ষুদ্র এলাকা। মহাজগত সম্পর্কে আমরা অনেক বেশি জানি পূর্বপুরুষদের থেকে। তাঁরা আকাশ ভ'রে দেখেছিলেন লাখ লাখ দেবতা, মাঠে ঘাটে নদীতে দিঘিতে দেখেছিলেন দেবদেবী; দেখেছিলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী বিধাতা, যার ভয়ে রক্ত জ'মে যেতো তাঁদের, আজো রক্ত জ'মে যায় অধিকাংশের। এই ভয় এবং বেশখানিক লোভকে বলা হয় ধর্ম। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছোট্ট চরের মতো পৃথিবীটিকেই বুঝে ওঠেন নি; জানেন নি পৃথিবী কতো বড়ো, তার উত্তরে কী দক্ষিণে কী, কীভাবে আছে পৃথিবী, তাই মহাজগত সম্পর্কে তাঁদের পক্ষে ধারণা করাই ছিলো অসম্ভব। কিন্তু কল্পনা মানুষের সমান বয়সী। তাঁরাও প্রচুর কল্পনা করেছিলেন যেমন আমরা করি, তাঁদের অনেক কল্পনা গল্প হিশেবে বেশ চমৎকার; তবে তা গল্পই। তাঁদের মধ্যে কল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতির বিকাশ ঘটে নি, যাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক কল্পনা। তাঁরা মহাজাগতিক সত্য বের করেন নি, বের করার চেষ্টা করেন নি, বরং বিচিত্র রকম

দেবদেবী কল্পনা ক'রে সেগুলোকেই সত্য ব'লে প্রচার করেছেন; এবং চাপিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের ওপর।

পুরোনো মানুষেরা ছিলো শিশু; অন্ধকার পৃথিবী ও সংকীর্ণ মহাজগতের অধিবাসী। সব কিছুই ছিলো তাদের কাছে রহস্যময়; এবং তারা পৃথিবীকে ভ'রে দিয়ে গেছে রহস্যে। মহাজগত বলতে যা বুঝি আমরা, তারা তা বুঝতো না; তাদের মহাজগত ছিলো খুবই ক্ষুদ্রজগত। গত কয়েক শতকের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মহাজগতের রূপ আমূল বদলে গেছে মানুষের চোখে। মহাজগত বলতেই আজ অনন্ত অসীমের ধারণা জাগে আমাদের মনে, পুরোনো মানুষদের মনে এমন ধারণা জাগতো না। তাদের চোখে মহাজগত ছিলো এক ছোটো সসীম বদ্ধ এলাকা। তারা মনে করতো মহাজগতের কেন্দ্র পৃথিবী, যাকে ঘিরে আছে ছোটো ছোটো সূর্য নক্ষত্র চাঁদের আকাশ। তারা পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র আর মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করলেও পৃথিবীকে মনে করতো নোংরা; তারা বিশ্বাস করতো নক্ষত্রগুলো পবিত্র, আর নক্ষত্রলোক, বা তার একটু পরের এলাকা থেকে তাদের সব সময় শাসন করছে দেবতারা। আরো কিছুকাল পরে যখন কোনো কোনো দেশে দেবতাদের বাদ দেয়া হয়, তখন তারা কল্পনা করে এক শক্তিশালী নিঃসঙ্গ দেবতাকে, যাকে বলা হয় বিধাতা বা ঈশ্বর বা অন্য কিছু, যে ওপর থেকে শাসন করছে মানুষকে। এর সবই কল্পনা, যদিও মানুষ এসব সত্য মনে করে। মহাজগতকে যদি পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষ আমাদের মতো বুঝতে পারতো, তাহলে থাকতো না আজকের বিশ্বাসগুলো। মানুষ এতো ভয় পেতো না নরকের, এতো লোভী হতো না স্বর্গের। আজ থেকে দুশো বা হাজার বা এক লক্ষ বছর পর মানুষ দেবতা বিধাতা স্বর্গ নরক প্রভৃতি সম্পর্কে ভাববে না। আমাদের বিশ্বাসগুলো তাদের মনে হবে আদিম; বিশ্বাস শব্দটিই তখন থাকবে না।

মহাজগত কতো বড়ো, কতো তার বয়স, কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে তার, এসব অবশ্য কল্পনায় ধারণা করাও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মহাজগতের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন, ভবিষ্যতে তাঁদের ব্যাখ্যা আরো সুষ্ঠু হবে। বিভিন্ন দেশের ধর্মের বইগুলোতে মহাজগতের উৎপত্তির যে-গল্প পাওয়া যায়, তা বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আদিম মানুষের রূপকথা; তাতে বিশেষ বিস্ময় নেই, কেননা তাদের কল্পনারও সীমা ছিলো; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মহাজগতের উৎপত্তির যে-ব্যাখ্যা দেয়, তা এতো বিস্ময় ও চাঞ্চল্যকর যে তা অনেকের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যায়ই পাই মহাজগতের অনন্ততা ও বিস্ময়করতার ঠিক পরিচয়। যদি বিধাতা সত্যিই থাকেন,—থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই,—এবং কোনো দিন যদি তিনি মহাজগত সম্পর্কে ধর্মের বইগুলোর ও বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা প'ড়ে ওঠেন, তাহলে বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যাই তিনি গ্রহণ করবেন। ধর্মের বইগুলো প'ড়ে তিনি হাসবেন।

মহাজগতে পৃথিবী একটি ছোট্ট সুন্দর চরের মতো, কিন্তু এখানেই উৎপত্তি ঘটেছে মহাজগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারের, যা খুবই ক্ষুদ্র, কিন্তু অনেক

বড়ো নক্ষত্রমণ্ডলীর থেকেও। তার নাম মানুষ। মহাজাগতিক প্রক্রিয়ারই এক রূপ মানুষ; তাকে কেউ তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দেয় নি পৃথিবীতে, বলে নি যাও পৃথিবীতে, গিয়ে রাজনীতি করো ধর্ম করো প্রতারণা করো গান গাও; মানুষ বিকশিত হয়েছে কোটি কোটি বছর ধ'রে। মহাজগতের একটি ছোটো চরের প্রতিভাবান চাষী মানুষ, যার থেকে আর কেউ বেশি জানে না মহাজগত সম্পর্কে। এই ছোট্ট চরের পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছে মহাজাগতিক সমুদ্রের ঢেউ। মানুষ এই মহাসমুদ্রকে ভয় পেয়েছে হাজার হাজার বছর, মাত্র কয়েক শো বছর আগে মানুষ বেরিয়েছে নিজের তীর ছেড়ে মহাসমুদ্রের দিকে। অনন্ত মহাসমুদ্র ডাকছে মানুষকে; মানুষ তীর থেকে আরো দূরে যাবে, ঢুকবে মহাসমুদ্রের ভেতরে, খুঁজে দেখবে কী আছে সেখানে। মহাজগত কতো বড়ো? আজো আমরা তা জানি না; কিন্তু এটুকু জানতে পেরেছি মহাজগত এতো বিশাল যে আমাদের প্রতিদিনের মানদণ্ডে, মাইল বা কিলোমিটারে, তার আয়তন মাপা সম্ভব নয়। মহাজগতকে পরিমাপ করা হয় আলোর গতির মানদণ্ডে। এক সেকেন্ডে আলো যায় ১৮৬,০০০ মাইল বা মোটামুটি ৩০০,০০০ কিলোমিটার; এ-মানদণ্ডই ব্যবহার করা হয় মহাজগতের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকার দূরত্ব মাপার জন্যে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে আট মিনিট সময়; তাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব আট আলোক-মিনিট। এক বছরে আলো যায় ১×৬০×৬০×২৪×৩৬৫× ১৮৬,০০০ মাইল বা ছয় ট্রিলিঅন মাইল। ট্রিলিঅন হচ্ছে এক লক্ষ কোটি; আলো বছরে যায় ছয় লক্ষ কোটি মাইল। এটা একটি ছোটো সংখ্যা, তবে এটা হিশেব করতেও মগজ বিবশ হয়। আলো এক বছরে যে-দূরত্ব ভ্রমণ করে, সে-একককে বলা হয় আলোকবর্ষ। আলোকবর্ষের সাহায্যে, সময় নয়, মাপা হয় দূরত্ব। এই দূরত্বের কথা পুরোনো কালের মানুষ ভাবতে পারে নি। আজ আমরা জানি মহাজগত কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত, যা পুরোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে নি।

পৃথিবী একটি জায়গা বা স্থান, এমন স্থানের অভাব নেই মহাজগতে। ওই স্থানগুলো ঠিক পৃথিবীর মতো নয়; তবে স্থান। মহাজগতের অধিকাংশ এলাকা জুড়েই রয়েছে শূন্যতা। মাহজগত এক বিশাল শীতল অনন্ত মহাশূন্যতা, যার এক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আর এক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজ করছে চিরঅমারাত্রি, ওই শূন্যস্থলে অন্ধকার শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। মহাজগত এমন অনন্ত শূন্যতা যে তাতে গ্রহ, নক্ষত্র, আর নক্ষত্রপুঞ্জকে দুর্লভ বস্তু বলেই মনে হয়। নক্ষত্রপুঞ্জ গঠিত গ্যাস, ধুলো, আর নক্ষত্র বা তারকায়। প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জের রয়েছে কোটি কোটি তারকা। সূর্য একটি তারকা বা তারা বা নক্ষত্র। নক্ষত্রপুঞ্জের কোটি কোটি তারার প্রত্যেকটির থাকতে পারে গ্রহ; ওই গ্রহের কাছে প্রতিটি তারাই সূর্য। সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে কয়েকটি গ্রহ, গ'ড়ে উঠেছে সৌরলোক; প্রতিটি নক্ষত্রকে বা সূর্যকে ঘিরেই গ'ড়ে উঠতে পারে এমন সৌরলোক। কতগুলো নক্ষত্রপুঞ্জ রয়েছে মহাজগতে? মহাজগতে নক্ষত্রপুঞ্জ সংখ্যা কয়েক শো বিলিঅন

বা ১০^{১১} বিলিঅন (১০^{১১}-এর অর্থ হচ্ছে ১-এর পর ১১ টি শূন্য, অর্থাৎ ১০০,০০০,০০০,০০০); আর প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জে আছে গড়ে ১০০ বিলিঅন নক্ষত্র। প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জে যতোগুলো তারা আছে, অন্তত ততোগুলো গ্রহ থাকার কথা। মহাজগতে থাকার কথা ১০^{১১}×১০^{১১}=১০^{২২}, অর্থাৎ ১০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০ বা ১০ বিলিঅন ট্রিলিঅন গ্রহ। সংখ্যাটি আমি গুনতে পারছি না। এমন অসংখ্য সৌরলোকের একটি সৌরলোকের একটি গ্রহেই শুধু রয়েছে মানুষ। আর কোথাও নেই। কেনো থাকবে না? থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি; কিন্তু যদি থাকে, তারা মানুষ হবে না, তারা হবে বুদ্ধিমান প্রাণী। মানুষ একান্তভাবেই পৃথিবীর প্রাণী। অন্য কোনো গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে তারা মানুষের মতো হবে না, তাদের গ্রহের রীতি অনুসারে বিবর্তনের ফলে তারা ধরবে তাদের মতো আকার। আমরা আছি মহাজগতের এক কোণে, সূর্য একটি ছোটো তারা, পৃথিবীও একটি ছোটো চর; কিন্তু এখানেই উৎপত্তি হয়েছে এক বুদ্ধিমান প্রাণীর, মানুষের। এটাও কোনো রহস্য নয়, এখানে ঘটেছে এমন কিছু মহাজাগতিক ঘটনা, যার ফলে এখানেই উদ্ভূত হ'তে পেরেছে মানুষ, পশু, সরীসৃপ, গাছ। আমাদের গ্রহটির নাম পৃথিবী না হয়ে হ'তে পারতো 'প্রাণ'।

নক্ষত্রপুঞ্জগুলো একই রকমের নয়, আকৃতি অনুসারে এগুলো তিন রকম : এক ধরনের নক্ষত্রপুঞ্জ কুণ্ডলপাকানো, এক ধরনের নক্ষত্রপুঞ্জ উপবৃত্তাকার, ও এক ধরনের নক্ষত্রপুঞ্জ এলোমেলো। আমরা যে-নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত তার নাম মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। এটি এক কুণ্ডলপাকানো নক্ষত্রপুঞ্জ, যার কুণ্ডল ধীরে ধীরে নড়ছে। আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আট বিলিঅন আলোকবর্ষ দূরে আছে আমাদের নিকটবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জগুলো। এগুলো আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্রপুঞ্জ। এগুলো বিশটি নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি, আর ছড়িয়ে আছে কয়েক মিলিঅন আলোকবর্ষব্যাপী। এদের একটির নাম এমত১। আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জ কোটি কোটি তারায় তারায় খচিত। তারাগুলোর কোনো কোনোটি ছোটো, তবে কোনো কোনোটি কয়েক হাজার সূর্যের সমান। কোনো কোনোটি খুবই ছোটো, একটা শহরের মতো ছোটো, কিন্তু সেগুলো সীসার থেকেও শত ট্রিলিঅন গুণ ঘনীভূত। কোনো কোনো নক্ষত্র একলা, যেমন আমাদের সূর্য; তবে অধিকাংশ নক্ষত্রই যুগলবন্দী—একটি নক্ষত্র ঘুরছে আরেকটিকে ঘিরে। কোনো কোনো তারা, যেগুলোকে বলা হয় সুপারনোভা, অত্যন্ত উজ্জ্বল; আবার কতকগুলো, যেগুলোকে বলা হয় ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর, সেগুলো অন্ধকার। কোনো কোনো তারা জ্বলে একই উজ্জ্বলতা নিয়ে, কোনো কোনোটি ঝিকিমিকি করে; কোনো কোনোটি ঘোরে ধীরশান্তভাবে, কোনো কোনোটি ঘোরে পাগলের মতো। তারাদের রঙও আছে : নীল তারা তরুণ ও গরম; হলদে তারা মাঝবয়সী; লাল তারা বুড়ো ও মুমূর্ষু; আর ছোটো শাদা আর কালো তারাগুলো শিগগিরই মরবে। আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জে ঘোরাঘুরি করছে নানা ধরনের ৪০০ বিলিঅন তারা। সব তারার মধ্যে একটিই ভালো ক'রে চেনা আমাদের, যার নাম রেখেছি আমরা সূর্য।

কোটি কোটি কোটি কোটি তারা ঘিরে কী আছে? কোনো কোনো তারাকে ঘিরে হয়তো আছে ছোটো ছোটো মৃত বিশ্ব, জন্মের পরই যারা ম'রে গেছে। ওই তারাটি কেন্দ্র ক'রে জন্মেছিলো যে-গ্রহগুলো, উদ্ভবের শুরুতেই কোনো মহাজাগতিক রোগে মৃত্যু হয়েছে সেগুলোর। হয়তো অনেক তারা ঘিরে আছে আমাদের মতোই গ্রহমণ্ডলী;—তারাটি থেকে বহু দূরে আছে গ্যাসে-ঢাকা গ্রহ আর বরফীভূত চাঁদ, আর মাঝামাঝি জায়গায় আছে ছোটো, উষ্ণ, নীল-শাদা, মেঘাবৃত গ্রহ। সেগুলোর কোনোটিতে বুদ্ধিমান প্রাণী দেখাও দিতে পারে। আমাদের সূর্যকে ঘিরে কী আছে? সূর্যকে ঘিরে, সূর্যের থেকে সবচেয়ে দূর কক্ষপথে, ঘুরছে বরফ ও শিলায় গঠিত বিশাল বিশাল তুষারগোলক। এগুলো ধূমকেতুর অন্তর্ভাগ। মাঝেমাঝে পাশ দিয়ে চ'লে যাওয়া কোনো নক্ষত্রের টানে এগুলোর কোনো কোনোটি ঢুকে পড়ে সৌরলোকের ভেতরে, তেতে ওঠে সূর্যের তাপে, উবে যায় তার বরফ; এবং দেখা দেয় ধূমকেতু। এগুলো থেকে একটু ভেতরে আছে গ্রহগুলো। গ্রহগুলো সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে অনেকটা বৃত্তাকার পথে। সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে প্লুটো, তার থেকে একটু ভেতরে, সূর্যের আরেকটুকু কাছে আছে নেপটুন, ইউরেনাস, স্যাটার্ন বা শনি, এবং জুপিটার বা বৃহস্পতি। এগুলো গ্যাসের বিশ্ব, আর এগুলোকে ঘিরে ঘুরছে এদের তুষারিত চাঁদ বা উপগ্রহগুলো। সূর্যের আরো কাছাকাছি আছে লালগ্রহ মঙ্গল, যাতে সারাক্ষণ চলছে অগ্ন্যুৎপাত। এর থেকে সূর্যের আরেকটুকু কাছে আমাদের নীল-শাদা পৃথিবী। বিশাল অনন্ত মহাবিশ্বে শুধু এখানেই বিকাশ ঘটেছে প্রাণের। পৃথিবীর আগে, সূর্যের কাছাকাছি, আছে ভিনাস বা শুক্র, আর মারকিউরি বা বুধ।

আমাদের পৃথিবী, আমাদের এই গ্রাম, প্রাণলীলাময়, এর দিকে দিকে চলছে প্রাণের থরোথরো উৎসব; কিন্তু মহাজগতে আর কোথাও কি আছে এমন প্রাণের স্পন্দন? যদি থাকে, তাবে তা কেমন হবে? আমাদের মতো হবে? সেখানকার প্রাণী কি হবে আমাদের মতো? সেখানকার মানুষ কি হবে আমাদের মতো মানুষ? সেখানকার গাছ কি হবে আমাদের গাছের মতো গাছ, সেখানকার বাঘ কি হবে আমাদের বাঘের মতো অন্ধকারে অগ্নিশিখার মতো? সেখানে কি বাঘ থাকবে, থাকবে রঙিন হরিণ? তারা গঠিত হবে কী উপাদানে? পৃথিবীর সব প্রাণীই গঠিত জৈব অণুতে, যাতে কার্বনপরমাণু পালন করে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। এমন এক সময় গেছে যখন কোনো প্রাণ ছিলো না পৃথিবীতে, এটা ছিলো নিষ্প্রাণ শূন্য; কিন্তু এখন পৃথিবী প্রাণে ভরপুর। কীভাবে নিষ্প্রাণ শূন্য পৃথিবী ভ'রে উঠলো প্রাণে? কীভাবে দেখা দিয়েছিলো প্রথম প্রাণ বা বস্তুরাশি? কীভাবে বিকাশ ঘটেছে প্রাণের, বিকশিত হয়েছে মানুষের মতো জটিল প্রাণী? কোটি কোটি সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে যেসব গ্রহ, সেগুলোর কোনোটিতে কি বিকশিত হয়েছে প্রাণ? এক নক্ষত্র থেকে আরেক নক্ষত্রের মাঝামাঝি স্থানে ছড়িয়ে আছে যে-গভীর অন্ধকার, সেখানে রয়েছে গ্যাসের মেঘমণ্ডল, ধুলো, আর জৈব উপাদান। সেখানে ছড়িয়ে আছে নানা জৈব

অণু। এতে বোঝা যায় প্রাণের মৌল উপাদান হয়তো ছড়িয়ে আছে সবখানেই। তাই প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ হয়তো মহাজগতে অবধারিত, যদিও তাতে লাগতে পারে কোটি কোটি বছর। মিল্কি ওয়ে নক্ষত্রপুঞ্জে যে-কোটি কোটি গ্রহ রয়েছে, তার কয়েক কোটিতে কখনোই প্রাণ জেগে নাও উঠতে পারে, কোনো কোনোটিতে হয়তো দেখা দিয়েছিলো এবং ম'রে গেছে, অজস্র গ্রহে হয়তো কখনোই প্রাণ দেখা দেবে না; কিন্তু কোনো কোনোটিতে প্রাণ দেখা দিতেও পারে।

পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে যেসব প্রাণ, তাদের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। পৃথিবীতে আমাদের সকলের রয়েছে একই সাধারণ জৈবরসায়ন; আমরা বহন করি একই সাধারণ বিবর্তনমূলক উত্তরাধিকার। আমরা, সব প্রাণী, উদ্ভূত হয়েছি বিবর্তনের ফলে। মানুষ কোনো স্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত প্রাণী নয়, মানুষ বিকশিত প্রাণী; তবে মানুষেরই একদল রটিয়েছে যে মানুষ স্বর্গচ্যুত পাপী। বিবর্তন প্রমাণিত সত্য। পৃথিবীর সূচনা হয়েছিলো কীভাবে? মোটামুটি ৪.৬ বিলিঅন বছর আগে মহাজাগতিক গ্যাস ও ধুলো জমাট বেঁধে উৎপত্তি হয়েছিলো পৃথিবীর। পৃথিবীর উদ্ভবের পর প্রাণের উদ্ভব হ'তেও সময় লাগে নি; চার বিলিঅন বছর আগে আদিম পৃথিবীর সমুদ্রে ও জলাশয়ে দেখা দিয়েছিলো প্রাণ। তবে একদিনেই আজকের জটিল প্রাণরাশি দেখা দেয় নি, নানা বিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে কোটি কোটি বছরে বিকাশ ঘটেছে প্রাণের। প্রাণের মূলবীজ হচ্ছে ডিএনএ, বা ডিঅক্সিরিবোনিউক্লেয়িক এসিড। ডিএনএ অণু দেখতে মুচড়ে কুণ্ডলিপাকানো মইয়ের মতো, যার ধাপগুলোর রয়েছে চারটি অংশ। ওগুলোতে রয়েছে জৈবসংকেত। একেক প্রাণীর জৈবসংকেত ভিন্ন অন্যটির থেকে। চার বিলিঅন বছর আগে পৃথিবী ভ'রে উঠেছিলো জীবন-অণুতে, শুরু হয়েছিলো প্রাণের বিবর্তন; তারপর কোটি কোটি বছরে দেখা দিয়েছে এবং বিলীন হয়ে গেছে বহু ধরনের প্রাণ। এক সময় পৃথিবীতে এমন সব প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখা দিয়েছিলো, যা আজ নেই। এক সময় পৃথিবীতে ঘটে এক মহাবিস্ফোরণ, তার পর থেকে প্রাণের বিকাশ ঘটতে থাকে দ্রুত। দেখা দিতে থাকে মাছ, মেরুদণ্ডী প্রাণী; ভূমিতে জন্ম নিতে থাকে গাছপালা; জন্মে সরীসৃপ, ডাইনোসর, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, এবং ফোটে ফুল। এক সময় লোপ পায় ডাইনোসররা; দেখা দেয় প্রাইমেট বা উচ্চ মেরুদণ্ডী প্রাণীরা যারা বানর আর মানুষের পূর্বপুরুষ। আজ থেকে এক কোটি বছরের মতো সময় আগে উদ্ভূত হয় মানুষের পূর্ব-পূর্ব-পূর্ব-পূর্বপুরুষ, তাদের মস্তিষ্কও হয় বিকশিত; আর কয়েক মিলিঅন বছর আগে দেখা দেয় আদিমানুষেরা। ধর্মের বইগুলোতে মানুষ সৃষ্টির কাহিনী অত্যন্ত সরল; অতো সরলভাবে অতো অল্প সময়ে মানুষ সৃষ্টি হয় নি। প্রাণ থেকে প্রাণী সৃষ্টি করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে প্রকৃতির। অতি-আদিম মানুষেরা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে দেবদেবী ঈশ্বর ভগবান বিধাতা দেখতে পেতো না। মানুষ যেই সমাজ, পরিবার, এবং এমন অসংখ্য সংকীর্ণ ব্যাপার তৈরি করতে থাকে, তখন ক্রমশ তারা আদিম থেকে আরো আদিম হ'তে থাকে; তারা আকাশে

আকাশে দেখতে পায় দেবদেবী। তারা মেতে ওঠে ভুল কল্পনায়; দেবদেবীদের ওপর তারা অর্পণ করে একেক দায়িত্ব এবং পুজো করতে থাকে অস্তিত্বহীন দেবদেবীদের। মানবিক প্রত্যেকটি ব্যাপারের জন্যে তারা কল্পনা করে একেকটি দেবদেবী, কোটি কোটি দেবদেবীতে ভ'রে ওঠে আকাশমণ্ডল। তাদের কল্পনায় দেবদেবীরা চাইলে নারীর গর্ভে আর মাঠে শস্য সোনা হয়ে ওঠে, না চাইলে নামে বন্যা, দেখা দেয় খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গর্জন ক'রে ওঠে অগ্নিগিরি। তারা কল্পনা করে যে দেবতাদের তুষ্ট করার দরকার, তখন দেখা দেয় পুরোহিত, দৈববাণী, মন্দির, পুজো ইত্যাদির আধিপত্য ও ব্যবসাবাণিজ্য। তাদের কাছে সব কিছুই হয়ে ওঠে রহস্যপূর্ণ। দিকে দিকে দেবতা তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়; তারা মহাজগতের রহস্যকে পরিণত করে শক্তি ও সম্পদের সহজ আকর্ষণীয় উৎসে। আজো সেই ধারা চলছে।

কয়েক হাজার বছর ধ'রে মানুষ উৎপীড়িত হয়ে আসছে নানা নামের কল্পিত অতিমানবিক সত্তাদের দ্বারা। এই পীড়নে অবশ্য ভূমিকা নেই কল্পিত সত্তাদের; তারা কাউকে পীড়ন করে না, তারা জানেও না যে তারা আছে, সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের; কিন্তু তাদের নামে সুবিধাভোগী একদল মানুষ পীড়ন করে অন্য মানুষদের। তারা সবাইকে বাধ্য করে তাদের কল্পিত সত্তাদের মানতে, পুজো করতে। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিসের কাছাকাছি আইওনিয়ার অ্যাজিয়ান সাগরের সামোস দ্বীপে দেখা দেয় ভিন্ন চিন্তা। সেখানকার মানুষেরা মনে করতে শুরু করে যে দেবতা নেই, সব কিছুই অণুতে গঠিত, মানুষও তাই; পৃথিবী একটি গ্রহ, যা ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, আর নক্ষত্রেরা আছে বহু দূরে। আদিগ্রিকরা বিশ্বাস করতো যে আদিকালে ছিলো 'বিশৃঙ্খলা' বা 'গোলমাল' নামে একটি প্রাণী, এবং সেটি মিলিত হয়েছিলো রাত্রি দেবীর সাথে। তাদের মিলনে জন্মে দেবতারা ও মানুষেরা। তাদের চোখে বিশ্ব গোলমাল থেকে উৎপন্ন ব'লে পৃথিবীর সব কিছুই পরিপূর্ণ গোলমালে; আর ওই গোলমালকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শুধু খামখেয়ালি দেবদেবীরা। খ্রিপূ ষষ্ঠ শতকে সামোস দ্বীপে এ-চিন্তার উদ্ভব ঘটে যে বিশ্বজগত বিশৃঙ্খল নয়, এবং বিশ্বকে জানাও সম্ভব। এই চিন্তা দেখা দেয় নি ভারত, মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, ও চিনে; কারণ এসব দেশে দেবতাদের নিয়ে এর আগেই রাজনীতির খেলা শুরু হয়ে গেছে। আইওনিয়ার প্রথম বৈজ্ঞানিক থেলেস বাদ দেন দেবতাদের; দেবতা ছাড়াই বুঝতে চেষ্টা করেন বিশ্বকে। তবে কয়েক শো বছরের মধ্যেই সমাজপ্রভুরা ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে; কেননা তারা দেখতে পায় কুসংস্কারে তাদের লাভ অনেক, বিজ্ঞানে ক্ষতি প্রচুর।

প্লাতো-আরিস্ততল, যাঁরা খুব জ্ঞানী ব'লে বিখ্যাত, কাজ করেন বিজ্ঞানের ও মানুষের বিরুদ্ধে। প্লাতো বলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রমণ্ডল সম্পর্কে ভাববেন, তবে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ ক'রে সময় নষ্ট করবেন না। ঘরে বা গুহায় ব'সে ভেবে ভেবে দেবতা বা বিধাতা সৃষ্টি সম্ভব, তাদের স্বরও শোনা যেতে পারে, আদর্শ

রাষ্ট্রও পরিকল্পনা করা যায় স্পার্টার অনুকরণে, কিন্তু নক্ষত্রমণ্ডলের কার্যকলাপ বোঝা যায় না। আরিস্ততল মনে করতেন নিম্নশ্রেণীর মানুষ দাসস্বভাবের, তাদের কোনো প্রভুর অধীনে থাকাই মঙ্গল। গ্রিসে বিজ্ঞানের মৃত্যুর এক কারণ দাসপ্রথার উদ্ভব। প্লাতো ও আরিস্ততলের কালে দাসপ্রথা বেশ শক্ত প্রথায় পরিণত হয়। ওই দার্শনিকেরা ও আরো অনেকে গণতন্ত্রের কথা বলতেন, তবে ওই গণতন্ত্র সকলের জন্যে গণতন্ত্র ছিলো না, ছিলো সমাজের সুবিধাভোগী অভিজাতদের জন্যে। দাসরা করতো শারীরিক শ্রম, আর বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাও ছিলো শারীরিক শ্রমের কাজ। প্লাতো আর আরিস্ততল বেশ আরামে ছিলেন দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজে; তাঁরা স্বৈরাচারীদের সেবক ছিলেন, এবং দাসপ্রথার পক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁদের দর্শন। দাসপ্রথা যাতে ভালোভাবে চলে, তার জন্যে তাঁরা ভাগ করেন শরীর ও আত্মাকে, পার্থক্য করেন বস্তু ও চিন্তার মধ্যে, আকাশমণ্ডল থেকে পৃথক করেন পৃথিবীকে, যে-সমস্ত বিভাজন আজো অনেকে আঁকড়ে আছে প্রাণপণে। প্লাতোর বিশ্বাস ছিলো সবখানেই দেবতারা আছে, এবং তিনি নিজের রাজনীতিক বিশ্বাস বিশ্বজগতের সাথে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানবিরোধী; এবং তাঁর পর দেখা দেয় প্লাতোনীয়রা, ও খ্রিস্টানরা, যারা বিশ্বাস করতো পৃথিবী একটি নোংরা জায়গা, আকাশমণ্ডল হচ্ছে বিশুদ্ধ ও স্বর্গীয়। এর ফলে পৃথিবী যে একটি গ্রহ, আমরা যে মহাজগতের অধিবাসী, এ কথাটি ভুলে যাওয়া হয়। প্লাতোর জন্মের আগেই আইওনিয়ার আরিস্তার্কাস বলেছিলেন পৃথিবী নয়, সূর্যই গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্র, গ্রহগুলো ঘুরছে সূর্যকে ঘিরে; কিন্তু তাঁর কথা আপত্তিকর মনে হয় সকলের। প্লাতোর প্রভাবে তাঁর লেখা ভুলে যাওয়া হয়। তাঁর আঠারোশতক পর একই কথা বলেন কোপারনিকাস; আমরা এখন মানি কোপারনিকাসকেই।

গ্রহগুলো একে অন্যের থেকে বহু দূরে; পৃথিবী থেকে ভিনাসের দূরত্ব চার কোটি কিলোমিটার, প্লুটোর দূরত্ব ছয় বিলিঅন কিলোমিটার, মহাজগত ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি আলোকবর্ষব্যাপী; এসব আজ জানি আমরা, কিন্তু এতো দূরত্বের কথা পুরোনো কালের কেউ ভাবতেও পারতো না। স্থান ও কালের অনন্ততা অসীমতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না। গ্রিকরা মনে করতো সূর্য একটা ছোটো ভূখণ্ডের সমান, বিশ্বকেও তারা বেশি বড়ো মনে করতো না। শিশুরা আকাশের দিকে তাকিয়ে যেমন মনে করে একটু দূরেই আকাশ নীল হয়ে ঘিরে আছে পৃথিবীকে, আর সূর্য চাঁদ তারাও বেশি দূরে নয়, তেমনিই মনে করতো পুরোনো কালের মানুষ। পুরোনো মিশরিরা মনে করতো আকাশ হচ্ছে একটি তাঁবুর চন্দ্রাতপ, যেটি খাটানো হয়েছে চারটি পাহাড়ের ওপর। গ্রিকদের চোখে সূর্য ছিলো মাত্র কয়েক হাজার ফুট দূরে; এর পরিচয় পাই গ্রিক পুরাণের ইকারুসের গল্পে। ইকারুস তার বানানো ডানা দিয়ে উড়ে উড়ে ঢুকে গিয়েছিলো সূর্যে, সূর্য খুব দূরে হ'লে এটা সম্ভব হতো না। তাদের চোখে তারাগুলোও বেশি দূরে ছিলো না। পুরোনো মানুষেরা মহাজগতের আয়তন ও নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব সম্পর্কে খুবই ভুল ধারণা পোষণ করতো, তবে তারা বেশ পরিচিত ছিলো বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের

গতির সাথে। এসব তাদের জানতে হতো কৃষি ও অন্যান্য কাজের জন্যে। পৃথিবী আর গ্রহনক্ষত্র কী, মহাবিশ্বের রূপ কী, তারা বোঝে নি, তাই তারা এসব সম্পর্কে করতো নানা কল্পনা, বানাতো গল্প। মহাজগত পুরাণের পর শুরু হয় মহাজগতকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা। খ্রিপূ চতুর্থ শতকে মহাজগতকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন এশিয়া মাইনরের ইউডোক্সাস। তিনি একটি কাঠামো তৈরি করেন সৌরজগতের, যাতে পৃথিবী একটি গোলক, যাকে ঘিরে আছে একটির পর একটি সমকেন্দ্রিক গোলক। তাঁরও আগে পারমেনিদেস গোলকের পর গোলকরূপে বিশ্বের রূপ প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর কাঠামোতে গোলকের সংখ্যা ছিলো কম। ইউডোক্সাস গোলকের সংখ্যা বাড়িয়ে করেন সাতাশ। তিনি যে-বিশ্বজগতের রূপ প্রস্তাব করেন, তা খুবই জটিল; তবে তার সাহায্যেও ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিলো না দৃশ্যমান আকাশ।

এর পর দেখা দেন সর্বজ্ঞ, বিধাতার থেকে জ্ঞানী, আরিস্ততল। তিনি বিধাতার মতোই জ্ঞানের নামে দু-হাজার বছরের জন্যে তৈরি ক'রে যান অসংখ্য বিভ্রান্তি। বলা হয়ে থাকে তিনি সব কিছু দেখে সিদ্ধান্ত নিতেন;—তিনি ছিলেন পর্যবেক্ষণ বা উপাত্তবাদী, আসলে তিনি পর্যবেক্ষণ পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীদের দাঁতগুলোও গুনে দেখার আগ্রহ বোধ করেন নি, না দেখেই ব'লে গেছেন পুরুষের থেকে নারীর দাঁতের সংখ্যা কম, আর দু-হাজার বছর ধ'রে অন্যরাও না দেখেই বিশ্বাস করেছে যে নারীদের দাঁতের সংখ্যা কম। মহাপুরুষেরা যেমন মহাউপকারী, তেমনি অনেক সময় মহাক্ষতিকরও। জানি না বলার অভ্যাস ছিলো না তাঁর; তিনি মনে করতেন তিনি সব জানেন। আরিস্ততল বিশ্বের গঠন বর্ণনার জন্যে তৈরি করেন একটি কাঠামো, এতে তিনি সঙ্গে নেন কালিপ্পুসকে। তাঁরা দুজনে ইউডোক্সাসের বিশ্বকাঠামো ভিত্তি ক'রে তৈরি করেন এক নতুন বিশ্বকাঠামো, যা পাওয়া যায় আরিস্ততলের *আকাশমণ্ডল* গ্রন্থে। কাঠামোটি তাঁর দর্শনের মতোই চমৎকার, ও শোচনীয়রূপে ভুল; আরো শোচনীয় হচ্ছে যে এ-কাঠামো দু-হাজার বছর ধ'রে বিভ্রান্ত করেছে, এবং প্যালেস্টাইন অঞ্চলের ধর্মবইগুলোর মধ্যে ঢুকে আজো বিভ্রান্ত করছে মানুষকে। এটিও গোলকের সমষ্টি; এতেও বিশ্ব হচ্ছে গোলকের পর পর গোলক, মোট পঞ্চান্নটি গোলকের সমষ্টি। আরিস্ততলের মতে শেষ গোলকটির পর আর কিছুই নেই, কিছুই থাকতে পারে না। এই গোলকরাশির কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। তাঁদের সকলেরই বিশ্বাস ছিলো যে জগতের কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী; তাই পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্বের রূপ গঠন করতে গিয়ে জটিল ও জটিলতর রূপে তাঁরা প্রস্তাব ক'রে চলছিলেন গোলকের পর গোলক। গোলকের পর গোলকের বিন্যাসের মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন স্বর্গীয় সুষমা। তাঁরা কল্পনা করতেন যে নক্ষত্ররাশির চলার ফলে বেজে ওঠে স্বর্গীয় ঐকতান; তাঁরা শুনতে পান স্বর্গীয় গোলকের সঙ্গীত। বহু কবি গোলকের স্বর্গীয় সঙ্গীত নিয়ে লিখেছেন বহু কবিতা। এটা কাব্যিক কল্পনা হিশেবে সুন্দর, কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল।

গোলকবিন্যাস চূড়ান্তরূপ পায় দ্বিতীয় শতকের মিশরের নীল নদীর তীরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লদিউস টলেমির বিশ্বকাঠামোতে। আরিস্ততলের মতো আকাশের দিকে না তাকিয়ে তিনি তাঁর কাঠামো তৈরি করেন নি, নক্ষত্রদের চলাচল তিনি যন্ত্রের সাথেই দেখেন, এবং একটি বই লেখেন *গাণিতিক রচনা* নামে। বইটি আরবিতে অনূদিত হয় *আলামাজেস্ত* বা *'সর্বশ্রেষ্ঠ'* নামে। এটি সূর্য, নক্ষত্র, ও গ্রহগুলোর চলাচল আগের কাঠামোগুলো থেকে ভালোভাবে নির্দেশ করে। তিনিও তাঁর কাঠামোতে পৃথিবীকে রাখেন কেন্দ্রে, এবং রাখেন গোলকের পর গোলক, আর রাখেন এপিসাইকেল ও এক্সেন্ট্রিক। এপিসাইকেল হচ্ছে এমন বৃত্তাকার কক্ষপথ, যা ঘোরে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে, যে-বিন্দু ঘোরে অন্য কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে। এক্সেন্ট্রিক হচ্ছে এমন গোলক, যেটি স'রে যায় বিশ্বের কেন্দ্র থেকে। এর সাথে তিনি যুক্ত করেন আরেক ধরনের বৃত্তাকার গতি। তাঁর বিশ্বকাঠামো বেশ অসুন্দর আরিস্ততলের কাঠামোর তুলনায়, তবে এটা হয়ে ওঠে বেশ গ্রহণযোগ্য; কেননা জোড়াতালি দিয়ে এটা অনেক কিছু ঠিকঠাক মতো নির্দেশ করতে পারে। ইউরোপে রেনেসাঁস পর্যন্ত এটা নিজের মহিমা গৌরবের সাথেই রক্ষা করে। তবে তাঁর বিশ্বতত্ত্ব বা বিশ্বকাঠামো বাস্তব বিশ্ব ব্যাখ্যা করে না, তিনি আকাশে যে চাকার পর চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, সে-সব চাকা আকাশে নেই। টলেমির বৃত্তের পর বৃত্ত সে-সব বস্তুর প্রাকৃতিক গতি নির্দেশ করে, যেগুলো প্রকৃতিতে নেই। কিন্তু তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ব্যাপক; ধর্মপ্রবর্তকেরা তাঁর কাঠামো বিধাতার কাঠামো হিশেবে ঢুকিয়ে দেন বিধাতার বইতে, এবং উপাসনালয়গুলো আর ধার্মিকেরা সাত আকাশ দশ আকাশ ব'লে কীর্তন করে তাঁরই বিশ্বকাঠামো। সাত আসমান দশ আসমান ব'লে কিছু নেই, ধর্মের বইগুলো বিধাতা লিখলে এমন ভুল করতেন না।

পৃথিবীকেন্দ্রিক যে-সব বিশ্ব বা মহাজগত কল্পনা করেছিলেন ইউডোক্সাস, আরিস্ততল, টলেমি, সেগুলো আজকের মহাজগতের তুলনায় ছিলো খুবই ছোটো। তবে এগুলোর মধ্যে টলেমির বিশ্বই সবচেয়ে বড়ো। তাঁদের বিশ্ব ছোটো ছিলো, এর মূলে রয়েছে তাঁদের দুটি বিশ্বাস : একটি হচ্ছে যে বিশ্বের কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী, অন্যটি হচ্ছে পৃথিবী স্থির। তাঁদের ভাবনায় পৃথিবী ছিলো অচল, আর সচল ছিলো নক্ষত্রগুলো। ওই নক্ষত্রগুলোকে একদিন ঘুরতে হতো পৃথিবীর চারদিকে। যদি বিশ্ব খুব বড়ো হতো, তাহলে তারাগুলোকে এতো তীব্র গতিতে ঘুরতে হতো, যা বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো না তাঁদের কাছে। কী ক'রে তারাগুলো এতো দ্রুত ঘুরতে পারে? তাই বিশ্বকে ছোটোরূপে কল্পনা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। পৃথিবী যে ঘুরতে পারে এটা মনেই আসে নি কারো; আপাতদৃষ্টিতে কারোই মনে হয় না যে পৃথিবী ঘোরে। পৃথিবী কি ঘুরতে পারে? গ্রিক জ্ঞানীরা কেউ কেউ ভেবে দেখেছেন ব্যাপারটি, এটা তাঁদের মনে হয়েছে হাস্যকর; তাঁদের মনে হয়েছে পৃথিবী ঘুরলে সারাক্ষণ ঝড় বইতো পৃথিবীতে, আর অলিম্পিক খেলোয়াড়রা যেখান থেকে লাফ দিতো পড়তো তার থেকে অনেক সামনে বা অনেক পেছনে,

কেননা এর মাঝে পৃথিবী অনেকখানি ঘুরতো। তাই তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন যে পৃথিবী ঘুরতে পারে না। কিন্তু পৃথিবী ঘোরে, মহাজগত অনন্ত; তবে আজো অনেকের বিশ্বাস পৃথিবী ঘোরে না। এর মূলে আছে পৃথিবীর ধর্মের বইগুলো; এগুলোতেই বেশি বিশ্বাস করে অন্ধরা। কোপারনিকাস, কেপলার, আর গ্যালিলিওর জন্মের পরেও সাহিত্য অন্ধ থেকে গেছে। মিল্টন দেখা করেছিলেন গ্যালিলিওর সাথে, তাই তাঁর বিশ্ব বেশ বড়ো; তবু তাঁর *স্বর্গচ্যুতি* মহাকাব্যে পৃথিবীই মহাজগতের কেন্দ্র। ওই কাব্যে এক দেবদূত আদমকে উপদেশ দিয়েছে :

> যা কিছু গোপন সে-সব সম্পর্কে চিন্তা কোরো না,
> সব ছেড়ে দাও বিধাতার হাতে, সেবা আর ভয় করো তাঁকে :
> ...সুখে থাকো
> যা কিছু তোমাকে তিনি দিয়েছেন সেই সব, এই স্বর্গ
> আর রূপবতী হাওয়াকে নিয়ে; স্বর্গ তোমার বোঝার জন্যে অতি উচ্চ
> কী ঘটে সেখানে তুমি বুঝবে না; নতভাবে হও জ্ঞানী :
> ভাবো শুধু সে-সব যা কিছু প্রাসঙ্গিক তোমার জন্যে;
> অন্য জগতের স্বপ্ন দেখো না।

দেবদূতরা চিরকালই অন্ধতা ও আনুগত্যের পরামর্শ দিয়েছে; কিন্তু মানুষ, অন্তত কিছু মানুষ, ওই পরামর্শ শোনে নি। আমরা সারা বিশ্ব সম্পর্কেই ভাবি, সারা মহাজগতই আমাদের জন্যে প্রাসঙ্গিক; এবং আমরা জানি ওই দেবদূত ও তার বিধাতার থেকে অনেক বেশি।

মহাজগত অনন্ত; সবচেয়ে প্রতিভাবান চিন্তাও তার সবটা এখনো বুঝে ওঠে নি, তবে বুঝেছে অনেকখানি, ভবিষ্যতে আরো বুঝবে। মহাজগতের উৎপত্তি হলো কীভাবে? যেভাবেই হোক, বিভিন্ন পুরাণ আর ধর্মের বই যেভাবে হয়েছে ব'লে প্রচার করে সেভাবে হয় নি। *বাইবেল* বিশ্বসৃষ্টির যে-গল্পটি বলে, তা এমন :

> আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিলো, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল [আদিপুস্তক : জগত-সৃষ্টির বিবরণ]।

বাইবেলের বিধাতা প্রথম দিনে এ-কাজটুকু করেন, আরো ছ-দিনে আরো কিছু কাজ ক'রে ক্লান্ত হয়ে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। বিধাতাও ক্লান্ত হন! এ-সৃষ্টিতত্ত্বে, কিছুটা সংশোধন ক'রে বিশ্বাস করে অন্তত তিনটি ধর্মের লোকেরা। এটা প্যালেস্টাইন অঞ্চলের পুরাণ, লৌকিক গাথা। মহাজগতের উৎপত্তির প্রক্রিয়া এর থেকে অনেক চাঞ্চল্যকর ও মহাজাগতিক।

বিশ্ব বা মহাজগত কখন সৃষ্টি হয়েছিলো? ইহুদি, খ্রিস্টান, ও ইসলাম ধর্মে বিশ্বসৃষ্টির যে-বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে বোঝা যায় তাদের বিশ্বাসে মহাজগত

সৃষ্টি হয়েছিলো অতীতের এক নির্দিষ্ট সময়ে; আর সে-অতীত বেশি অতীত নয়। তাদের ভাবনায় ওই সময়টা অবশ্য অত্যন্ত দীর্ঘ, কেননা হাজার বছর তাদের চিন্তায় ছিলো মহাকালের মতো। সন্ত অগাস্টিন বাইবেলের 'জগত-সৃষ্টির বিবরণ' অনুসারে সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন খ্রিপূ ৫০০০ অব্দের দিকে বিধাতা সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্ব। সতেরোশতকে জেমস আশার হিশেব ক'রে দেখান যে বাইবেল অনুসারে বিধাতা বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে; আর লাইটফুট আরো নিপুণভাবে হিশেব ক'রে দেখান যে বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন ২৩ অক্টোবর ৪০০৪ খ্রিপূ, সকাল ৯ :০০ টায়! বাইবেলপ্রণেতাদের জন্যে চার হাজার বছর অত্যন্ত দীর্ঘ, কিন্তু আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত তুচ্ছ সময়। আরিস্ততল, ও অন্যান্য গ্রিক দার্শনিক, মনে করতেন বিশ্ব আর মানুষ চিরকাল ধ'রেই আছে। বিশ্ব কি সৃষ্টি হয়েছিলো এক বিশেষ সময়ে এবং বিশ্বের কি রয়েছে বিশেষ স্থানিক সীমা, এটা ভাবিয়েছিলো আঠারোশতকের দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টকে। তিনি এ-প্রশ্নকে মনে করেন বিশুদ্ধ যুক্তির বিরোধী; কেননা তাঁর মতে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিলো এক বিশেষ সময়ে, অর্থাৎ বিশ্বের রয়েছে আরম্ভ, এটা যেমন যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করা যায়, তেমনই যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করা যায় যে বিশ্ব চিরকাল ধ'রে আছে। তাঁর যুক্তি হচ্ছে যদি বিশ্বের কোনো আরম্ভ না থাকে, তাহলে যে-কোনো ঘটনার আগে আছে অনন্তকাল, যা তাঁর কাছে অযৌক্তিক; আবার যদি বিশ্বের থাকে আরম্ভ, তাহলে তারও আগে থাকে অনন্তকাল; তাহলে বিশ্ব কেনো আরম্ভ হবে এক বিশেষ সময়ে? কান্ট গোলমালে পড়েছিলেন সময় ধারণাটি নিয়ে। হকিং মনে করেন বিশ্ব সৃষ্টির আগে সময় ধারণার কোনো অর্থ নেই; সময়ের সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব সৃষ্টির সাথে। যদি বিশ্বসৃষ্টির আগেও সময় ছিলো মনে করি, যেমন আমাদের মনে হয়, আর মনে করি যে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব, তাহলে প্রশ্ন উঠবে বিশ্ব সৃষ্টির আগে বিধাতা কী করেছিলেন? এতোকাল ধ'রে মানুষ বিশ্বকে স্থির ও অপরিবর্তনীয় ব'লে মনে করেছেন; কিন্তু ১৯২৯-এ এডউইন হাবেল দেখতে পান এক অভাবিত ব্যাপার। তিনি দেখেন দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ দ্রুত স'রে যাচ্ছে আমাদের থেকে; অর্থাৎ মহাজগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাই মনে করতে পারি এমন একটা সময় ছিলো যখন মহাজগতের সব কিছু ছিলো কাছাকাছি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন আজ থেকে দশ বা বিশ হাজার মিলিঅন বছর আগে মহাজগতের সব কিছু ছিলো একীভূত; তাই মহাজগতের ঘনত্ব ছিলো অসীম। হাবেল যা দেখতে পান, তাতে মনে হয় এমন একটা সময় ছিলো, যখন মহাজগত ছিলো অন্তহীনরূপে ক্ষুদ্র আর সীমাহীনরূপে ঘন। ওই অবস্থায়ই ঘটে Big Bang—মহাবিস্ফোরণ।

দশ বা বিশ বিলিঅন বছর আগে ঘটে এক মহাবিস্ফোরণ,—বিগ ব্যাং—মহাশব্দ; আর সূচনা হয় মহাজগতের। সময় সম্পর্কে অবশ্য হকিংয়ের ব্যাখ্যাটি মনে রাখা দরকার। হকিংয়ের মতে সময়ের সূচনা হয় বিগ ব্যাংয়ে,

কেননা এর আগের সময়কে সংজ্ঞায়িত করার কোনো দরকার নেই। কেনো এটা ঘটে সেটা অবশ্য এক বিস্ময়; তবে ঘটেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। এখন মহাজগতে যতো বস্তু ও শক্তি আছে তখন সে-সব ছিলো চরম ঘনীভূতরূপে, শূন্যরূপে, তা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। এক সময় ঘটে ওই ঘনীভূত শক্তি ও বস্তুর বিস্ফোরণ। ওই বিস্ফোরণের ফলে প্রসারিত হ'তে থাকে মহাজগত, যা আজো চলছে। মহাজগত চিরসম্প্রসারণশীল। মহাজগতের, অর্থাৎ স্থানের বিস্তারের সাথে সাথে সব দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বস্তু ও শক্তি। বিস্ফোরণের কালে মহাজগতের সব এলাকা আলোকিত হয়ে উঠেছিলো; কিন্তু সময় বইতে থাকে, মহাজগত সম্প্রসারিত হ'তে থাকে, বিকিরণ শীতল হ'তে থাকে, আর মহাজগত অন্ধকার হ'তে থাকে। আদিমহাজগত পরিপূর্ণ ছিলো হাইড্রোজেন ও হেলিয়ামে, এবং বিকিরণে। তখনই সৃষ্টি হয় নক্ষত্রমণ্ডলী। মহাবিস্ফোরণের এক বিলিঅন বছরের মতো সময়ের পর দেখা যায় কোথাও বস্তু জড়ো হয়েছে, আবার কোথাও জড়ো হয় নি। তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চারপাশের গ্যাসকে আকর্ষণ করে, যার থেকে সৃষ্টি হয় নক্ষত্রমণ্ডলীপুঞ্জ। মহাজগতের সবখানে কাজ করে একই নিয়ম, তাই মহাজগতের সবখানে দেখা যায় একই রকম নক্ষত্রমণ্ডলি। ওই মহাবিস্ফোরণ থেকেই দেখা দেয় নক্ষত্রমণ্ডলী, নক্ষত্র, গ্রহ তারপর জীবন। এখন মহাজগতে রয়েছে অজস্র নক্ষত্রমণ্ডল।

সূর্য একটি নক্ষত্র বা তারা; এটি আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র। সূর্য হাইড্রোজেন ও হেলিয়াম গ্যাসের এক বিশাল গোলক, প্রচণ্ড তাপে এটি জ্বলজ্বল করছে। এর ভেতরটি প্রচণ্ডভাবে জ্বলছে; এর ভেতরের তাপ চার কোটি ডিগ্রি, বাইরের তাপ ছ-হাজার ডিগ্রি। কীভাবে জন্ম নেয় তারা ও গ্রহগুলো? মহাজাগতিক গ্যাস ও ধুলোর মহামেঘের বিপর্যয়ের ফলেই জন্ম নেয় নক্ষত্র ও গ্রহ। মেঘের ভেতরের গ্যাসের অণুরাশির সংঘর্ষের ফলে তাপ বাড়ে, হাইড্রোজেন হয়ে উঠতে থাকে হেলিয়াম, এবং কোটি কোটি বছরে একেকটি তারকার জন্ম হয়। তারাদের জন্ম হয় দলে দলে, এবং ছড়িয়ে পড়ে মহাজগতের দিকে দিকে। একই মেঘ থেকে জন্ম হয়েছিলো সূর্য ও আরো কয়েকটি নক্ষত্রের, মহাজগতের কোথাও এখন আছে সূর্যের সহোদর নক্ষত্রগুলো। সূর্যের ভেতরে সারাক্ষণ চলছে বিস্ফোরণ, তার ফলে হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হচ্ছে হেলিয়ামে; এজন্যেই সূর্য এতো উজ্জ্বল। হাইড্রোজেনের বিস্ফোরণ চিরকাল চলবে না, এক সময় তা ফুরিয়ে আসবেই। সূর্য ও অন্যান্য তারা কতোকাল বাঁচবে, তা নির্ভর করে সেগুলোর উদ্ভবের সময়ের ভর বা বস্তুপরিমাণের ওপর। সূর্যের কী নিয়তি? আজ থেকে পাঁচ বা ছয় বিলিঅন বছরের মধ্যে সূর্যের ভেতরের সব হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হবে হেলিয়ামে, থাকবে না কোনো হাইড্রোজেন; তখন সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে সূর্যের ভেতর ভাগের হেলিয়ামপূর্ণ এলাকাটি আরো ঘনীভূত হবে, সূর্যের ভেতরের তাপ

বেড়ে যাবে বহুগুণে, সূর্যে দেখা দেবে তীব্র বিকিরণ। এর ফলে সূর্য আরো কিছু কাল, কয়েক লক্ষ বছর ধ'রে জ্বলবে।

তখন একটি বড়ো পরিবর্তন ঘটবে সূর্যের। তার বাইরের দিকটা প্রসারিত হয়ে শীতল হয়ে আসতে থাকবে। সূর্য তখন হয়ে উঠবে এক বিশাল লাল দানব নক্ষত্র। তার বাইরের এলাকাটি ভেতরের এলাকা থেকে এতো দূরবর্তী হবে যে বাইরের দিকে মাধ্যাকর্ষণ অত্যন্ত ক'মে যাবে। এর ফলে বাইরের অংশটি দিকে দিকে প্লাবনের মতো বয়ে চলবে। তখন সূর্যের প্লাবনের ভেতরে হারিয়ে যাবে মারকিউরি ও ভেনাস; হয়তো পৃথিবীও। তখন সৌরজগতের শুরুর এলাকাটি ঢুকে যাবে সূর্যের ভেতরে। আজ থেকে কয়েক বিলিঅন বছর পর পৃথিবীতে দেখা দেবে শেষ বিশুদ্ধ দিন। সেদিনের পর সূর্য লাল হবে ধীরেধীরে, ফেঁপে কাছাকাছি এসে যাবে পৃথিবীর। মেরুর বরফ গলে পৃথিবী জুড়ে বয়ে যাবে প্রবল বন্যা। প্রচণ্ড তাপে ওই জলরাশি পরিণত হবে বাষ্পে, পৃথিবী ঘিরে দেখা দেবে ঘন মেঘমণ্ডল, যাতে বাধা পাবে সূর্যের রশ্মি। একটু বিলম্বিত হবে পৃথিবীর ধ্বংস। তবে তাপে সব জল বাষ্পে পরিণত হবে এক সময়, পৃথিবীর জলবায়ু নিঃশেষিত হয়ে মিশে যাবে মহাশূন্যে, মহাপ্রলয় শুরু হবে পৃথিবী জুড়ে। সূর্য ও পৃথিবী ধ্বংস হবে, তবে মানুষ হয়তো ধ্বংস হবে না। তখন মানুষেরও এতো বিবর্তন ঘটবে, এতো বিকশিত হবে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যে তারা পৃথিবী ধ্বংসের অনেক আগেই হয়তো পাড়ি জমাবে অন্য কোনো গ্রহে, বা নিজেদের জন্যে তৈরি ক'রে নেবে কোনো মহাজাগতিক বাসভূমি। তখনো সূর্যের ভেতরে ও বাইরে ঘ'টে চলবে নানা বদল; থেমে যাবে তার ভেতরের পারমাণবিক বিক্রিয়া, এবং বাড়বে সূর্যের আয়তন। সূর্য তারপর কয়েক হাজার বছর বেঁচে থাকবে মুমূর্ষু অবস্থায়; আমাদের সূর্য পরিণত হবে সূর্যের প্রেতাত্মায়। সূর্য তখন হয়ে উঠবে একটি ছোটো তারা, চরমরূপে ঘনীভূত হয়ে হবে এক হোয়াইট ডোআর্ফ বা শাদা বামন। তবে এ-ই তার শেষ পরিণতি নয়। সূর্য শীতল হ'তে থাকবে, ঠাণ্ডা হ'তে থাকবে, এবং শেষে পরিণত হবে এক মৃত কালো বামনে।

ধ্বংস আনিবার্য, তবে এখনো সুদূর। মহাজগতকে যদি ঠিকভাবে বুঝি আমরা, আর বুঝি মহাসমুদ্রের এক কোণে আমাদের ছোট্ট চরটিকে, তাহলে আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে দেবদেবী আর বিধাতার ভয়ে কেঁপে উঠবো না আমরা। এখন ভয় পাই, কারণ অন্ধকারে ভয় না পেয়ে উপায় নেই। মানুষের স্বভাব হওয়া উচিত অবিশ্বাস, অবিশ্বাস হচ্ছে আলো; আর বিশ্বাস মানুষকে পরিণত করে জড়বস্তুতে। তবে বিশ্বাস শুরু থেকেই রাজনীতি; সমাজপ্রভুরা বিশ্বাসকে ব্যবহার করে তাদের প্রধান কৌশল ও অস্ত্ররূপে। মহাজগতের উৎপত্তির জন্যে দরকার পড়ে না কোনো বিধাতার, ধ্বংসের জন্যেও পড়ে না; তবে সমাজরাষ্ট্রের ওপর প্রভুত্ব করার জন্যে দরকার পড়ে বিধাতার। তবে বিধাতা স'রে যাবেন, রাজনীতিবিদেরা তাঁকে বেশি দিন আয়ত্তে রাখতে পারবেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্ম

আদিম মানুষদের অন্ধ আদিম কল্পনা, আর পরবর্তী অনেকের সুপরিকল্পিত মিথ্যাচার, কখনো কখনো মত্ততা, নানাভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে নিয়েছে যে-বিচিত্র রূপ, তাই পরিচিত ধর্ম নামে। বার্ট্র্যান্ড রাসেল, *আমি কেনো খ্রিস্টান নই* বইটি'তে, বলেছেন, 'সব ধর্মই ক্ষতিকর ও অসত্য।' কোনো অলৌকিক জগত থেকে কেউ ধর্ম পাঠায় নি, যদিও এটা বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়ে ভয় দেখানো হয়; কোনো অলৌকিক জগত নেই, মানুষ নিয়ে কোনো অলৌকিক সত্তার কোনো উদ্বেগ নেই। মহাবিশ্বে মানুষ খুবই ক্ষুদ্র। ধর্ম অলৌকিক নয়—বিধাতার বা দেবদেবীদের প্রণীত নয়; ধর্ম লৌকিক—মানুষের প্রণীত এবং বেশ সন্ত্রাসবাদী, ব্যাপার। মানুষ উদ্ভাবনশীল; মানুষের অজস্র উদ্ভাবনের একটি, ও সম্ভবত নিকৃষ্টটি, ধর্ম। ধর্মকে শাশ্বত সর্বজনীন মনে করার একটা চাপ রয়েছে; তবে ধর্ম শাশ্বত নয়, সর্বজনীন নয়। কোনো ধর্ম নেই, যা মানুষের শুরু থেকে চ'লে এসেছে, ও চিরকাল চলবে; কোনো ধর্ম নেই, যাতে বিশ্বাস করে সবাই। অনেক সত্য আছে, যা সবাই শুধু বিশ্বাস নয়, স্বীকার করে; কিন্তু বিশেষ একটি ধর্ম ও তার বিধাতার বিশ্বাস করে শুধু ওই ধর্মের মানুষ। অন্য ধর্মের মানুষের কাছে তা হাস্যকর ও অনেক সময়, ঘৃণার বিষয়। চারপাশে ধর্ম দেখে মনে হ'তে পারে যে মানুষ ধর্ম ছাড়া বাঁচতে পারে না; সত্য হচ্ছে ধর্মের মধ্যে মানুষ বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। মানুষ মর্মমূলে ধর্মবিরোধী, মানুষের পক্ষে বেশি ধর্ম সহ্য করা অসম্ভব;—ধার্মিকেরাও যতোটা ধার্মিক তার থেকে অনেক বেশি অধার্মিক। মানুষের সৌভাগ্য মানুষ বেশি ধর্ম সহ্য করতে পারে না, তাই বিকাশ ঘটেছে মানুষের। বেশি ধর্মে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, ধার্মিক মানুষ অসুস্থ মানুষ। মানুষ যদি আপাদমস্তক—চব্বিশ ঘণ্টা, তিরিশ দিন, বারোমাস—ধার্মিক প্রাণী হতো, আজো তাহলে থাকতো আদিম অবস্থায়। মানুষের মনের আদিম অংশটুকু ধর্ম। ধার্মিক মানুষকে প্রশংসা করার একটা রীতি প্রচলিত রয়েছে; বলা হয় যে প্রকৃত ধার্মিক মানুষ খুব ভালো মানুষ; কিন্তু সত্য তার উল্টো,—প্রকৃত ধার্মিক মানুষ প্রকৃত খারাপ মানুষ। সে অবিকশিত, এবং মানুষের বিকাশের বিরোধী। হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান যদি সবাই হতো প্রকৃত হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান, তবে তারা আজো বাস করতো

পাঁচ থেকে দেড় হাজার বছর আগের সমাজে। ধর্ম মানুষকে এগিয়ে দেয় নি, ধর্ম থাকা সত্ত্বেও মানুষ এগিয়েছে; কেননা মানুষ কখনোই পুরোপুরি ধার্মিক নয়। মানুষ কখনো ধর্মের বিধান পুরোপুরি মানে নি। ধর্মের কোনো উপকারিতা দেখা যায় নি, কিন্তু অজস্র অপকারিতা সব সময়ই দেখা যায়।

প্রত্যেক ধর্মের রয়েছে দুটি দিক;—ধর্মগুলো নিজেদের দায়িত্ব হিশেবে ব্যাখ্যা করে বিশ্বসৃষ্টির রীতি, এবং তৈরি করে সামাজিক বিধান। ধর্মের বইগুলো বিজ্ঞানের বই নয়, ওগুলো খুবই অবৈজ্ঞানিক। এগুলোতে বিশ্বসৃষ্টির যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তা পুরোপুরি ভুল; ওই বর্ণনা বইগুলো রচনাকালের মানুষের বিভ্রান্ত কল্পনামাত্র। বিশেষ এক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠাই ধর্মপ্রবর্তকদের লক্ষ্য, তাই ধর্ম মূলত আদিম রাজনীতি। মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি বর্ণনা ধর্মের এক প্রিয় বিষয়; এ-এলাকায় ধর্মগুলো মানুষকে লোভের পর লোভ আর ভয়ের পর ভয় দেখায়। মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি সম্পর্কে ধর্মগুলো যা বলে, তা হাস্যকর, যাতে বিশ্বাস করতে পারে শুধু লোভী ও ভীত মানুষ। মানুষ সম্পর্কে খুবই নিম্ন ধারণা পোষণ করে ধর্মগুলো। ধর্মগুলো ধ'রে নিয়েছে যে মানুষ লোভী ও ভীত; তাই তাদের লোভ দেখাতে হবে, এবং রাখতে হবে সন্ত্রস্ত ক'রে। ধর্মগ্রন্থ পড়ার সময় ধার্মিক মানুষ বারবার লোভে পড়ে, আর ভয়ে কেঁপে ওঠে; তাই ধার্মিক মানুষের পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়, লোভ ও ভয়ের মধ্যে বাস ক'রে তারা হয়ে পড়ে বিকলনগ্রস্ত। ধার্মিকেরা খুবই অমানবিক; তারা নিজেদের ধর্ম ও ধর্মের বই ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ও ধর্মের বইকে মর্যাদা দেয় না। এক ধর্মের ধার্মিক অন্য ধর্মের পবিত্রগ্রন্থ ও গৃহকে অবলীলায় অপমানিত করতে পারে, যা নাস্তিকেরা কখনো করে না। যে-কোনো নির্বোধের পক্ষে ধার্মিক হওয়া সহজ, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ও মানবিক ব্যক্তিই হ'তে পারে নাস্তিক। নাস্তিক হত্যা আর ধ্বংস করে না; কিন্তু ধার্মিক সব সময় হত্যা ও ধ্বংসের জন্যে ব্যগ্র থাকে; তারা ইতিহাসের পাতাকে যুগে যুগে রক্তাক্ত করেছে। প্রত্যেক ধর্মে রয়েছে অসংখ্য সন্ত, যারা ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের হত্যাকারী। নাস্তিক চায় মানুষের চেতনাকে বদলে দিতে, মানুষকে বিকশিত করতে; আর ধার্মিক চায় মানুষের চেতনাকে নষ্ট করতে, মানুষকে রুদ্ধ করতে। ধার্মিকদের নৈতিকতাবোধ খুবই শোচনীয়।

বহু ধর্ম রয়েছে পৃথিবীতে। একটি সরল প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিধাতা যদি থাকেন, তিনি যদি একলাই স্রষ্টা হন, তবে তিনি কেনো এতো ধর্ম পাঠালেন? তিনি একটি ধর্ম পাঠালেই পারতেন, এবং আমরা পরম বিশ্বাসে সেটি পালন করতে পারতাম। তিনি তা করে নি কেনো? তবে কি তিনি একলা নন? ওই অলৌকিক জগতেও কি রয়েছেন বহু প্রতিদ্বন্দ্বী, যাঁরা মানুষের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যগ্র? তাঁদের কেউ হিন্দুর, কেউ ইহুদির, কেউ খ্রিস্টানের, কেই মুসলমানের, এবং কেউ ঙ-র, কেউ চ-র, কেউ ছ-জ-ঝর? যদি তিনি একলা, তাহলে এতো ধর্ম পাঠিয়ে কেনো তিনি বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে? শুধু বিভ্রান্ত

ক'রেই তিনি সুখ পাচ্ছেন না; তিনি মানুষের মধ্যে তৈরি করেছেন বিভাজন—কাউকে করেছেন ইহুদি, কাউকে খ্রিস্টান, কাউকে মুসলমান, কাউকে হিন্দু। কেনো এদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন শত্রুতা, এবং লিপ্ত করেছেন পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডে? আরো নানা প্রশ্ন জাগতে পারে। তিনি কেনো শুধু এক ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেন? তিনি কেনো একজনের কাছে বাণী পাঠান? তিনি কেনো শুধু প্রাচীন কালেই দেখা দিতেন? কেনো তিনি দেখা দিচ্ছেন না আধুনিক কালে? আধুনিক কাল নিয়ে তাঁর বা তাঁদের কোনো উদ্বেগ নেই? কেনো তিনি একদলকে গরু খেতে নিষেধ করেন, আরেক দলকে খেতে বলেন; কেনো তিনি একদলের জন্যে নিষিদ্ধ করেন মদ্য, এবং সিদ্ধ করেন আরেক দলের জন্যে? কেনো তিনি সর্বশক্তিমান হয়েও শক্তির প্রকাশ ঘটান না? তাঁর ক্রিয়াকলাপ কেনো এতো বিস্ময়কর, অস্বাভাবিক, এবং সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য?

এসব সরল প্রশ্নের উত্তর ধর্মের বইগুলোতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু পাওয়া যাবে যদি আমরা ধর্মের উদ্ভবের রীতি উদ্ঘাটন করি। ধর্মগুলো কোনো অলৌকিক জগত থেকে কেউ পাঠায় নি, তেমন কেউ নেই; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীই সৃষ্টি করেছে এগুলো। কোনো পরম সত্তা যদি থাকতেন, এবং তিনি যদি পৃথিবীতে ধর্মের প্রয়োজন বোধ করতেন (—সম্ভবত বোধ করতেন না, তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছতর স্তব তাঁর ভালো লাগতো না), তাহলে একটি ধর্মই পাঠাতেন তিনি। ধর্মগুলো বাতিল ক'রে দেয় একটি অন্যটিকে; একই সময়ে সবগুলো ধর্ম সত্য হ'তে পারে না। কোনো সত্যের থাকতে পারে না একাধিক ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব; কোনো প্রপঞ্চের একাধিক তত্ত্ব পেলে বুঝতে হবে এগুলোর একটি ঠিক হ'তে পারে, বা সবগুলোই ভুল। বিভিন্ন প্রতিযোগী তত্ত্বের মধ্যে মাত্র একটিই ঠিক হ'তে পারে, বা ভুল হ'তে পারে সবগুলোই। ধর্মগুলো বিশ্বসৃষ্টি, মানবসমাজ, মানুষের পরিণতি সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রতিযোগী তত্ত্ব;—পরস্পরবিরোধী, ও ভুল। এজন্যেই বহু সরল প্রশ্নের উত্তর এগুলো দিতে পারে না; সাধারণত নিষেধ করে প্রশ্ন করতে। এগুলো কথা বলে এমনভাবে, যা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। যা প্রমাণ ও অপ্রমাণ করা যায় না, তা অবৈজ্ঞানিক।

ধর্মগুলো একদিনে দেখা দেয় নি; হঠাৎ কোনো ঈশ্বর কোনো ধর্ম পাঠান নি। মানুষ আদিম কাল থেকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে বিশ্বকে—বিশ্ব ও নিজের উদ্ভবকে, চারপাশের প্রপঞ্চরাশিকে; কিন্তু তখন তার সত্য উদ্ঘাটনের শক্তির বিকাশ ঘটে নি; তাই সে সাহায্য নিয়েছে কল্পনার। সে অবিরাম ভুল কল্পনা করেছে, ভুল কল্পনার পর ভুল কল্পনাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করেছে, এবং বিকাশ ঘটিয়েছে বিচিত্র রকম ধর্মের। ধর্ম হচ্ছে আদিম ও ভুলবিজ্ঞান। আজ আমরা বজ্র আর বিদ্যুৎ ব্যাখ্যা করতে পারি; বিজ্ঞান বজ্রবিদ্যুতের সত্য বের করেছে; কিন্তু আদিম মানুষের পক্ষে এ-সত্য বের করা সম্ভব হয় নি। তারা কল্পনা করেছে

দেবতা, আর দেবতাদের অস্ত্র। দেবতা, দেবতার অস্ত্র ইত্যাদি হচ্ছে আদিম মানুষের কল্পিত ব্যাখ্যা, যার মূলে কোনো সত্য নেই; কিন্তু এসব ভুলই গৃহীত হয়েছে ধর্মরূপে। আদিম মানুষ চারপাশের প্রপঞ্চ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তি তৈরি করেছিলো, বর্ণনা করেছিলো দেবতা বা অতিপ্রাকৃত সত্তার উপাখ্যান। আদিম মানুষের কল্পিত উপাখ্যানগুলোকে বলা হয় পুরাণ, এবং পুরাণ থেকেই হয়েছে ধর্মের উৎপত্তি। পুরাণ আদিম চিন্তাভাবনাকল্পনার ফল। বহু পৌরাণিক উপাখ্যান অত্যন্ত উপভোগ্য, এমনকি তাৎপর্যপূর্ণ; কিন্তু ওগুলো উপাখ্যান। পুরাণের এক উদ্দেশ্য ছিলো মানুষের সাথে মহাজগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা; পুরাণরচয়িতারা তা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে অনেকের কাছে এ-পুরাণই হয়ে ওঠে ধর্ম। আমাদের চারপাশের বড়ো ঘটনাগুলোকেও আমরা মহাজগতের সাথে জড়িত করি না; কিন্তু আদিম মানুষের স্বভাবই ছিলো জীবনে তুচ্ছতম ব্যাপারটিকেও মহাজগতের সাথে জড়িয়ে দেয়া। দাঁতের পোকা তাড়াতেও তাঁরা এমন সব মন্ত্র আবৃত্তি শুরু করতো, যেনো ওই পোকার সাথে মহাজাগতিক বিশাল সব ব্যাপারের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পুরাণ ভ'রে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেবতার জন্মের বিবরণ, তাদের শক্তি ও স্বভাবের কথা, বিশ্বসৃষ্টির উপাখ্যান। বিভিন্ন পুজো আর অর্চনার কারণও বর্ণনা করা হয় পুরাণে।

পুরাণের গল্পগুলোতে পাওয়া যায় আদিম যুক্তি-অবিকশিত মানুষের মনের পরিচয়। পুরাণ যুক্তিপরায়ণ মনের সৃষ্টি নয়; সহজেই বোঝা যায় যে পুরাণগুলো এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে। আমরা পৌরাণিক উপাখ্যানগুলোকে গল্প ব'লে মনে করি, সত্য মনে করি না; এবং জেসাসের, যদি সত্যিই জেসাস ব'লে কেউ জন্ম নিয়ে থাকেন, জন্মের বহু আগেই অনেকের কাছে এগুলো গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তাই অনেক ধর্মপ্রণেতা, পুরোহিত, এবং কবি এগুলোকে গ্রহণযোগ্য রূপ দিতে চেয়েছেন। থিআগেনেস (৫২০ খ্রিপূ) অশোভন মনে করেছেন গ্রিক পুরাণের দেবতাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য কার্যকলাপ; তাঁর মতে দেবতারা এমন অশোভন কাজ করতে পারেন না। ইন্দ্র আর জিউস যতো নারী ধর্ষণ করেছে, কোনো পুরুষ ততো করার স্বপ্নও দেখে নি। তিনি দেবতাদের যুদ্ধবিগ্রহকে ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন মৌল উপাদানের, আগুন-বাতাস-জলের, সংগ্রামের রূপকরূপে। বাইবেল বলেছে বিধাতা নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আসলে মানুষ নিজের আদলে সৃষ্টি করেছে দেবতাদের। জেনোফানেস পছন্দ করেন নি মানুষ আকৃতির দেবতাদের। তাঁর মতে :

> ঈশ্বর একজনই, যিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা আর মানুষদের মধ্যে; অবয়ব আর চিন্তা কোনো কিছুতেই তিনি মানুষের মতো নন, তবু মানুষ কল্পনা করে যে দেবতারা মানুষের মতোই জন্মেছে, এবং তাদের অবয়ব আর কণ্ঠস্বর মানুষেরই মতো। যদি বৃষ, সিংহ, আর অশ্বরা মূর্তি বানাতে পারতো, তবে তারাও নিজেদের অবয়বের মতোই বানাতো দেবতাদের মূর্তি।

প্রাচীন মিশরিরাও বিস্মিত হতো যে তাদের অধিকাংশ দেবতাই পশু। তারা এটা মেনে নিতে পারতো না; এবং ব্যাখ্যা করতো যে দেবতারা পশু নয়, শুধু বিপদের সময়েই দেবতারা আশ্রয় নিতো নানা পশুর শরীরে।

ম্যাক্স ম্যুলার পুরাণরচয়িতাদের মনে করেছিলেন উন্মাদ। পুরাণে আদিম অযৌক্তিক উপাদানের প্রাচুর্য দেখে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মানবজাতির জীবনে এসেছিলো এক অস্থায়ী পাগলামোর কাল; তারা ভুগেছিলো পাগলামো রোগে। একই পাগলামোতে কি ভুগেছিলো ভারত, গ্রিস, মিশর, ব্যাবিলন, প্যালেস্টাইন, আর আইসল্যান্ডের আদিম মানুষ? পুরাণকে কি মনে করবো পাগলামো? পুরাণের অযৌক্তিকতা পাগলামো নয়; তারা পাগল ছিলো না, ছিলো অবিকশিত। পুরাণ অবিকশিত মনের মানুষের সৃষ্টি। তাদের মনের বিকাশ ঘটে নি, যেমন আজো অধিকাংশের মন অবিকশিত রয়ে গেছে। তাদের অভিজ্ঞতা ছিলো কম, এবং ছিলো না বিজ্ঞানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ, ব্যাখ্যার মননশীলতা, যেমন আজো নেই অধিকাংশের। তারা বিভিন্ন প্রপঞ্চ যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করতে না পেরে ব্যাখ্যা করেছিলো আদিম কল্পনার সাহায্যে; সত্য আবিষ্কারের বদলে তারা বানিয়েছিলো কল্পোপাখ্যান। তারা ছিলো মানসিক শৈশবে, যেমন আজো আছে অধিকাংশ। তারা মনে করেছিলো প্রকৃতির শক্তিগুলো মানুষের মতোই; সেগুলো মানুষের মতোই কথা বলতে, কাজ ও চিন্তা করতে পারে। এরকম বিশ্বাসকে বলা হয় *অ্যানিমিজম* বা *সর্বাত্মাবাদ*, যা বিশ্বাস করে প্রত্যেক বস্তুর আছে আত্মা। তারা মনে করেছিলো বাতাস, জল, আর গাছ কথা বলে; তারা বিশ্বাস করেছিলো যে আকাশ ভ'রে রয়েছে দেবতা। তারা যা দেখেছিলো, তা ব্যাখ্যার জন্যে যুক্তির সাহায্য নেয় নি, সাহায্য নিয়েছিলো কল্পনার। সব দেশের পুরাণের উপাখ্যানেই মেলে মানুষের বর্বরতার কালের পরিচয়। মানুষের প্রথম উদ্ভাবিত ধর্ম সর্বাত্মাবাদ। তারা বিশ্বাস করতো সব কিছুরই আত্মা আছে, যদিও আজ আত্মা ব'লে কিছু আমরা মানি না। সর্বাত্মাবাদী পুরাণে পাওয়া যায় আত্মা সম্পর্কে আদিম ভাবনার স্পষ্ট পরিচয়। পাওয়া যায় অনেক গল্প, যাতে কেউ ভূতপ্রেতের দেশে যায়, বা যায় এমন দেশে, যেখানে পশুপাখি কথা বলে, যেখানে মানুষকে রূপান্তরিত করা হয় পশু বা গাছে। সর্বাত্মাবাদী বিশ্বাসে আত্মা আর শরীরের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য, যা টিকে আছে আজো সমস্ত ধর্মে। আজ বিজ্ঞান আত্মা মানে না, কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসে আদিম বিশ্বাস এখনো টিকে আছে।

সর্বাত্মাবাদের সাথে জড়িয়ে আছে আদিম মানুষের আরেকটি বিশ্বাস, যাকে বলা হয় *ফেটিশিজম* বা *যাদুবাদ* বা *ইন্দ্রজালবাদ*। আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো যে অনেক বস্তুর রয়েছে যাদুশক্তি। আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অর্থাৎ সব মহাদেশের বর্বররাই বিশ্বাস করতো বিভিন্ন বস্তুর যাদুশক্তিতে; তারা বিশ্বাস করতো কোনো কোনো বস্তুতে বাস করে কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তি। যাতে অতীন্দ্রিয়

শক্তি বাস করে, সেটি যাদুবস্তু; যেমন কোনো অস্থি, বা পাথর, বা একগুচ্ছ পালক, বা ঝিনুকের মালা, বা অন্য কিছু। তারা বিশ্বাস করতো কোনো কোনো ব্যক্তি ওই বস্তুতে ডেকে আনতে পারে ওই বস্তুটির সাথে জড়িত অলৌকিক সত্তাটিকে, জিন বা দৈত্যকে, বা ওই সত্তাটি সব সময়ই থাকে ওই বস্তুটিতে। যাদুবাদ আজো টিকে আছে পৃথিবী জুড়ে। যাদুবাদের যাদুবস্তুতে যে-সত্তাটি বাস করে, সেটি হচ্ছে প্রেত। প্রেত দেবতা নয়, প্রেত আর দেবতার মধ্যে রয়েছে পার্থক্য; তবে প্রেত এক সময় হয়ে উঠতে পারে দেবতা। প্রেত আর দেবতার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দেবতার থাকে ভক্ত, তার পুজো করা হয়; আর যাদুবাদের প্রেত থাকে কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের অধীনে; যেমন আরব্যরজনীর প্রেত। সেটি দেবতা নয়, ভৃত্য; প্রদীপটি, অর্থাৎ যাদুবস্তুটি যার অধিকারে থাকে, সে হয় তার গোলাম। তবে অনেক সময় যাদুবাদের প্রেত হয়ে উঠতে পারে দেবতা। যাদুবাদের পর মানুষ পৌঁছে ধর্মের আরেক স্তরে, যার নাম *টোটেমিজম* বা *উৎসবস্তুবাদ*। টোটেম হচ্ছে কোনো পশু, বা উদ্ভিদ, বা বস্তু, যা কোনো সামাজিক শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত। টোটেমবাদে বিশেষ বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর নাম হয়ে থাকে সম্পর্কিত টোটেমের নাম অনুসারে; তারা নিজগোত্রের প্রতীক হিশেবে ব্যবহার করে টোটেমটিকে। ওই গোত্রের লোকেরা মনে করে যে তারা ওই টোটেম প্রাণী বা উদ্ভিদ বা বস্তুটি থেকে জন্মেছে, এবং টোটেমটি তাদের জন্যে পবিত্র। পুরাণে পাওয়া যায় টোটেমের প্রচুর উদাহরণ।

এর পর মানুষ সৃষ্টি করে দেবতা; দেবতা এবং দেবতা এবং দেবতা; এবং দেখা দেয় *বহুদেবতাবাদ* বা *বহুঈশ্বরবাদ* বা *বহুভগবানবাদ*। বহুদেবতাবাদে দেবতারা পরিপূর্ণ বিকশিত, ও তারা শক্তিমান। দেবতারা শক্তিমান হ'লেও মানুষই তাদের স্রষ্টা, তাই দেবতাদের তারা বিন্যস্ত করে নিজেদের গোত্রের স্তরক্রম অনুসারে। বহুদেবতাদের বিকাশ ঘটে নানা পথে। আদিম মানুষ দেবতার পর দেবতা তৈরি করে, দেবতাদের দেয় বিভিন্ন ভূমিকা বা দায়িত্ব, এবং তাদের পুজো করে; অনেক সময় একদল দেবতার কিছু কিছু শক্তি কমিয়ে ওই শক্তি অন্য দেবতার ওপর অর্পণ ক'রে তৈরি করে নতুন দেবতা, বা পুরোনো দেবতাদের ঔরসে জন্ম দেয়া হয় নতুন দেবতাদের। কখনো কোনো দেবতা হয়ে ওঠে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোনো দেবতা হারিয়ে ফেলে তার গৌরব; এতে ওই দেবতা কোনো ভূমিকা পালন করে না, ভূমিকা পালন করে মানুষ। মনে করা যাক কোনো নগরে বা ধর্মকেন্দ্রে পূজিত হতো কয়েকটি দেবতা; কিন্তু তাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো তা ছিলো অনির্ণীত। দেবতারা নিজেরা যুদ্ধ ক'রে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতো না; পুরোহিতেরাই দেবতাদের নানাভাবে বিন্যস্ত ক'রে সৃষ্টি করতো দেবমণ্ডলী। দেবতাদের ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করতো ভক্তদের ওপর। ভক্তরা তাদের দেবতাদের ভূষিত করতো নানা গুণে, অনেক সময় ভুল বুঝে বদল ঘটাতো দেবতাদের নামের। তারপর ছিলো ভক্ত রাজাদের উত্থানপতন, ভক্তদের

দেশত্যাগ, জয় আর পরাজয়, এবং নতুন জাতির সংস্পর্শ। কোনো ভূভাগের রাজা পুজো করতো যে-দেবতাদের, তারা হতো প্রধান দেবতা; অন্য দেবতাদের ভক্ত যখন তাকে পর্যুদস্ত ক'রে রাজা হতো, তখন পর্যুদস্ত হতো আগের রাজকীয় দেবতারা, শক্তিমান আর প্রধান হয়ে দেখা দিতো নতুন রাজার দেবতারা। দেবতাদের ভাগ্য নির্ভর করতো ভক্তদের ভাগ্যের ওপর। দেবতারা ভক্তদের ভাগ্য কখনো নির্ধারণ করে নি, চিরকাল ভক্তরাই নির্ধারণ করেছে দেবতাদের ভাগ্য। বিধাতারা কখনো নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে নি, ভক্তরাই বিস্তার করেছে তাদের বিধাতাদের সাম্রাজ্য।

মানুষ উৎপাদন করেছিলো অজস্র দেবতা। এক সময় তারা আকাশমণ্ডল ভ'রে ফেলেছিলো দেবতায়; এবং তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো নানা বিভাগের দায়িত্ব। কাউকে দেয়া হয়েছিলো অগ্নিবিভাগের দায়িত্ব, সে অগ্নিদেবতা; কাউকে জলবিভাগের দায়িত্ব, সে জলদেবতা; এভাবে দেখা দিয়েছিলো বায়ুদেবতা, বজ্রদেবতা, মাটির দেবতা, মদের দেবতা, শস্যের দেবতা, এবং শিল্পকলা, শিক্ষা, ধন ও আরো অসংখ্য বিভাগের দেবতা। *ঋগ্বেদ*-এর ঋষিরা তৈরি করেছিলো ৩৩টি দেবতা;—১১টি পৃথিবীতে, ১১টি অন্তরীক্ষে, ১১টি স্বর্গে; তারপর বিভিন্ন বস্তুর অধিপতি হিশেবে কল্পনা করেছিলো ৩৩ কোটি দেবতা। তারা এসব দেবতা সৃষ্টি করেছিলো দেবতার জন্যে দেবতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তারা চারপাশের সব কিছুকে নিজেদের কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করতো, এবং বিশ্বাস করতো ওই সব কিছুরই দেবতা রয়েছে, তাই দেবতাদের পুজো করলে দেবতারা তাদের জীবনকে সম্পদে ভ'রে দেবে। দেবতাদের সাথে তাদের থাকতো একটি চুক্তি, চুক্তিটি হচ্ছে দেবতারা তাদের অন্ন দেবে, বিনিময়ে তারা দেবে দেবতাদের অর্ঘ্য। তাদের কয়েকটি দেবতার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। আজ আমরা জানি সূর্যই পার্থিব সব কিছুর উৎস; আদিম মানুষেরাও সূর্যকেই মনে করতো জীবনের উৎস ব'লে। তবে তারা আজকের মতো জানতো না, তারা জানতো তাদের মতো ক'রে। সব দেশে পুরাণেই দেবমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল ক'রে আছে। সর্বাত্মাবাদীরা মনে করতো মানুষের মতোই সূর্যের আছে প্রাণ ও ইচ্ছাশক্তি, তাই সে চলতে পারে। বৈদিকরা সূর্যশ্রেণীতে সৃষ্টি করেছিলো বহু দেবতা : আদিত্য, মিত্র, বরুণ, পূষা, ভগ, অশ্বিনীকুমার, সবিতা প্রভৃতি। গ্রিকরা দুটি সূর্যদেবতা সৃষ্টি করেছিলো, একটি অ্যাপোলো, আরেকটি সূর্য নিজে, যার নাম হেলিওস। অ্যাপোলো তিমিরবিনাশী দেবতা, যে সোনালি তীরের আঘাতে হত্যা করে রাত্রির সাপ পাইথনকে, এবং তার এক কাজ হচ্ছে সভ্যতার বিকাশ ঘটানো। পৃথিবী জুড়েই পাওয়া যায় সূর্যদেবতা—ইন্দ্র, ক্যাডমাস, হোরাস প্রভৃতি, এবং তাদের উদ্ভবের উপাখ্যানের মধ্যেও মিল রয়েছে। সূর্যদেবতার মতো বজ্রদেবতাও পাওয়া যায় পৃথিবী ভ'রে।

আদিম মানুষ সৃষ্টি করেছিলো অজস্র দেবতা, যাদের এখন আর আমরা, হিন্দুরা ছাড়া, দেবতা মনে করি না; এবং বিশ্বাস করি না দেবতায়।

দেবতাদের কাল শেষ হয়ে আসতে থাকে; বহুদেবতাবাদের পর, তিন-চার হাজার বছর আগে, মানুষ এগোয় *একদেবতাবাদ* বা *একেশ্বরবাদের* দিকে; তবে মানুষ কখনোই সম্পূর্ণরূপে একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠে নি। একদেবতাবাদীদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে, প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্টভাবে, বহুদেবতার মুখ দেখা যায়। ঈশ্বর বা বিধাতা বললে দেবতার থেকে মহান কিছু বোঝায় ব'লে অনেকের মনে হয়; কিন্তু ঈশ্বর বা বিধাতাও দেবতাই। এতে যা ঘটে তা হচ্ছে বহুদেবতাকে সরিয়ে একটি দেবতার প্রতিষ্ঠা। বহুদেবতাবাদ থেকে নানা প্রক্রিয়ায় দেখা দেয় একদেবতাবাদ। মানুষই সৃষ্টি করেছিলো বহুদেবতা, আবার মানুষই সৃষ্টি করে একদেবতা; এতে দেবতাদের কোনো ভূমিকা নেই। কখনো বহুদেবতার মধ্যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে একটি বিশেষ দেবতা, কেননা, সেটি বিজয়ী জাতির দেবতা; সে নিজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নি, তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে বিজয়ী জাতি; কখনো পুরোহিতেরা বহুদেবতা পছন্দ করে নি, অন্য সব দেবতাকে বাদ দিয়ে প্রধান ক'রে তুলেছে একটিকে; কখনো ভক্তরা ছোটো দেবতাদের শক্তি কমিয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ক'রে তুলেছে বিশেষ একটি দেবতাকে; কখনো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেউ এসে একাধিক দেবতার মধ্য থেকে একটিকে ঈশ্বর বা বিধাতা ব'লে ঘোষণা ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার প্রেরিতপুরুষরূপে; কখনো দেশের রাজবংশটি প্রধান ক'রে তুলেছে একটি দেবতাকে। এতে দেবতাটির কোনো কৃতিত্ব নেই; সব কৃতিত্ব মানুষের। একদেবতাবাদ ও বহুদেবতাবাদের মধ্যে কোনোটি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়, যদিও এখন একদেবতাবাদকেই উৎকৃষ্ট ব'লে প্রচার করা হয়। ভাষার খেলাও কাজ করে এখানে। একদেবতাবাদকে বলা হয় একেশ্বরবাদ, তবে দেবতা ও ঈশ্বর মূলত একই জিনিশ। ইংরেজিতে শুরুতে বড়ো অক্ষর দিয়ে লেখা হয় God; দেবতাদের বেলা লেখা হয় ছোটো অক্ষরে god; এটা ভাষার খেলা। এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যা দিয়ে একটিকে উৎকৃষ্ট ও অন্যটিকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করা যায়। দুটিই সমান আদিম কল্পনা। তবে বহুদেবতাবাদ অনেকটা নিরীহ, ওই দেবতারা সারাক্ষণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার ও শাস্তি দেয়ার জন্যে উত্তেজিত থাকে না; কিন্তু একদেবতাবাদের দেবতা বা বিধাতা প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণবাদী, হিংস্র, ও বিদ্বেষপরায়ণ। একদেবতাবাদের দেবতার থাকে স্বৈরাচারী প্রবণতা; সে নিজের বন্ধ্যা নিঃসঙ্গতায় বিরাজ করে মহাজাগতিক একনায়করূপে। নিঃসঙ্গ একদেবতা ভালোবাসা চায় না ভক্তদের, সে চায় তার ভয়ে ভক্তরা কাঁপবে থরথর ক'রে, ভক্তরা হবে তার দাস।

আদিম মানুষ সৃষ্টি করেছিলো অজস্র পুরাণ। তারা যে-প্রপঞ্চেরই মুখোমুখি হয়েছে, তার সম্পর্কেই উপাখ্যান তৈরি করেছে—সত্য বের করতে পারে নি; এবং এমন অনেক কিছু সম্পর্কে উপাখ্যান তৈরি করেছে, যার মুখোমুখি তারা কখনো

হয় নি; তাই তার সত্য আবিষ্কারের কথাই ওঠে না। তারা তৈরি করেছে বিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টির পুরাণ, বন্যার পুরাণ, স্বর্গের পুরাণ, নরকের পুরাণ, অগ্নির পুরাণ ও আরো অজস্র পুরাণ। সব পুরাণেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব; এবং এখনকার প্রচলিত ধর্মগুলো বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্ব ধার করেছে বিভিন্ন পুরাণ থেকে। পুরাণের বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব যেহেতু ভুল বা অবৈজ্ঞানিক, তাই পৃথিবীর ধর্মগুলোর বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বও ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক। আদিম মানুষের কাছে জল ছিলো এক মহাব্যাপার; তাই সৃষ্টিপুরাণগুলোতে সাধারণত পাওয়া যায় জলের এক মহাজগত, যার ভেতরে উদ্ভূত হয় স্বয়ম্ভূ স্রষ্টা, এবং কোনো শব্দ উচ্চারণ ক'রে, বা ইচ্ছাশক্তিতে, বা শারীরিক শ্রমে সৃষ্টি করে জগত বা পৃথিবী। সাধারণত সে অতল জলের পাতাল থেকে উদ্ধার করে পৃথিবীকে। ব্যাবিলনিরা মনে করতো বেল বা মেরোডাক স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে তিয়াওয়াথের শরীরের দু-টুকরো দিয়ে; পারসি জুরথুস্ত্রিরা বিশ্বাস করতো আহুর মাজদা বা ওরমুজদ হচ্ছে স্রষ্টা; গ্রিকরা বিশ্বাস করতো ইউরেনাস আর গ্যাআর মিলনে জন্মেছে সব কিছু; হিন্দুরা মনে করে বরাহ অবতাররূপে ব্রহ্মা জলের অতল থেকে দাঁতে গেঁথে উদ্ধার করে পৃথিবীকে, এবং শুরু করে সৃষ্টির কাজ; জাপানিরা মনে করে ইজানাগি আর ইজানামির মিলনে সৃষ্টি হয়েছে জগত; পেরুর ইনকাসরা বিশ্বাস করতো আতাগুজু সৃষ্টি করেছে সব কিছু। মানুষ সৃষ্টির পুরাণে সাধারণত পাওয়া যায় যে এক অলৌকিক সত্তা মানুষ সৃষ্টি করেছে কাদা বা ধুলো থেকে। সে অনেক সময় মানুষকে ভিজিয়ে নেয় নিজের রক্তে বা ঘামে, এবং তার ভেতর সঞ্চার করে প্রাণ বা নিশ্বাস। গ্রিকরা বিশ্বাস করতো প্রমেথিউস সৃষ্টি করেছে নরনারী; হিন্দুরা মনে করে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি সৃষ্টি করেছে মানুষ; ব্রাজিলের আদিবাসীরা মনে করে অধোলোক থেকে মানুষ এসেছে; মধ্য আমেরিকার কিচেরা মনে করে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে হলদে আর শাদা ভুট্টা থেকে। এর সবগুলোই সম্পূর্ণ ভুল।

প্রাচীন ভারতিরা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে নিরবধি বুনেছে কল্পনার জাল। *ঋগ্বেদ*-এর ঋষিরা কল্পনা করতে গিয়ে বিহ্বল হয়েছেন, দেখেছেন মহাশূন্যতা। তাঁরা বলেছেন, শুরুতে অসত্তাও ছিলো না, সত্তাও ছিলো না, ছিলো শুধু আঁধারে আবৃত জলরাশি। তারপর সেখানে জাগে কর্ম বা বাসনা। *ঋগ্বেদ* বলেছে:

> অস্তি ছিলো না, নাস্তিও ছিলো না, বায়ু ছিলো না, দূরে আকাশও ছিলো না; কে ছিলো সব কিছু আবৃত ক'রে? কার ওপর নির্ভর ক'রে ছিলো সব কিছু? অতল জলের ভেতরে? তখন মৃত্যু ছিলো না, অমৃত্যুও ছিলো না, ছিলো না রাত্রি ও দিনের বদল; শুধু একজনই নিশ্বাস নিচ্ছিলো ধীরে, তার বাইরে ছিলো না আর কিছু। কে জানে কখন উদ্ভূত হয়েছিলো এই মহাসৃষ্টি? তখন কোনো দেবতার জন্ম হয় নি, তাই কে প্রকাশ করতে পারে এ-সত্য? কখন জন্মেছে এ-জগত, আর তা স্বর্গীয় না অন্য কোনো হাতের রচিত, তা বলতে পারে শুধু স্বর্গে বিরাজমান এর প্রভু, যদি সম্ভব হয় তার পক্ষে।

ঋগ্বেদ-এর ঋষির অনিশ্চয়তাবোধে তৃপ্ত হয় নি যাযাবর আর্যরা, তারা আরো নিশ্চিত হ'তে চেয়েছে, এবং *ঋগ্বেদ*-এর *পুরুষসক্ত*-এ বলা হয়েছে :

> পুরুষের রয়েছে সহস্র মস্তক, সহস্র চোখ, সহস্র পদ। পৃথিবীর সব দিক জুড়ে দশ আঙুলে সমান ভূমিতে তিনি বিরাজ করেন। পুরুষ নিজেই সমগ্র বিশ্ব, যা ছিলো, এবং যা হবে।

তারা আরো বলেছে যে দেবতারা খণ্ডিত করে পুরুষকে; তার মুখ থেকে জন্মে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে রাজন্য, উরু থেকে বৈশ্য, পা থেকে শূদ্র; তার মন থেকে জন্মে প্রভাত, চোখ থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র আর অগ্নি ইত্যাদি, অর্থাৎ রাশিরাশি বাজে কথা। *সপ্তপথ ব্রাহ্মণ*-এ পাওয়া যায় যে 'ভূ' উচ্চারণ ক'রে প্রজাপতি সৃষ্টি করে পৃথিবী, 'ভূবহ্' উচ্চারণ ক'রে বায়ু, 'স্বহ্' উচ্চারণ ক'রে আকাশ; 'ভূ' ব'লে প্রজাপতি সৃষ্টি করে ব্রাহ্মণ, 'ভূবহ্' ব'লে ক্ষত্র ইত্যাদি। *তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ*-এ আছে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছে বিশ্ব, তারপর কী কী সৃষ্টি করেছে, তারও বর্ণনা আছে। হিন্দুদের পুরাণগুলোতে পাওয়া যায় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ। যেমন, *বিষ্ণুপুরাণ*-এর মতে ব্রহ্মা আদিতে ছিলো পুরুষ বা চৈতন্য এবং কালরূপে, তারপর তাতে যুক্ত হয় আরো দুটি রূপ, এবং ব্রহ্মার চারটি সত্তা—প্রধান উপাদান, পুরুষ, ব্যক্ত বা দৃশ্যমান বস্তু, ও কালই বিশ্বসৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংসের কারণ। এর সবই হচ্ছে কল্পনার দীর্ঘ জালবিস্তার।

ব্যাবিলনের সৃষ্টিতত্ত্বে আদিম দেবতা দুটি—আপসু ও তিয়াওয়াথ। তাদের পর সৃষ্টি হয় কয়েকটি নতুন দেবতা—আনু, এন-লিল, ও ইআ। তাদের আচরণ পছন্দ হয় না আপসু এবং তিয়াওয়াথের, তারা শাস্তি দিতে চায় নতুন দেবতাদের; কিন্তু পরাভূত হয় নতুন দেবতাদের কাছে। তিয়াওয়াথ দানব সৃষ্টি ক'রে নতুন দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়; কিন্তু নিহত হয় মেরোডাকের সাথে যুদ্ধে। তাকে দু-ভাগে কাটা হয়; তার দেহের একভাগ দিয়ে মেরোডাক সৃষ্টি করে আকাশ। মেরোডাক ভাগ করে ওপর আর নিচের জল, বাসস্থান তৈরি করে দেবতাদের; সৃষ্টি করে চাঁদতারাসূর্য, নির্দেশ করে, কক্ষপথ। এক সময় তার শিরশ্ছেদ করা হয়, তার অস্থি আর রক্তে সৃষ্টি হয় মানুষ। এ হচ্ছে চমৎকার আদিম কল্পনা।

পুরোনো বাইবেল-এ আছে হিব্রুসৃষ্টিতত্ত্ব। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম বিশ্বাস করে এ-সৃষ্টিতত্ত্বে; অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মানে এবং বিভ্রান্ত হয় এটি দিয়ে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব মৌলিক নয়, এর অনেকখানি ধার করা হয়েছে ব্যাবিলনি সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে; এবং এর নানা মিল রয়েছে হিন্দুসৃষ্টিতত্ত্বের সাথেও। *আদিপুস্তক*-এর 'জগত-সৃষ্টির বিবরণ'-এ বলা হয়েছে : 'পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।... পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইভাবে

বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন; তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বরের বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন।' বাইবেলের ঈশ্বর আদিম জলরাশিকে মঞ্চের সাহায্যে দু-ভাগ করে, যার ওপর স্থাপন করে গগনমণ্ডল। ব্যাবিলনি সৃষ্টিতত্ত্বের তিয়াওয়াথের লাশ দু-ভাগ করার সাথে মিল আছে এর। বাইবেলে আছে, 'পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।' ব্যাবিলনি সৃষ্টিতত্ত্বে নেই এ-আলোবিকাশের কথা। তবে ব্যাবিলনি ঈশ্বর মেরোডাক নিজেই আলোর দেবতা।

ইরানি বা জুরথুস্ত্রি সৃষ্টিতত্ত্বে আহুর মাজ্‌দা বা ওরমুজ্‌দ্‌ স্রষ্টা ও শুভশক্তি। সে সৃষ্টি করেছে সব কিছু। সে অবশ্য বিশ্বের জন্যে বেশি দিন আয়ু ধার্য করে নি, করেছে বারো হাজার বছর। এটা আজকাল হাস্যকর মনে হয়, কেনোনা আজ আমরা অনন্ত মহাকালের ধারণা করতে পারি; আদিম মানুষের কোনো অসীম অনন্ততার বোধ ছিলো না; তখন বারো হাজার বছরই ছিলো মহাকাল, আর হয়তো পাঁচশো মাইলই ছিলো অনন্ত অসীম। ইরানি সৃষ্টিতত্ত্বে ছিলো একটি শয়তানও, যার নাম আহ্‌রিমান। আহ্‌রিমান আগে ওরমুজ্‌দের কথা জানতো না, একদিন ওরমুজ্‌দের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি দেখে সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তিন হাজার বছরে ওরমুজ্‌দ সৃষ্টি করে বিশ্ব, সূর্যচন্দ্রনক্ষত্র, উদ্ভিদ, প্রাণী, ও মানুষ। তাবে আহ্‌রিমান ওরমুজ্‌দের প্রতিটি শুভ সৃষ্টির বিরুদ্ধে অশুভ সৃষ্টির অভিযান চালিয়ে যেতে থাকে; সে হয় অশুভর ঈশ্বর। তিন হাজার বছর ধ'রে চলে শুভ-অশুভর যুদ্ধ; তবে জুরথুস্ত্রের জন্মের সাথে জয়ী হয় শুভশক্তি। ইরানি সৃষ্টিতত্ত্বে শুভ-অশুভ বিরোধ খুব বড়ো ব্যাপার, যা নেই হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বে; কিন্তু প্রবলভাবে রয়েছে হিব্রু আর আরব সৃষ্টিতত্ত্বে। তাদের গোপন চিন্তায় ঈশ্বর একটি নয়, দুটি; একটি শুভর, আরেকটি অশুভর।

পুরাণের একটি প্রধান কল্পনা হচ্ছে স্বর্গ ও নরক : মৃত্যুর পর পুণ্যবানদের জন্যে পুরস্কার ও পাপীদের জন্যে শাস্তির এলাকা। মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা চিরসুখে বাস করবে, জীবনে পুজো করেছে যে-দেবতাদের পাবে তাদের সঙ্গ, এবং পাপীরা উৎপীড়িত হবে, এ-ধারণা কিছুটা অগ্রসর প্রায়-সব পুরাণেই পাওয়া যায়। মিশরি, ভারতি, ব্যাবিলনি, ও হিব্রু পুরাণে স্বর্গ আর নরক দখল ক'রে আছে বেশ বড়ো স্থান। কিন্তু গ্রিক, রোমীয়, স্কেন্ডিনেভীয় পুরাণে স্বর্গনরক নেই, আছে শুধু মৃতদের জন্যে এক বিশেষ স্থান, অন্যলোক—*হেডিস*। বৌদ্ধদেরও কোনো স্বর্গনরক নেই। কোনো একদল মানুষ স্বর্গনরক কল্পনা করেছে, আরেকদল করে নি? যারা স্বর্গনরক কল্পনা করেছে, তাদের নৈতিকতাবোধ কি উন্নত তাদের থেকে, যারা এমন কল্পনা করে নি? ধর্মীয় প্রচার আজকাল এতো ব্যাপক, এবং স্বর্গনরক এতো বেশি পরিচিত যে অধিকাংশ মানুষই মনে করবে স্বর্গনরক যারা কল্পনা করেছে, তারা উন্নত নৈতিকতাবোধসম্পন্ন; আর যারা স্বর্গনরক কল্পনা করে নি, তারা

নৈতিকতাবোধহীন। গভীরভাবে বিবেচনা করলে বুঝতে পারি স্বর্গনরকের কল্পনাকারীরা স্থূল, নিম্ন নৈতিকতাবোধসম্পন্ন; তারা উঠতে পারে নি পার্থিব কামনাবাসনা, লালসাভীতির ওপরে, পারে নি মৃত্যুর মতো পরম নির্মম সত্যকে মেনে নিতে; তাই তৈরি করেছে মিথ্যে স্বর্গনরক। যারা স্বর্গনরকের কথা ভাবে নি, ভেবেছে শুধু অনিবার্য পরিণাম মৃত্যুর কথা, মনকে মিথ্যেয় ভোলায় নি, মেনে নিয়েছে সত্যকে, তাদের নৈতিক মান অনেক উন্নত। স্বর্গনরক সম্পূর্ণ বাজে কথা। রাসেল বলেছেন :

> আমার মনে হয় ক্রাইস্টের নৈতিক চরিত্রে রয়েছে একটি বড়ো ত্রুটি; আর তা হচ্ছে যে তিনি বিশ্বাস করতেন নরকে। আমি মনে করি না যে গভীরভাবে মানবিক কোনো ব্যক্তি চিরশাস্তিতে বিশ্বাস করতে পারেন। সুসমাচারে ক্রাইস্টকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে তিনি চিরশাস্তিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কথায় যারা বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিহিংসামূলক ক্রোধ ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সব সময়ই দেখা যায়।

টিউটোনিক বা জর্মনরা মনে করতো মৃতরা যায় লোকির কন্যা হেল-এ (Hel, এখনকার Hell) জগতে। *হেল* শব্দটি এসেছে যে-ধাতু থেকে, তার অর্থ 'গোপন করা'; তাই হেলের অর্থ 'গোপন জগত', 'গোপনবাসের জগত'; অর্থাৎ মৃতদের জগত। পরে খ্রিস্টানরা হেলকে, ক'রে তোলে শাস্তির জগতৎ—নরক। হেল মূলত শাস্তির জগত বা নরক ছিলো না, ছিলো বেশ সুখকর স্থান; পরে যখন *ভালহাল্লা,* বীরদের স্বর্গ, ধারণা দেখা দেয়, হেল হয়ে ওঠে মৃত্যুর পর তাদের বাসস্থান, যারা তরবারির আঘাতে মরে নি। এভাবে টিউটোনিক মৃতরা দুভাগে, মত্যুর রীতি অনুসারে, ভাগ হয়ে যায়; যেমন ঘটে মেক্সিকোতো, যেখানে মৃত বীরেরা যায় সূর্যদেবতার প্রাসাদে, যারা মরে বজ্রপাতে বা প্লীহায়, তারা যায় জলদেবতার স্বর্গে, আর সাধারণেরা পচে মিকটলানের মৃত্যুগুহায়। টিউটোনিকদের ভালহাল্লা এক চমৎকার স্বর্গ; সেখানে মৃত বীরেরা দেবতাদের সাথে ভোজে আর দ্বন্দ্বে যাপন করে সময়। তবে এ-স্বর্গটি তৈরি একটি গাছের গুঁড়ির চারদিকে ঘিরে। ওই গাছের পাতায় চ'রে বেড়ায় ইকথিরমির নামে এক হরিণ, আর হিডব্রুন নামে এক ছাগল, যাদের বাঁট থেকে অনিঃশেষ ঝরে সুরার ধারা, যা পান ক'রে বীরেরা মেটায় তৃষ্ণা। তবে ওই স্বর্গে তোরণের সংখ্যা মাত্র পাঁচশো চল্লিশটি, যা দিয়ে একবারে ঢুকতে পারে মাত্র আটশো যোদ্ধা। বীরদের জন্যে একটি বিশেষ স্বর্গ কেনো? বোঝা যায় এটি সেনাগোত্রের কল্পিত স্বর্গ : তারা শুধু পৃথিবীতে ঐশ্বর্যে থেকে তৃপ্তি পায় নি, মৃত্যুর পরও নিজেদের জন্যে একটি স্বর্গ তৈরি করেছে।

এসিরীয় বা ব্যাবিলনি পুরাণে মৃতরা থাকে শূন্যতা ও ঘোরে পরিপূর্ণ এক এলাকায়, যেখান থেকে কোনো প্রত্যাবর্তন নেই। কাদা আর ধুলো তার অধিবাসীদের খাদ্য, অন্ধকার উত্তরাধিকার। সেটি এমন গৃহ, যাতে নেই কোনো

প্রস্থানপথ। ওই গৃহের প্রবেশপথে থাকে এক প্রহরী, যে প্রবেশকারীর থেকে গ্রহণ করে গৃহরানীর জন্যে অর্ঘ্য; এবং ভাগ্যহত প্রবেশকারীর ওপর ছড়িয়ে দেয় মন্ত্রজাল, একের পর এক সাতটি তোরণের ভেতর দিয়ে নিয়ে যায় তাকে, এবং হরণ করে তার পার্থিব সব অধিকার। এ-মৃত্যুলোকের রানীর নাম আল্লাতু, যে বসে রত্নখচিত সিংহাসনে। আল্লাতু প্রবেশকারীকে শাস্তি দিতে পারে, এবং পারে ক্ষমা করতে। এ-পুরাণে মৃত্যুলোক ও জীবনলোকের মধ্যে প্রবাহিত হয় একটি নদী, মৃত্যুর নদী;—এর কোনো আকার নেই, এটি পূর্ণ অসহ্য শীত ও বিষাদাচ্ছন্ন অন্ধকারে। এখানে অশরীরী আত্মারা নিরন্তর খুঁজতে থাকে বেরোনোর পথ। এ-মৃত্যুলোকে আছে একটি বিচারবিভাগও। ওই বিচারালয়ের দিকে যাওয়ার পথ পূর্ণ সব ধরনের বিপদ ও বিভীষিকায়, তবে, মৃতদের অবশ্যই যেতে হয় ওই পথ দিয়ে। এ-মৃত্যুলোকে পুণ্যাত্মাদের জন্যেও আছে একটি এলাকা; বিচারের পর যারা পুণ্যাত্মা ব'লে বিবেচিত হয়, তারা বাস করে সেখানে। প্রশান্ত রুপোলি আকাশের নিচে, স্বচ্ছসলিলা নদীর তীরে, সেখানে বাস করে পুণ্যবান প্রাচীন প্রেরিতপুরুষেরা।

ইহুদিদের নরকের নাম *জেহেন্না*, যার থেকে এসেছে মুসলমানদের *জাহান্নাম*। জেহেন্নায় পাপীদের দেয়া হয় শারীরিক ও আত্মিক দু-ধরনেরই শাস্তি। এখানে চিরশাস্তির মধ্যে থাকে অন্য জাতির মানুষেরা; অবিশ্বাসী ইহুদিরাও থাকে, তবে এটা তাদের জন্যে পাপমোচনের এলাকা; পাপমুক্তির পর তারাও যায় স্বর্গে। *শিওল* নামেও আছে একটি ইহুদি মৃত্যুলোক, যেটি একান্তভাবেই হিব্রু বা ইহুদি। হিব্রুরা জেহেন্না ধারণাটি ধার করেছিলো আক্কাদীয় *জি-উমুনা* থেকে। শিওল মৃত্যুর পর পুণ্যবান ও পাপী উভয়েরই বাসস্থান; গ্রিক হেডিসের মতো জীবন যেখানে ছায়াচ্ছন্ন ও অশরীরী। *যিশাইয়তে* (১৪,৯-১১) আছে :

> অধঃস্থ নরক তোমার জন্য বিচলিত হয়ে তোমার আগমনে উপস্থিত হয় তোমার সামনে; তোমার জন্যে সচেতন ক'রে তোলে মৃতদের, এমনকি পৃথিবীর সব প্রধানদের; এ সিংহাসন থেকে তুলে এনেছে সব জাতির রাজাদের। তারা সবাই তোমাকে বলে, তুমিও কি দুর্বল হ'লে আমাদের মতো? তুমিও কি হ'লে আমাদের সমান? কবরে নামানো হলো তোমার আড়ম্বর, ও তোমার নেবলযন্ত্রের মধুর বাদ্য : তোমার নিচে পাতা রয়েছে কীট, এবং তোমাকে ঢেকেছে কৃমিরা।

ব্যাবিলনের দাসত্বে থাকার পর ব্যাবিলন প্রভাবে ইহুদিরা শিওলকে সাধারণ শাস্তির, এবং জেহেন্নাকে দণ্ড ও পীড়নের বিশেষ এলাকায় পরিণত করে।

পুরাণ ও ধর্মের এ-সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায়, কোনো ধর্মই কোনো ঈশ্বর পাঠান নি; মানুষই ভুল কল্পনার পর ভুল কল্পনা ক'রে সৃষ্টি করেছে এগুলো। ধর্মের বইগুলো ঋণী মানুষের আদিম পুরাণগুলোর কাছে। মানুষ চিরকাল ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে নানা প্রপঞ্চ, কল্পনা করেছে বহু কিছু; মানুষ সত্য বলতে চেয়েছে, এবং মিথ্যা বলেছে প্রচুর, এবং মানুষ মিথ্যেয় যতো বিশ্বাস করেছে, সত্যে ততো

বিশ্বাস করে নি; এখনো করে না। মিথ্যের বিহ্বলকর সুখকর শক্তি রয়েছে, যা নেই সত্যের। ধর্মের বইগুলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যদিও বারবার নিজেদের সত্য ব'লে দাবি করে, এবং সত্যনিষ্ঠদের ভয় দেখায়। এগুলো প্রতিষ্ঠিত আদিম মানুষের কল্পনা ও পরবর্তীদের সুপরিকল্পিত মিথ্যার ওপর। মানুষ কতোটা মিথ্যা বলতে ও বিশ্বাস করতে পারে, তার অসামান্য উদাহরণ জেসাস বা খ্রিস্ট। জেসাস মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্পচরিত্র : গত দু-শো বছরের বাইবেলবিজ্ঞানীরা, যাঁদের অনেকেই ধার্মিক ও পুরোহিত, প্রমাণ করেছেন যে জেসাস নামে কেউ ছিলো না। কিন্তু জেসাস সৃষ্টি হলো কীভাবে, এবং হয়ে উঠলো একটি প্রধান ধর্মের প্রবর্তক? জেসাসকে সৃষ্টি করা, তাকে ঘিরে পুরাণ, ও একটি নতুন ধর্ম বানানোর সমস্ত কৃতিত্ব খ্রিস্টান সুসমাচারপ্রণেতাদের। ক্রাইস্ট এক কিংবদন্তি বা পুরাণ। জেসাসসৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে ব্রুনো বাউআর, জে এম রবার্টসন, ভ্যান ডেন বার্গ ভ্যান এইসিংগা, আলবার্ট কালথোফ, গাই ফাউ, প্রোসপার আলফারিক, ডব্লিউ বি স্মিথ, জি এ ওয়েল্‌স্‌ প্রমুখ তৈরি করেছেন একটি তত্ত্ব, যার নাম *খ্রিস্টপুরাণ*।

ডেভিড স্ট্রাউস *লাইফ অফ জেসাস ক্রিটিক্যালি এক্সামিন্ড*-এ (১৮৩৫) বলেছেন গসপেল বা সুসমাচারগুলো জেসাসের ঐতিহাসিক জীবনী নয়; জেসাসের বস্তুনিষ্ঠ জীবনী লেখা সুসমাচারলেখকদের উদ্দেশ্য ছিলো না; তাঁরা চেয়েছিলেন ধর্মীয় পুরাণ লিখে তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মে মানুষদের দীক্ষিত করতে। স্ট্রাউসের মূলকথা হচ্ছে *নতুন টেস্টামেন্ট*-এর গল্পগুলো সত্য নয়; *মিসাইআ* বা ত্রাতার আগমন সম্পর্কে ইহুদিরা দীর্ঘকাল ধ'রে যে প্রত্যাশা ক'রে আসছিলো, গল্পগুলো তারই গল্পায়ন। ইহুদিরা বহুকাল ধ'রে প্রত্যাশা ক'রে আসছিলো একজন ত্রাতা আসবেন, কিন্তু তিনি আসছিলেন না। তাঁর আগমন সম্পর্কে *পুরোনো টেস্টামেন্ট*-এ আছে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী; সুসমাচারলেখকেরা ওই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে সাজিয়ে তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন জেসাস ক্রাইস্টকে। *মিসাইআ* শব্দটি এসেছে হিব্রু *মশিআহ্* থেকে, যার অর্থ 'তৈলাক্ত ব্যক্তি'; এ-শব্দটি গ্রিকে হয় *খ্রিস্টোস*, যার থেকে এসেছে ইংরেজি *ক্রাইস্ট*, এবং বাঙলা *খ্রিস্ট*। রাজা এবং পুরোহিতদের শরীরে, তাদের কর্ম শুরুর সময়, তেলমাখানো রীতি ছিলো ইহুদিদের; তাই তাদের বলা হতো মশিআহ্; পরে এর অর্থ হয় 'ত্রাতা'। ইহুদিরা অবশ্য প্রত্যাশা করছিলো রাজকীয় ত্রাতার; কিন্তু সুসমাচারলেখকরা রাজকীয় ত্রাতাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি করেন আধ্যাত্মিক রাজা, যে বলে, 'অনুতপ্ত হও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব আসন্ন', এবং সময় হয়ে গেছে, এবং ঈশ্বরের রাজত্ব আসন্ন; অনুতপ্ত হও, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করো।' ঈশ্বর কোনো ত্রাতা পাঠান নি, কোনো ত্রাতা আসেন নি, ক্রাইস্ট সুসমাচারলেখকদের সৃষ্টি। তাঁরা *পুরোনো টেস্টামেন্ট* থেকে জানতেন ত্রাতা আসবেন; এ-বইতে বিশদভাবেই ব'লে দেয়া হয়েছে ত্রাতা কীভাবে আসবেন, কার গর্ভে জন্ম নেবেন, কী করবেন, কী বলবেন। এসব অবলম্বন ক'রে

তাঁরা জেসাসকে তৈরি করেন; ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁকে জন্ম দেন, তাঁকে দিয়ে কাজ করান, এবং তাঁকে দিয়ে কথা বলান। সুসমাচারগুলো উপন্যাসের থেকে সত্য নয়, জেসাসও সত্য নন উপন্যাসের নায়কের থেকে।

পুরোনো টেস্টামেন্ট ভ'রেই রয়েছে নবিরা, এর পাতায় নবি পাওয়া যায়; যেমন ওই অঞ্চলের পথে পথে নবি পাওয়া যেতো। ওই নবিদের অনেকেই ছিলো শস্তা জ্যোতিষ। ইংরেজি *প্রফেট* শব্দটি এসেছে একটি গ্রিক শব্দ থেকে, যার অর্থ 'যে অন্যের হয়ে কথা বলে'। শব্দটি হিব্রুতে হচ্ছে *নবি*, বা *নভি*। মোজেস বা মুসা তোতলা ছিলেন, ঠিক মতো কথা বলতে পারতেন না; জিহোভার ডাকে সাড়া দিয়ে নবি হওয়ার ইচ্ছেও তাঁর ছিলো না, অনিচ্ছায়ই তিনি নবি হয়েছিলেন। জিহোভা তাঁকে বলেছে, 'আমি তোমাকে ফারাওদের ঈশ্বর করছি, আর তোমার ভাই আরোন (অর্থাৎ হারুন) হবে তোমার নবি।' *নবি* শব্দটি এসেছে *নাবু* থেকে, যার অর্থ 'ডাকা, ঘোষণা করা'। তাই 'নবি'র অর্থ হ'তে পারে 'ঘোষণাকারী, আহ্বানকারী', বা হ'তে পারে যাকে আহ্বান করা হয়েছে।' বাইবেলে দু-অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাইবেলে জিহোভা বলেছে, 'আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর, আইজাকের ঈশ্বর, এবং জ্যাকোবের ঈশ্বর... এসো, আমি তোমাকে ফারাওদের কাছে পাঠাবো যাতে তুমি আমার মানব, ইসরাইলের পুত্রদের, মিশর থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারো।' শব্দটির আরেক অর্থ *পাঠানো*, তাই নবি হচ্ছে *প্রেরিতপুরুষ*। সুসমাচারলেখকেরা পুরোনো বাইবেলের নবিদের উপাখ্যান ভালো ক'রেই জানতেন। বাউআর বলেছেন, তাঁরা পুরোনো বাইবেলের নবিদের আদলে তৈরি করেছিলেন জেসাসকে, যিনি কখনো ছিলেন না। প্রথম শতকে ইহুদি আর গ্রিক-রোমীয় চিন্তাভাবনা থেকে উদ্ভব ঘটেছিলো খ্রিস্টধর্মের। সে-সময়ের অনেকে দাবি করেছেন যে জেসাসকে তৈরি করা হয়েছে তাইআনার অ্যাপোলোনিয়াসের আদলে। অ্যাপোলোনিয়াস ছিলেন একজন নবপিথাগোরীয় শিক্ষক, যিনি জন্ম নিয়েছেলেন খ্রিস্টীয় শতকের কিছু আগে, যিনি ভ্রাম্যমাণ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন যাপন করতেন, নিজেকে দাবি করতেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী ব'লে এবং নিরো ও ডোমিতিয়ানের রাজত্বকালে বাস করতেন নিয়ত মৃত্যুভীতির মধ্যে। তাঁর অনুসারীরা তাঁকে বলতো ঈশ্বরের পুত্র।

আদিখ্রিস্টানরা জেসাসের মুখে অনেক কথা বসিয়েছে, ওসব কথা জেসাস কখনো বলেন নি; কেননা তিনি কখনো ছিলেন না। ওই কথাগুলো জেসাসের কথা নয়, ওগুলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, এবং আশার প্রকাশ। তারা যা দেখছিলো, যা বিশ্বাস করেছিলো, যে-প্রত্যাশা পোষণ করছিলো, তাই তারা ব্যক্ত করেছে জেসাসের কাজে ও উক্তিতে। ইহুদিরা বহুকাল আশায় আশায় ছিলো যে ত্রাতা আসবেন, মুক্তি ঘটবে তাদের; আর প্রত্যেক প্রজন্মই মনে করেছে তাদের সময়েই আসবেন মুক্তিদাতা, পালিত হবে প্রাচীন প্রতিশ্রুতি। প্রথম দিকের

খ্রিস্টানরা পুরোনো বাইবেল থেকে জানতো যে ত্রাতার আগমনে আগে পৃথিবীতে ফিরে আসবে এলিজা। যখন তারা মনে করে যে ব্যাপটিস্ট জনই হচ্ছে পৃথিবীতে-ফিরে-আসা এলিজা, তখন তারা বিশ্বাস করে যে ত্রাতার আগমনের আর দেরি নাই; এবং তৈরি ক'রে ফেলে জেসাসকে, যে জনকে ডাকে এলিজা নামে। জেসাসের জন্মের ব্যাপারটিকে তারা পরিণত করে এক অলৌকিক ঘটনায়। পুরুষ সংসর্গহীন কুমারী মাতার গর্ভে সন্তান জন্ম অসম্ভব হ'লেও তা কল্পনা করা অসম্ভব নয়; ওই সময়ে গ্রিক আর রোমসাম্রাজ্য ভ'রেই প্রচলিত ছিলো কুমারী মাতার গর্ভে সন্তান জন্মের কিংবদন্তি। গ্রিক পুরাণে কুমারী ডানার গর্ভে জন্ম নেয় পারসেউস, তার মা ডানা গর্ভবতী হয় স্বর্ণবর্ষণের ফলে; আবার কুমারী নানা গর্ভবতী হয় ডালিম খেয়ে, এবং জন্ম দেয় আত্তিসকে। তখন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও—পিথাগোরাস, প্লাতো, আলেকজান্ডার, অগাস্টাস—কুমারী মাতার গর্ভে বা দেবতাদের হস্তক্ষেপে জন্ম নিয়েছেন ব'লে বিশ্বাস করা হতো। আদিখ্রিস্টানরাও যখন জেসাসকে সৃষ্টি করে, তাঁর ঐশ্বরিকতা প্রমাণ করার জন্যে তাঁকে জন্ম দেয় কুমারী মায়ের গর্ভে। অনেকে মনে করেন কুমারী মাতার কিংবদন্তিটি জন্মেছে পুরোনো বাইবেলের ত্রাতার জন্মসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি শব্দ ভুল বোঝার ফলে। পুরোনো বাইবেলে (*যিশাইয়,* ৭:১৪) একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে:

> তাই প্রভু তোমাদের এক চিহ্ন দেবেন। দেখো এক কন্যা গর্ভবতী হয়ে পুত্র জন্ম দেবে, ও তার নাম ইম্মানুয়েল রাখবে।

খ্রিস্টানরা এখানে দেখতে পায় ত্রাতার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী। তারা ঐশ্বরিক উন্মাদনায় ভুল অনুবাদ করে 'কন্যা' শব্দটির। পুরোনো বাইবেলে আছে *হালমাহ্,* যার অর্থ 'তরুণী', বাঙলায় বাইবেল অনুবাদকেরা যার অর্থ করেন 'কন্যা'। হিব্রুতে *বেথুলা* হচ্ছে 'কুমারী'। খ্রিস্টান ধর্মপ্রবর্তকেরা গ্রিকে হালমাহ্‌র অনুবাদ করেন *পার্থেনোস* অর্থাৎ কুমারী। তাই ত্রাতার যেখানে জন্ম নেয়ার কথা ছিলো তরুণী মায়ের গর্ভে, সেখানে খ্রিস্টানরা তাকে জন্ম দেয় কুমারী মায়ের গর্ভে। জেসাস এক কিংবদন্তি; সত্য নন, কিন্তু সত্য ব'লে পূজিত। ধর্ম এমনই সব সত্যের সমষ্টি।

জেসাসের গল্প বলেছেন শুধু সুসমাচারলেখকরা, সে-সময়ের আর কেউ বলেন নি। প্রথম শতকে রোমসাম্রাজ্যে অন্তত ষাটজন ঐতিহাসিক লিখছিলেন ইতিহাস, তাঁরা কেউ জেসাসের কথা লেখেন নি। জেসাস ঐতিহাসিক ব্যক্তি হ'লে তাঁদের কেউ না কেউ জেসাসের উল্লেখ করতেন; কিন্তু উল্লেখ করেন নি, কেননা তাঁরা ইতিহাস লিখছিলেন, কিংবদন্তি তৈরি করছিলেন না। এখন এটা স্বীকৃত যে সুসমাচারগুলো,— *মথি, মার্ক, লুক, যোহন*—যেগুলো ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছে খ্রিস্টধর্ম—জেসাসের শিষ্যদের লেখা নয়; সুসমাচারপ্রণেতারা জেসাসকে দেখেন নি। সুসমাচারগুলো লেখা হয়েছিলো জেসাসের কথিত ক্রুশকাঠে প্রাণ দেয়ার চল্লিশ থেকে আশি বছর পরে, লিখেছিলেন নামপরিচয়হীন লেখকেরা। এগুলোর

মধ্যে মথি, মার্ক, লুকের, বিষয় একই; ভাষাও অনেকটা এক। সম্ভবত মার্কই সবচেয়ে পুরোনো, আর অন্যগুলো এটির নকল। তাই এগুলোতে যে-কাহিনী ও কথা আছে, তা কোনো বাস্তব মানুষের নয়। ঐতিহাসিক বই নয় এগুলো; এগুলো সুসমাচারপ্রণেতাদের বিশ্বাস অনুসারে লেখা জেসাসপুরাণ।

খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তকেরা পুরোনো বাইবেলের শূন্য ভবিষ্যদ্বাণী ও নিজেদের ভুল বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন এক ত্রাতাকে; কিন্তু মিথ্যায় তাঁদের আত্মা সম্ভবত শান্তি পায় নি, তাই *নতুন বাইবেল* ভ'রেই পাওয়া যায় জেসাসের দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাশা। ইয়েট্‌স্‌ খ্রিস্টানদের এ-প্রত্যাশার বেদনা মর্মে মর্মে বোধ ক'রে, বিশশতকে, একটি কবিতা লিখেছেন 'দ্বিতীয় আগমন' নামে, যাতে জেসাস নয়, একটি নরমুণ্ডধারী বিকট পশু বেথলেহেমের দিকে এগোয় জন্ম নেয়ার জন্যে। নতুন অর্থাৎ খ্রিস্টানদের বাইবেল ভ'রেই ছড়ানো 'জেসাস শিগগিরই আসবেন', 'জেসাসের আগমন আসন্ন' ধরনের প্রত্যাশা; কিন্তু জেসাস প্রথমবার আসেন নি, দ্বিতীয়বারও আসেন নি, কখনো আসবেন না। মথির মতে জেসাস বলেছেন, 'সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, এই প্রজন্মের কাল কেটে যাওয়ার আগেই ঘটবে এসব ঘটনা।' আশার পর আশা আর বহু ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়ে গেছে, জেসাস আসেন নি। তাহলে কি জেসাসের কথা সত্য নয়? সুসমাচারলেখকেরা অদম্য, তাঁরা ঈশ্বরের বাণীকে মিথ্যে হ'তে দিতে পারেন না; তাই তাঁরা ব্যাখ্যা করেন যে ঈশ্বরের সময় মানুষের সময়ের মতো নয়। তাঁরা বলেন, ঈশ্বরের 'একদিন সহস্র বছরের সমান, এবং সহস্র বছর একদিনের সমান।' বলা যে হয়েছে 'শিগগির'; প্রশ্ন হচ্ছে কতোটা 'শিগগির' হচ্ছে 'শিগগির'? কেনো বিলম্ব হচ্ছে? ঈশ্বরের একদিন সহস্র বছর আর সহস্র বছর একদিন, এ-হিশেব খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয় মানুষের জন্যে; মানুষ আশাবাদী, কিন্তু তারা আশায় আশায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং সহস্র বছর বাঁচে না। ধার্মিকরা মত বদলাতে খুবই অভ্যস্ত, তাঁরা নতুন ব্যাখ্যা দিতে লজ্জা পান না; এবং ঈশ্বরের বাণী থেকে সব সময়েই সুবিধামত তাৎপর্য বের করতে পারেন। তাই পরে 'জেসাস শিগগিরই আসবেন' থেকে 'শিগগির' বাদ দেয়া হয়; বলা হয় 'জেসাস আসবেন।' দ্বিতীয় আর তৃতীয় শতকের খ্রিস্টান পুরোহিতেরা মনে করতেন জেসাস শিগগিরই এসে হাজার বছরের জন্যে স্থাপন করবেন তাঁর সাম্রাজ্য। কিন্তু তাঁর দেখা নেই। কনস্ট্যান্টিন (২৮৮-৩৩৭) যখন খ্রিস্টধর্মকে স্বীকৃতি দেয়, তখন এক পাদ্রি জেসাসের সহস্র বছরের শাসনের এক রূপক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে এ-স্বীকৃতিই জেসাসের রাজত্বের শুরু; এর সমাপ্তি ঘটবে জেসাসের পুনরাগমনে। খ্রিস্টানরা জেসাসের ফিরে আসার আশা যখন হাজার বছরের জন্যে স্থগিত ক'রে দেয়, কিন্তু ১০০০ অব্দের কাছাকাছি এসে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ক্রাইস্ট ফেরেন নি; তাই ব্যর্থ প্রত্যাশার বেদনা থেকে জন্ম নেয় আরেক নতুন আশা। কনস্ট্যান্টিন ৩১২ অব্দে

খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো, তারা ওই বছরটিকে সহস্রকের সূচনা ধ'রে ১৩১২-র দিকে ক্রাইস্টের পুনরাগমনের প্রত্যাশায় থাকে। তারপরও ক্রাইস্ট আসেন না; সময় আসে, আর চ'লে যায়; তখন আবার দিতে হয় জোড়াতালি। ষোলশতকের খ্রিস্টান সংস্কারকেরা পোপতন্ত্রকে, রোমীয় ক্যাথলিক গির্জার স্তরক্রমকে, শনাক্ত করে শয়তান ব'লে। তারা বলে যে তারা বাস করছে পবিত্র সহস্রকের পরে, যখন পোপতন্ত্ররূপী শয়তান ছাড়া পেয়ে ক'রে চলছে অবাধ শয়তানি। আরেকদল শার্লেমেনের রাজত্বের সূচনাকে (৮০০ অব্দ) ধরে পবিত্র সহস্রকের শুরু হিশেবে, এবং অপেক্ষায় থাকে ক্রাইস্টের। তারা চিরকাল আশা করতে থাকবে, কিন্তু ক্রাইস্ট ফিরবেন না; কেননা তিনি কখনো ছিলেন না, আসেন নি।

আধুনিক পৃথিবীতে আদিম ব্যাপার হচ্ছে ধর্ম। পৃথিবী অনেক এগিয়েছে, বিকাশ ঘটেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের, তবে অধিকাংশ মানুষের মনের আদিমতা কাটে নি; তারা লোভ-ভয়-অপবিশ্বাসের মধ্যে বাস ক'রেই স্বস্তি পাচ্ছে। ধর্ম রাজনীতিও; পৃথিবী জুড়ে ক্ষমতাগৃধ্নু দুষ্ট রাজনীতিকদের বড়ো অস্ত্র হয়ে উঠেছে ধর্ম। তারা নিজেরা ধর্মে বিশেষ বিশ্বাস করে না, তাদের জীবন যদিও অধার্মিক, তবু তারা ক্ষমতার জন্যে উত্তেজিত ক'রে তোলে সাধারণ মানুষের লোভ-ভয়-অপবিশ্বাসকে। মানুষ ধার্মিক হয়ে জন্ম নেয় না যদিও অনেক সময় রটানো হয় যে কেউ কেউ মায়ের গর্ভ থেকেই ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ ক'রে এসেছে; অধিকাংশ মানুষ সাধারণত ধর্মকে পাত্তা দেয় না। ধর্ম এতো দিনে লোপ পেয়ে যেতো যদি না চারপাশে সারাক্ষণ সক্রিয় থাকতো ধর্মের রক্ষীবাহিনী। প্রতিটি ধর্ম সৃষ্টি করে তার সুবিধাভোগী রক্ষীবাহিনী; কখনো এবং কোথাও ওই বাহিনী অত্যন্ত হিংস্র, কখনো কোথাও মৃদু। পরিবার, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, মসজিদ-মন্দির-গির্জা-সিনেগগ, উৎসব, পুরোহিত-মোল্লা-রাবাই, বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক, সমাজ-রাষ্ট্র সবই কাজ করে ধর্মের রক্ষীবাহিনীরূপে। এরা সব সময় চোখ রাখে যাতে কেউ ধর্মের বাইরে যেতে না পারে, অর্থাৎ তাদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে না পারে। আমাদের দেশে এদের আচরণ মৃদু, কিন্তু ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে; এবং ইরানে, সৌদি আরবে, পাকিস্থানে হিংস্র। আমাদের দেশেও ধর্মের বাইরে যাওয়া কঠিন। বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে, চাকুরির জন্যে আবেদন করতে, এবং তুচ্ছ নানা কাজ করতে গেলে ধর্মের ঘর পূরণ করতে হয়; যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারাও রক্ষীবাহিনীর গোপন ফাঁদের বাইরে যেতে পারে না। ধর্ম টিকে আছে এ-রক্ষীবাহিনীর সক্রিয়তায়। রক্ষীবাহিনীটি ধর্মের সুবিধাভোগী বাহিনী; ধর্ম থেকে যতোটা সুবিধা তোলা যায়, তারা তোলে, এবং ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র হিশেবে, যা গর্জে উঠতে পারে যখন তখন। আমাদের দেশে কেউ চুপচাপ ধর্মের বাইরে থাকতে পারে, পালন নাও করতে পারে ধর্মের বিধিবিধান, কিন্তু সে প্রকাশ্যে ধর্মের সমালোচনা করতে পারে না, লিখতে পারে না। ধর্মের

বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার ধর্ম, অর্থাৎ ধর্মের রক্ষীবাহিনী দেয় না, যেমন স্বৈরাচারীরা দেয় না তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার। ধর্মগুলো যুক্তি ও সততা সহ্য করে না; ধর্মের পক্ষে কোটি কোটি মিথ্যে মানুষ কয়েক হাজার বছরে বলেছে, এখনো বলছে; ধর্মের আপত্তি নেই ওই সব মিথ্যে সম্বন্ধে, বরং ওই মিথ্যেগুলোকেই মনে করা হয় ধর্ম; কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে একটি সত্যও বলা যায় না। ধর্মের প্রতিপালকেরা যতো মিথ্যে কথা বলে প্রতিদিন, শুক্রবার, রোববার, ধর্মীয় জলসায়, সাধারণ মানুষ ততো কখনো বলে না।

ধর্ম এবং ধর্মের বইগুলো অলৌকিক নয়, ধর্মের বইগুলো জ্ঞানের বইও নয়; পঞ্চম শ্রেণীর বই পড়লেও যতোটা জ্ঞান হয়, ধর্মের বইগুলো পড়লে ততোটা জ্ঞানও হয় না, বরং অনেক অজ্ঞানতা জন্মে। বিশ্বাস ও অজ্ঞানতা পরস্পরের জননী; জ্ঞান জন্মে অবিশ্বাস থেকে। বিশ্বাসমাত্রই অপবিশ্বাস; জ্ঞান বিশ্বাসের বিষয় নয়, জানার বিষয়। কোনো ধর্মপণ্ডিত যদি সারাজীবন ধর্মেরই বই ও তার ভাষ্য পড়ে, আর কিছু না পড়ে, সে থেকে যায় পঞ্চম শ্রেণীর শিশুটির থেকেও মূর্খ। ওই শিশুটি জানে সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে পৃথিবী ও বিভিন্ন গ্রহ, কিন্তু ধর্মপণ্ডিত জানে পৃথিবীই কেন্দ্র; শিশু জানে সাত আসমান ব'লে কিছুই নেই,—ওটা টলেমির ধারণা ছিলো এবং ঢুকে গিয়েছিলো ধর্মের বইয়ে, ধর্মপণ্ডিত তা জানে না; শিশু জানে চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ, তার কোনো পবিত্রতা নেই, ধর্মপণ্ডিত জানে চাঁদ পবিত্র, মাস আর বছর হিশেব করার জন্যে বিধাতা এটি সৃষ্টি করেছে। এগুলোতে সত্য নেই, রয়েছে প্রচুর মিথ্যে, ও আদিম মানুষদের ব্যাপক অপবিশ্বাস। ধর্মের বইগুলোতে রয়েছে প্রচুর ভুল, আর স্ববিরোধিতা; এবং এগুলো পরস্পরবিরোধী। বলা হয় যে ধর্মের বইগুলো বিধাতার বই, তাই সহজাতভাবেই শ্রেষ্ঠ; এ-বই মানুষের পক্ষে লেখা অসম্ভব। তবে এগুলোর থেকে বহু উৎকৃষ্ট বই মানুষ লিখেছে, এবং আরো লিখবে। এগুলোতে পুনরাবৃত্তি ও বাজে কথার শেষ নেই; এবং এমন কিছু নেই, যাকে আমরা অনুভব বা বোধ করতে পারি ঐশী ব'লে। এ-বইগুলো কিছু প্রমাণ করে না; এগুলো বিধাতার উক্তি দিয়েই প্রমাণ করে বিধাতাকে, আর তার কথিত সৃষ্টিকে। ধর্মের অন্ধ ভাষ্যকারেরা এগুলোর সব শ্লোকেই বিধাতার অপার মহিমা দেখে; কিন্তু একটু যুক্তি খাটালেই ধ'সে পড়ে শ্লোকের পর শ্লোকের মাহিমা।

ধর্ম কী? অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাসই, অনেকে মনে করেন, ধর্ম। এটা ধর্মের বড়ো উপাদান, তবে এই ধর্মের সব নয়; ধর্মে প্রধান নানা আনুষ্ঠানিকতা। ধর্মে আবশ্যিকভাবে প্রহরে, প্রহরে পুজোআরাধনা করতে হয়; যেতে হয় তীর্থে; বানাতে হয় মসজিদ, মন্দির, সিনাগগ, গির্জা, প্যাগোডা ও নানা দেবালয়; পালন করতে হয় বহু আদিম আচারানুষ্ঠান। এগুলোর উদ্দেশ্য ধর্মীদের সংঘবদ্ধ ক'রে উন্মাদনা জাগিয়ে রাখা; উগ্র রাখা তাদের সম্প্রদায়বোধ। মানুষ যদি একান্ত

ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতো অলৌকিক সত্তায়, ধর্ম হতো ব্যক্তিগত; কিন্তু ধর্মগুলো ব্যক্তিগত ধর্ম চায় না, চায় সংঘবদ্ধ ধর্ম; এগুলোর কাজ অলৌকিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি দেয়া নয়, এগুলোর কাজ বিশেষ ধরনের সমাজ গঠন করা। 'আধ্যাত্মিক অনুভূতি' সম্পূর্ণ বাজে কথা; যারা এ-ধরনের অনুভূতি চায়, এবং পেয়েছে ব'লে দাবি করে, তারা মনোব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। সমস্ত আধ্যাত্মিক কবিতা ও গান মনোবিকারের ফল। ধর্মগুলো মানুষকে নিজের জীবন ধারণ করতে দেয় না, বাধ্য করে বিশেষ ব্যক্তি বা গোত্রের পরিকল্পিত জীবন যাপন করতে। প্রতিটি ধর্মের পুজোআরাধনার রীতিগুলো হাস্যকর; ইহুদিরা একভাবে, খ্রিস্টানরা আরেকভাবে, মুসলমানরা আরেকভাবে, হিন্দুরা আরেকভাবে, এবং আরো যে অজস্র ধর্ম রয়েছে, সেগুলোতে শৃঙ্খলিতরা বিচিত্ররূপে পুজোঅর্চনা করে। প্রতিটি ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের আরাধনার রীতিকে মনে করে হাস্যকর; মুসলমানের কাছে হিন্দুর পূজো আর ঘণ্টাধ্বনি হাস্যকর, হিন্দুর কাছে মুলমানের দিনে পাঁচবার উঠে-ব'সে প্রার্থনা হাস্যকর। এসবে এমন কিছু নেই, যা বহন করে কোনো পরম সত্তার ছোঁয়া। এগুলোতে বারবার আবৃত্তি করা হয় এমন সব শ্লোক, যেগুলো স্থূল, যেগুলোর নেই কোনো অসাধারণত্ব। কোনো কোনো ধর্মের আরাধনার অনেক শ্লোক কালাতিক্রমণতাগ্রস্তও; উপাসনার সময় প্রতিদিন এমন সব ব্যক্তিকে ধ্বংস হওয়ার অভিশাপ দেয়া হয় যারা বহু আগেই লোকান্তরিত।

প্রচলিত ধর্মগুলো সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম নয়; এগুলোর একটির সাথে আরেকটির নানা মিল রয়েছে। অনেক সময় এক বা একাধিক ধর্ম থেকে জন্মেছে আরো এক বা একাধিক ধর্ম। তবে প্রতিটি ধর্মই নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন ব'লে দাবি করে, যেনো এইমাত্র বিধাতা সেটি তৈরি ক'রে পাঠিয়েছেন। ভারতীয় ধর্মগুলোর মধ্যে মিল অত্যন্ত স্পষ্ট; একটি মূল ধর্ম থেকেই ভারতে দেখা দিয়েছে পরবর্তী ধর্মগুলো। মধ্যপ্রাচ্যেও তাই রয়েছে; কানান বা প্যালেস্টাইন হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মগুলোর মতৃভূমি। প্যালেস্টাইনের মানুষ নানা কিংবদন্তি থেকে সৃষ্টি করেছিলো ইহুদিধর্ম; তার থেকে উদ্ভূত হয় খ্রিস্টধর্ম; এবং ইহুদি-খ্রিস্ট ও মক্কায় প্রচলিত পৌত্তলিক আরবদের ধর্ম থেকে বিকশিত হয় ইসলাম। ইসলামের ধর্মগ্রন্থে বিধাতার প্রেরিত ধর্মরূপে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম স্বীকৃত; এবং এ-গ্রন্থে রয়েছে বহু উপাখ্যান, যেগুলোর উৎস পুরোনো ও নতুন বাইবেল। আদম-হাওয়ার উপাখ্যানটি স্বীকার করে তিনটি ধর্মই। এ-উপাখ্যানটি প্রথম তৈরি করেছিলো হিব্রুরা, ও অন্তর্ভুক্ত করেছিলো পুরোনো বাইবেলে। এটা প্যালেস্টাইনের লোককাহিনী বা পুরাণে প্রচলিত ছিলো; এমনকি তারা কল্পনা করেছিলো তিনটি হাওয়ার, যাদের শেষটি তিনটি ধর্মগ্রন্থে স্থান পেয়ে নিন্দিত ও বিখ্যাত। ইসলাম ধর্মে শুধু আদম-হাওয়াই নয়, পাওয়া যায় পুরোনো বাইবেলের আরো বহু চরিত্র; যেমন, হারুন (অ্যারোন), ইব্রাহিম, (আব্রাহীম) হাবিল (আবেল), কাবিল

(কেইন), দাউদ (ডেভিড), ইলিয়াস (এলিয়াস), জিব্রিল (গ্যাব্রিয়েল), ইয়াজুজ (গগ), ইসহাক (আইজ্যাক), ইসমাইল (ইসমায়েল), ইউনুস (জোনাহ্), ইউসুফ (জোসেফ), মাজুজ (ম্যাগোগ), নুহ (নোআহ্), ফিরাউন (ফারাও); এবং পাওয়া যায় বাইবেলের বহু গল্প : বিশ্বসৃষ্টি, আদমের স্বর্গচ্যুতি, কেইন ও আবেল, আব্রাহামের নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করার উদ্যোগ, নুহের নৌকো, ইউসুফের মিশরগমন, ইউনুস ও মাছ, ফেরাউন, সলোমনের বিচার, শেবার রানী ও আরো নানা কাহিনী। ইসলামের বিধাতার নামটিও নতুন নয়, নামটি আরবে আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো; মুসলমানরা অবশ্যই দাবি করে নামটি সৃষ্টির শুরু থেকেই আছে। এ-দাবির ওপর কোনো কথা নেই। নামটির বহু উদাহরণ পাওয়া যায় ওই সময়ের আরবদের ব্যক্তিনামে; যেমন, আবদুল্লা—আল্লার দাস। ইসলামপূর্ব মক্কায় পূজিত হতো তিনটি দেবী—দেবতা নয়,—আল-লাত, মানত, ও আল-উজ্জা। আল-উজ্জা ছিলো চান্দ্রদেবী, মক্কার মহাদেবী; তার ভক্তদের নাম হতো আবদুল উজ্জা (আবু লাহাবের আসল নাম)—উজ্জার দাস। তার আরেকটি নামও ছিলো। ইসলামপূর্ব আরব ছিলো মাতৃপ্রধান, ইসলামে ঘটে পিতৃতন্ত্রের উত্থান : ধর্মে যেমন পরাজিত হয় দেবীরা, তেমনি সমাজে পরাজিত হয় মাতারা, জয়ী পিতারা। ইসলামে *হিলাল* বা বাঁকা চাঁদকে পবিত্র মনে করার বিশেষ কারণ রয়েছে। ইসলাম আগের আরবকে অন্ধকারের কাল ব'লে নিন্দিত করলেও ওই আরব অতোটা অন্ধকারে ছিলো না; চিরকালই বিজয়ীরা পরাজিতদের নামে কুৎসা রটায়। ইসলামপূর্ব আরব থেকে ইসলাম নিয়েছে বহু কিছু : পুরুষের বহুবিবাহ (আরবে নারীদের বহুবিবাহও প্রচলিত ছিলো), দাসপ্রথা, সহজ বিবাহবিচ্ছেদ (আরবে নারীরা সহজে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারতো, ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদ সহজ হয়ে ওঠে পুরুষের জন্য), সামাজিক নানা বিধি, খৎনা ইত্যাদি। ইসলাম অপৌত্তলিক; কিন্তু এর তলদেশে আরব পৌত্তলিকতার ফল্গুস্রোত সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় নি। তীর্থযাত্রা, পশুবলি, উপবাস প্রায় সব ধর্মেই রয়েছে; ইসলামেও আছে। হজ ও কোরবানির মূল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। আরব কবি আল-মারি (৯৭৩-১০৫৭) লিখেছেন, 'দশ দিক থেকে মানুষ আসে পাথর ছুঁড়তে আর চুমো খেতে। কী অদ্ভুত কথা তারা বলে! মানুষ কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে না সত্য?' জালালউদ্দিন রুমি লিখেছেন, 'আমি পথ খুঁজি. তবে কাবা বা উপাসনালয়ের পথ নয়, প্রথমটিতে আমি দেখি একদল পৌত্তলিককে আর দ্বিতীয়টিতে একদল আত্মপূজারীকে।' খলিফা উমর কাবার কালোপাথরকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন, 'যদি না আমি দেখতাম মহানবি তোমাকে চুমো খাচ্ছেন, আমি নিজে তোমাকে চুমো খেতাম না।'

ইসলামে পশু উৎসর্গকে জড়িত করা হয় হিব্রু নবি আব্রাহামের নিজের পুত্র ইসমায়েলকে উৎসর্গ করার উপাখ্যানের সাথে। পশু উৎসর্গ অত্যন্ত পুরোনো

পৌত্তলিক যজ্ঞ। মানুষ যাযাবর ছিলো, শিকারই যখন ছিলো জীবিকা, তখন তারা দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য পশু বলি দিতে শুরু করে। বাইবেলের আবেল ও কেইনের উপাখ্যানে এটা দেখতে পাওয়া যায়। *আদিপুস্তক*-এ আছে: হাওয়ার গর্ভে প্রথম জন্মে কেইন, পরে আবেল। আবেল ছিলো মেষপালক, এবং কেইন চাষী। চাষী কেইন ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করে তার জমির শস্য, আবেল উৎসর্গ করে পশু। ঈশ্বর আবেলের উৎসর্গ, পশু, গ্রহণ করেন; কিন্তু কেইনের উৎসর্গ, শস্য, গ্রহণ করেন না। এর ফলেই ঘটে প্রথম নর ও ভ্রাতৃহত্যা;—কেইন হত্যা করে ভাই আবেলকে। প্যালেস্টাইনের ঈশ্বর চাষী পছন্দ করেন না, তাঁর পছন্দ শিকারী, কেননা তিনি মূলত যাযাবরের বিধাতা। আরবসমাজ ছিলো গোত্রবদ্ধ, প্রত্যেক গোত্রের ছিলো নিজস্ব দেবদেবী; বেদুইনরাও বিশেষ বিশেষ স্থানে দেবদেবীদের পুজো করতো। ওই দেবদেবীদের প্রতীক ছিলো বিভিন্ন পাথর। ওই পাথরগুলো কখনো হতো মূর্তি, কখনো বিশাল পাথরখণ্ড। আস সাফা ও আল-মারওয়া পাহাড় দুটির নাম বোঝায় পাথর। আরবরা সৌভাগ্যলাভের জন্যে এ-দু-পাহাড়ে ছোটাছুটি ক'রে ছুঁতো ও চুমো খেতো দুই পাহাড়ে স্থাপিত ইসাফ ও নাইলার দুটি মূর্তি। দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট লিখেছেন, 'আরবরা পাথর পুজো করে'; ওই শতকেই ম্যাক্সিমাস টাইরিউস লিখেছেন, 'আমি জানি না আরবরা পুজো করে কোন দেবতার, যাকে তারা রূপায়িত করে একটি চতুর্ভুজ পাথররূপে।' মুসলমানরা তীর্থে গিয়ে চুমো খায় একটি কালোপাথরকে। এটি এক সময় নির্দেশ করতো উর্বরতা। মুসলমানরা বিশ্বাস করে এটি পড়েছে স্বর্গ থেকে। বিশ্বাসটি একেবারে ভুল নয়; যদিও ব্যাখ্যাটি ভুল; স্বর্গ থেকে না পড়লেও এটি পড়েছে আকাশ থেকেই; এটি একটি উল্কাপিণ্ড। আকাশে কি পাথর আছে? আছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানে ঘুরছে কিছু গ্রহাণু; এগুলোকে ভুলবশত অ্যাস্টিরয়িড বলা হ'লেও এগুলো তারা নয়, এগুলো অতিশয় ছোটো ছোটো গ্রহ। ১৮০১ অব্দের জানুয়ারি মাসের এক তারিখে প্রথম গ্রহাণুটি আবিষ্কার করেন ইতালীয় সন্ন্যাসী পিয়াস্‌সি। গ্রহাণুটির নাম সিরিস। তারপর দু-হাজারেরও বেশি গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর কক্ষপথ বেশ গোলমেলে, এবং কখনো কখনো কোনোটির সাথে অন্য কোনোটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে যে-টুকরোগুলো পৃথিবীর জলবায়ুতে প্রবেশ করে, সেগুলোকে বলা হয় উল্কা। তবে শুধু উল্কা নয়, পুরো কোনো গ্রাহাণুও এসে আঘাত করতে পারে পৃথিবীকে, এবং সেটা সৃষ্টি করতে পারে একটা বড়ো বিপর্যয়। বিজ্ঞানীরা এখন গ্রহাণুর সম্ভাব্য আঘাত নিয়ে নানা গবেষণা করছেন। ওই কালোপাথরটি একটি উল্কাপিণ্ড; তবে এখন যেটিকে চুমো খাওয়া হয়, সেটি হয়তো আসল পাথরটি নয়। চতুর্থ হিজরি শতকে কারম্যাশিয়ানরা (Qarmatian) আসলটি নিয়ে গিয়েছিলো, ফেরত দিয়েছিলো অনেক বছর পরে। অনেকের ধারণা তারা আসলটি ফেরত দেয় নি।

কালোপাথরটির পাশেই আছে আরেকটি লালবর্ণের পাথর, যার নাম *হুবাল*।

ধর্মগুলো দাবি করে ঈশ্বর নিজে, বা কোনো দেবদূতের মাধ্যমে প্রেরিতপুরুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর বাণী বা প্রত্যাদেশ। এটা বিশ্বাস করা ধর্মগুলোর অনুসারীদের জন্যে বাধ্যতামূলক। টমাস পেইন *এইজ অফ রিজন* বা *যুক্তির যুগ* গ্রন্থে বলেছেন :

> প্রত্যেক জাতীয় গির্জা বা ধর্ম এটার ভান করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে সেটি পেয়েছে ঈশ্বরের বিশেষ বাণী, যা জ্ঞাপন করা হয়েছে বিশেষ ব্যক্তির কাছে। ইহুদির আছে মোজেস; খ্রিস্টানদের আছে জেসাস ক্রাইস্ট, তার শিষ্য ও সন্তরা, এবং তুর্কিদের আছে তাদের মাহোমেট, যেনো ঈশ্বরের পথ সব মানুষের জন্যে সমভাবে খোলা নয়। প্রত্যেকটি গির্জা দেখিয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ, যেগুলোকে তারা বলে প্রত্যাদেশ, বা ঈশ্বরের বাণী। ইহুদিরা বলে ঈশ্বর মুসার কাছে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, দিয়েছেন তাদের ঈশ্বরের বাণী; খ্রিস্টানরা বলে তাদের ঈশ্বরের বাণী এসেছে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে; এবং তুর্কিরা বলে তাদের ঈশ্বরের বাণী স্বর্গ থেকে নিয়ে এসেছে একজন দেবদূত। ওই গির্জাগুলো একটি অন্যটিকে অবিশ্বাসী ব'লে অভিযুক্ত করে; এবং আমি নিজে এগুলোর প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাস করি।

প্রত্যাদেশ অসম্ভব ও কল্পিত ব্যাপার। কিন্তু যদি ধ'রেও নেই যে প্রত্যাদেশ সত্যি ঘটনা, বিধাতা সত্যিই দেখা দিয়েছেন কারো কাছে (অবশ্যই প্রাচীন কালে, আজ যদি কেউ দাবি করে সে প্রত্যাদেশ পেয়েছে, তাকে মানসিক রোগী মনে করা হবে, বা ধার্মিকরা তাকে খুন করবে), বা দেবদূতরা বিধাতার বাণী পৌঁছে দিয়েছে কারো কাছে, তাহলে ওই প্রত্যাদেশ শুধু তারই জন্যে প্রত্যাদেশ, অন্যদের জন্যে নয়। সে যখন তা অন্য কাউকে বলে, অন্যজন যখন তা বলে আরেকজনকে, এবং সে যখন তা বলে আরেকজনকে, তখন তা তাদের জন্যে প্রত্যাদেশ থাকে না, তা হয় শোনাকথা। প্রত্যাদেশগুলোতে আন্তর কোনো প্রমাণ থাকে না, যা প'ড়েই বোঝা যায় এগুলো বিধাতার বাণী। এগুলোতে থাকে বহু ভুল ও স্ববিরোধিতা; এগুলোতে থাকে কিছু সরল নীতিকথা, আর নির্দেশ, যার জন্যে বিধাতার দরকার পড়ে না। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষেরা অনেক উৎকৃষ্ট নীতিকথা আর বিধান সৃষ্টি করেছে। বিধাতার আচরণ অদ্ভুত, তিনি একজনের কাছেই দেখা দেন, বাণী পাঠান; আর সমগ্র মানবজাতি তার কাছে থেকে বিধাতার সত্য শেখে, এবং শিখতে গিয়ে তারা একজন মানুষের অনুগত হ'তে বাধ্য হয়। এক সময় তার স্থান দখল করে নানা প্রতিষ্ঠান; অর্থাৎ বিধাতা থেকে যান বিশেষ একদল মানুষের নিয়ন্ত্রণে।

বহু ধর্মে রয়েছে শেষবিচার নামে এক ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা, যার ভয়ে অনুসারীরা থাকে দুঃস্বপ্নে। নরক বিধাতার বন্দীশিবির। বলা হয় ওই দিন শিঙ্গা বেজে উঠবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে স্বর্গমর্ত্য, পাহাড়পর্বত ধুলোতে পরিণত হবে, আকাশ

হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, বলক দিতে থাকবে সমুদ্ররাশি, আর কবর থেকে বিচারের জন্যে বেরিয়ে আসবে সমস্ত মানুষ। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা হবে তাদের পাপপুণ্য, এবং বিচার করবেন বিধাতা। কারো জন্যে নির্ধারিত হবে চিরস্বর্গ, কারো জন্যে চিরনরক। বিচারের জন্যে নরনারীরা পুনরুজ্জীবিত হবে, অর্থাৎ তারা ফিরে পাবে তাদের পার্থিব শরীর। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে মৃতরা? যারা প'চে গেছে, বিনষ্ট হয়ে গেছে যাদের অস্থিমাংস আর অন্ত্রতন্ত্র, যারা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারা কীভাবে ফিরে পাবে শরীর? যারা হারিয়ে গেছে সমুদ্রে, যারা গেছে বাঘভাল্লুকের পেটে, কীভাবে পাওয়া যাবে তাদের? বলা হয় শেষবিচারের দিনে সবাইকে জাগানো হবে পার্থিব শরীরে। বলা হয় কিছুই অসম্ভব নয় বিধাতার পক্ষে, তিনি সব পারেন। তিনি সব পারেন, কিন্তু একটি ছোট সমস্যা রয়েছে; কেউ ম'রে যাওয়ার, মাটিতে মিশে যাওয়ার কোটি কোটি বছর পর, মনে করা যাক, অবিকল তাকে সৃষ্টি করা হলো; কিন্তু তখন তো সে আগের মানুষটি নয়, সে অন্য এক মানুষ, বা আগের মানুষটির অবিকল নকল। একজনের পাপপুণ্যের জন্যে তার অবিকল নকলকে স্বর্গে বা নরকে পাঠানো হচ্ছে অবিকল যমজ ভাইদের একজনের পাপপুণ্যের জন্যে আরেকজনকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার মতো অন্যায়। আজকাল একজনের প্রত্যঙ্গ আরেকজনের শরীরে সংযোজন করা হয়। মনে মরা যাক এক পাপী এক পুণ্যবানের হৃৎপিণ্ড ধারণ ক'রে বেঁচে রইলো, এবং মারা গেলো পুণ্যবানের হৃৎপিণ্ড নিয়েই। শেষ বিচারের দিনে এক পাপীর পাপের জন্যে কি শাস্তি পাবে পুণ্যবানের হৃৎপিণ্ড? তাকে পুনরুজ্জীবিত করার সময় সম্পন্ন করা হবে আরেকটি শল্য চিকিৎসা, পাপীর আগের হৃৎপিণ্ড এনে লাগানো হবে? কী হবে পুণ্যবান ব্যক্তিটির, যাকে কবর দেয়া হয়েছে হৃৎপিণ্ড ছাড়াই? পরলোক হাস্যকর কল্পনা। মানুষ মরতে ভয় পায় ব'লে উদ্ভাবন করেছে পরলোক-স্বর্গনরক। পরলোক হচ্ছে জীবনের বিরুদ্ধে এক অশ্লীল কুৎসা; পরলোকের কথা বলা হচ্ছে জীবনকে অপমান করা। পরলোকে বিশ্বাস জীবনকে ক'রে তোলে নিরর্থক।

ধর্মের ভিত্তি, শুনতে সুখকর না লাগলেও, লালসা ও ভীতি। রাসেল বলেছেন :

> ধর্ম, আমার মনে হয়, প্রথমত ও প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে ভয়ের ওপর ভিত্তি ক'রে। এর অংশবিশেষ হচ্ছে এমন বোধ যে আমার রয়েছে এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা, যে বিপদাপদে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটির ভিত্তি হচ্ছে ভয়—অলৌকিকের ভয়, পরাজয়ের ভয়, মৃত্যুর ভয়। ভয় নিষ্ঠুরতার জনক, এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে নিষ্ঠুরতা ও ধর্ম এগিয়েছে হাতে-হাত ধ'রে।

সব ধর্মের নৈতিকতার ভিত্তি ভয়। বহু ধর্মে বিধাতা চরম ক্রুদ্ধ ও হিংস্র; ক্রুদ্ধ ও হিংস্র হয়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ নেই; অবিশ্বাসীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে তিনি ব্যগ্র, এবং বিশ্বাসীকেও সব সময় রাখেন ভীতির মধ্যে। বিশ্বাসী

কোনো উন্নত নৈতিকতাবোধ দিয়ে চালিত হয় না; সে ভয়েই করে পুণ্যকাজ, এবং থাকে সম্পূর্ণ অনুগত। ভয় আর লালসা দূষিত করে সব ধরনের নৈতিকতাকে। ধর্মীয় নৈতিকতা থেকে মানবিক নৈতিকতা অনেক উন্নত। অনেকে বলে ধর্ম আছে ব'লেই সমাজ চলছে; এটা বাজে কথা; ধর্ম না থাকলে সমাজ আরো ভালোভাবে চলতো। অনেকে বলে ধর্ম মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু এর উপকারিতা আছে; কেননা ধর্ম ভালোমন্দ শেখায়, মানুষকে সৎপথে চালায়। এ-যুক্তি খুবই আপত্তিকর, কেননা এটা মানুষকে যুক্তিহীন করে, আর উৎসাহিত করে ভণ্ডামোকে; বর্জন করে সত্যকে। ধর্ম যে মানুষকে ভালোমন্দ শেখায় না, সৎপথে চালায় না; তার প্রমাণ চিরকালই দেখা গেছে, এবং আজকাল খুবই বেদনাদায়কভাবে দেখা যাচ্ছে। ধর্মের নৈতিকতার সাথে মানবিক নৈতিকতার তুলনা করলে ধরা পড়ে যে ধর্মীয় নৈতিকতার মূলে নৈতিকতা নেই, রয়েছে স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ; আর মানবিক নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে কল্যাণ। মুসলমানদের শুয়োর খাওয়া আর হিন্দুর গরু খাওয়া পাপ; এর মূলে কোনো নীতিবোধ নেই, এটা স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ। ইসলামে কবি ও চিত্রকর নিষিদ্ধ; তাই আধুনিক বিশ্বের প্রায় সব কিছুই নিষিদ্ধ ইসলামে; এ-নিষিদ্ধকরণের পেছনে কোনো নীতিবোধ কাজ করে নি, কাজ করেছে কবিতা ও চিত্র সম্পর্কে ভুল ধারণা। চুরির অপরাধে হাত কেটে ফেলা বা অবিবাহিত সঙ্গমের জন্যে পাথর ছুড়ে হত্যা নীতির দিক থেকে অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু ধর্মে একেই মনে করা হয় নৈতিকতা। ধর্ম গভীর মানবিক নৈতিকতা বোঝে না, বোঝে কতকগুলো মোটা দাগের আদেশ পালনের নৈতিকতা। দস্তয়ভস্কির এক নায়ক বলেছে তাকে যদি বলা হয় একটি শিশুকে হত্যা করা হ'লে দেশের সবাই চিরসুখে থাকবে, তাহলেও সে ওই শিশুকে হত্যা করবে না, কেননা তা তার কাছে অনৈতিক কাজ। ধর্ম এ-ধরনের নৈতিকতা বোঝে না; মনে করে যে কুলুপ লাগায় সে নৈতিক, যে লাগায় না সে অনৈতিক। ধর্মীয় নৈতিকতা কখনো কখনো খুবই হাস্যকর। ইসলামে পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকাকে নৈতিক কাজ ব'লে মনে করা হয় (কিন্তু প্রকাশ্যে কুলুপ ধ'রে হাঁটাহাঁটি ক'রে পা ঝাঁকানো পেরিয়ে যায় শ্লীলতার সীমা), আর খ্রিস্টধর্মে নোংরা থাকাই নৈতিকতা। খ্রিস্টীয় গির্জা স্নানের ব্যাপারটিকে আক্রমণ করেছে এজন্যে যে যা-কিছু দেহকে আকর্ষণীয় করে, তাই মানুষকে ঠেলে দেয় পাপের পথে। সৌন্দর্য, সন্তদের বিশ্বাস, পাপের উৎস; সৌন্দর্য থেকেই জন্মে কাম, কাম থেকে জন্মে মানুষের আদি ও অন্তিম পাপ। খ্রিস্টীয় চার্চ প্রশংসা করে অপরিচ্ছন্নতার, কেননা নোংরা মানুষ কাম জাগায় না, কাউকে পাপিষ্ঠ করে না। সন্ত পলা বলেছেন, 'দেহ ও বস্ত্রের পবিত্রতা বোঝায় আত্মার অপবিত্রতা। সন্তরা উঁকুনকে বলতো বিধাতার মুক্তো; উঁকুনখচিত থাকা ছিলো সন্ততার শংসাপত্র। কোনো কোনো ধর্মে উপাসনার আগে বিশেষ পদ্ধতিতে দেহ পরিচ্ছন্ন করার রীতি রয়েছে; তবে ওটা দেহকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য নয়, শয়তান তাড়ানোর জন্যে, যে-শয়তান কোথাও নেই।

ধর্মের ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের, এর মধ্যে অজস্র ধর্ম প্রচারিত হয়েছে ও বাতিল হয়ে গেছে; কিন্তু মানুষ আছে কোটি বছর আগে থেকে, টিকে থাকবে বহু কোটি বছর। পৃথিবী ধ্বংসের আগে মানুষ হয়তো অন্য কোথাও পাড়ি জমাবে; —মানুষের সম্ভাবনা অনন্ত, দেবতাদের থেকে মানুষ অনেক বেশি প্রতিভাবান। পাঁচ হাজার বছর, তিন হাজার, দেড় হাজার বছরকে চিরকাল মনে করার কারণ নেই। মানুষ দেবতার পর দেবতা তৈরি করেছে, এবং ছেড়েছে; তাতে দেবতাদের কিছু যায় আসে নি, তারা জানেই না তারা উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু অনেক এসে গেছে মানুষের। ভবিষ্যৎমুখী মানুষকে বিপুল লড়াই করতে হয়েছে ধর্মের সাথে; ধর্ম না থাকলে মানুষ আরো অনেক এগোতো। দেবতারা কখনো দেখা দেয় নি, কখনো পীড়ন করে নি মানুষকে; কিন্তু ধর্মকে চিরকালই একগোত্র মানুষ ব্যবহার করেছে অস্ত্ররূপে। ধর্মের পক্ষে যারা, তারা বিশেষ স্বার্থেই ধর্মের পক্ষে; যারা বিপক্ষে. তাদের কোনো স্বার্থ নেই; তাদের স্বার্থ মানুষের বিকাশ। আগামী দু-এক শতকের মধ্যেই মানুষ মুক্ত হবে ধর্মের কবল থেকে। কোনো ধর্মই মানুষের শুরু থেকে ছিলো না ও শেষ পর্যন্ত থাকবে না। ধর্মের প্রধান ক্ষতিকর দিক হচ্ছে ধর্ম বিভেদ সৃষ্টি করে; মানুষকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ ক'রে দেয়, সৃষ্টি করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা। কোনো সুষম ধর্মও নেই, প্রতিটি ধর্ম বিভক্ত নানা শাখা ও উপশাখায়; ওই শাখা-উপশাখাগুলো ঘৃণা করে পরস্পরকে। মানুষ ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত; এবং বিশেষ ধর্মের মানুষ আক্রান্ত ওই ধর্মের মানুষদের দ্বারা; মুসলমান আক্রান্ত মুসলমান দ্বারা, হিন্দু হিন্দু দ্বারা; তাই মুসলমানের হাত থেকে মুসলমানকে, হিন্দুর হাত থেকে হিন্দুকে বাঁচানো দরকার। ধর্মের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষকে হয়ে উঠতে হবে মানুষ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন

বহুদেবতারা আজ পরাজিত, জয়ী আজ সর্বশক্তিধর একদেবতা; এখন চলছে একদেবতার কাল। এমনকি যারা পুজো করে বহুদেবতার, তারা মনে করে বা যখন স্রষ্টা কে নিয়ে তর্ক দেখা দেয়, তারাও নির্দ্বিধায় বলে স্রষ্টা বা বিধাতা একজনই। বহুদেবতায় বিশ্বাস করা আজকাল গৌরবজনক নয়; এটা অত্যন্ত অনাধুনিক ব্যাপার, আধুনিক হচ্ছে একদেবতায় বিশ্বাস। আমি বলেছি একদেবতা, এটা কোনো কোনো ধর্মের বিশ্বাসীদের কাছে মনে হ'তে পারে আপত্তিকর, কারণ তারা বিশ্বাস করে তারা দেবতায় বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে বিধাতায়, স্রষ্টায়, একেশ্বরে, পরমসত্তায়, বা অন্য কোনো নামের স্রষ্টায়। তাদের প্রত্যেক ধর্মের স্রষ্টার রয়েছে বিশেষ নাম ধর্মের প্রবর্তকের ভাষায়। তবে বিধাতা বা ঈশ্বর, বা যে-নামই হোক তাদের স্রষ্টার, তিনি দেবতাই। এসব বিশ্বাসে বহুদেবতা পরাজিত হয়ে জয়ী হয়েছেন একজন দেবতা। দেবতারা কি করেছেন কোনো মাহাজগতিক মহাযুদ্ধ, আর ওই মহাযুদ্ধে কি জয়ী হয়েছেন একজন দেবতা, যাঁর শক্তির কোনো সীমা নেই? তিনি কি জয়ী হয়ে মহাজগত জুড়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর রাজত্ব, এবং মহাজগত জুড়ে প্রচার করেছেন তাঁর বিজয়সংবাদ? তিনি কি সবাইকে বাধ্য করেছেন তাঁর প্রতি অনুগত হ'তে? না, এতে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই, এতে সব ভূমিকা মানুষের; মানুষই অজস্র দেবতাদের বর্জন ক'রে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে বিশেষ একটি দেবতার। ঘটনাটি অবশ্য আধুনিক নয়, ঘটনাটি অত্যন্ত অনাধুনিক, ঘটেছিলো তিন হাজার বছর আগে। অগ্নি-উপাসক জুরথুস্ত্রীয়রাই প্রথম কল্পনা করেছিলো একদেবতা, একদেবতা কল্পনা করেছিলো ব্যাবিলনীয়রাও, এমনও হ'তে পারে তারা একাদেবতা ধার করেছিলো অগ্নিপূজারী পারস্য থেকেই; আর প্যালেস্টাইনের ইহুদিরা প্রথম আবিষ্কার করে এক প্রচণ্ড হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণ একদবেতা। হিব্রুদের একদেবতা সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, তারা পারস্য আর ব্যাবিলন থেকে একে ধার করে, এবং ক'রে তোলে প্রচণ্ড। আরো দুটি ধর্ম গ্রহণ করে একদেবতা; তারা প্রবর্তকের ভাষায় তাঁর নাম দেয়।

তারা আর তাঁকে দেবতা বলে না, দেবতাদের তারা প্রচণ্ড বিরোধী। তবে তাঁর নাম অভিন্ন নয়, বিভিন্ন। তাঁকে আর দেবতা বলা হয় না, বলা হয় স্রষ্টা বা

বিধাতা। কিন্তু যে-ধর্মগুলো বিশ্বাস করে একদেবতা বা একবিধাতায়, তারা কি নির্দিষ্ট অভিন্ন একটি বিধাতায়ই বিশ্বাস করে? না; তাদের বিশ্বাস অভিন্ন নয়, বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস করে বিভিন্ন বিধাতায়; ইহুদি বা খ্রিস্টান বা মুসলমানের বা হিন্দুর বা অন্য কোনো ধর্মের বিধাতা অভিন্ন সত্তা নন; তাদের প্রত্যেকের বিধাতার সত্তা ও গুণাবলি বিভিন্ন। ইহুদি যে-বিধাতার আরাধনা করে সিনেগগে, মুসলমান তাঁর উপাসনা করে না; খ্রিস্টান যাঁরা উপাসনা করে, হিন্দু তাঁর পুজো করে না। তাদের প্রত্যেকের বিধাতা ভিন্ন। তাই দেখতে পাই পৃথিবীর ধর্মগুলো একটি-একটি ক'রে বিশ্বাস করছে বেশ কয়েকটি বিধাতায়; আর ওই বিধাতারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বহুদেবতাবাদ চ'লে গেলেও আজো পৃথিবীকে শাসন করছেন কয়েকটি বিধাতা, যাঁদের মধ্যে মিল থাকলেও বিশ্বাসীরা ওই মিলগুলো মানতে অস্বীকার করে। বিশ্বাসীরা কিছুতেই মানবে না যে তাদের বিধাতার ধারণাটি এসেছে অন্য একটি ধর্মের বিধাতার ধারণা থেকে; বরং তারা মনে করে তাদের বিধাতাই একমাত্র বিধাতা, অন্য বিধাতারা মিথ্যে। কিন্তু বিশ্বাসের যে-পরিস্থিতি তাতে দেখা যায় পৃথিবীর মানুষেরা বিশ্বাস করে বেশ কয়েকটি বিধাতায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাদের বলেছেন আরণ্যিক নির্বোধ, তারা অজস্র দেবতা উদ্ভাবনা করেছিলো; এবং যুগে যুগে নিজেদের রুচি আর স্বার্থ অনুসারে স্বর্গচ্যুত করেছিলো অজস্র দেবতাকে। কোনো দেবতাই অবিনশ্বর নয়; দেবতারা জন্ম নিয়েছে আর রাজত্ব করেছে তাদের ভক্ত বা উদ্ভাবকদের পরিকল্পনা অনুসারে। মানুষের দেবতাচিন্তায় দুটি প্রবণতা চোখে পড়ে। একটি হচ্ছে; প্রথম তারা কল্পনা করেছিলো দেবী; বোঝা যায় তখন সমাজে প্রধান ছিলো নারীরা; তাই তারা উদ্ভাবন করেছিলো নিজেদেরই লিঙ্গের দেবতা, অর্থাৎ দেবী। পরে যখন প্রধান হয়ে ওঠে পুরুষ, বন্দী ক'রে ফেলে নারীদের, তখন দেবীদের হটিয়ে তারা উদ্ভাবন করে পুরুষ দেবতা। সামাজে পুরুষতন্ত্রের উত্থানের সাথে আকাশেও উত্থান ঘটে পুরুষতন্ত্রের। দেবতাচিন্তায় দ্বিতীয় প্রবণতাটি হচ্ছে বহুদেবতার বদলে একদেবতার উদ্ভাবন। একদেবতা বা বিধাতা কি উৎকৃষ্ট বহুদেবতার থেকে? এদের কোনোটি উৎকৃষ্ট নয় অন্যটির থেকে; দুটিই সমান আদিম অপকল্পনার ফল। তবে বহুদেবতা বাদ দিয়ে একদেবতা বা বিধাতা কল্পনা নির্দেশ করে মানুষের প্রকৃতির একটি ভয়ঙ্কর প্রবণতা; মানুষ এতে বহুবচনতা থেকে এগোয় একবচনতার দিকে, তার চিন্তা হয়ে ওঠে স্বৈরাচারপরায়ণ। একদেবতাবাদ বা বিধাতাবাদ নিয়ন্ত্রণপরায়ণ, তা মানুষকে দিতে চায় না কোনো স্বাধীনতা; ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। ব্যক্তি সঙ্গমও স্বাধীন থাকে না, প্রার্থনায়ও স্বাধীনতা থাকে না। বহুদেবতা এতোটা নিয়ন্ত্রণ করে না। ইহুদিরাই প্রথম কল্পনা করেছিলো প্রচণ্ড স্বৈরাচারী প্রতিহিংসাপরায়ণ একদেবতা, আর তাদের প্রভাব রয়েছে যে-সব

বিধাতাকল্পনায় তাতে দয়াময়তা নয়, নির্মমতাই বিধাতার প্রধান গুণ। মানুষ কেনো বেশ গণতান্ত্রিক বহুদেবতা ছেড়ে গ্রহণ করলো স্বৈরতান্ত্রিক একদেবতাবাদ বা বিধাতাবাদ? বহুদেবতাবাদ কল্পিত হয়েছিলো মুক্ত সমাজে, যেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রধান আনন্দ হয়ে ওঠে নি সমাজপতিদের, যেখানে মানুষ যাপন করতো তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীন জীবন; আর একদেবতাবাদ বা বিধাতাবাদ কল্পিত হয় স্বৈরাচারপরায়ণ পুরুষপ্রধান পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে কোনো কিছুই পিতা বা পুরুষের কঠোর মুঠোর বাইরে নয়, তাই কোনো কিছুই বিধাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। পিতৃতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিমান স্বৈরাচারীর পিতা বিধাতা।

বিধাতা কেনো হবেন প্রচণ্ড, হিংস্র, ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ; কেনো তিনি উত্তেজিত থাকবেন তাঁর সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্যে? তিনি কেনো উদ্ভাবন করবেন নরকের পর স্তরে স্তরে নরক, এবং তাতে দগ্ধ করবেন তাঁর সৃষ্টিকে? তিনি কেনো হবেন এতো পীড়নকামী? শাস্তি দেয়াই কি তাঁর চরম সুখ? মনোবিজ্ঞান কীভাবে করবে তাঁর মনোবিশ্লেষণ? তাঁকে কি বিবেচনা করা হবে সুস্থ স্বাভাবিক? মানুষের নির্মমতার কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে কালিগুলা, হিটলার, স্তালিন, ইয়াহিয়া; তিনি কি তাদেরই চূড়ান্ত মহাজাগতিক আদিরূপ? আমরা কি সুখ পাই প্রিয়দের শাস্তি দিয়ে? আমরা কি সারাক্ষণ ব্যগ্র পুত্রকন্যাদের, প্রিয় বেড়াল বা কুকুরটিকে, শাস্তি দেয়ার জন্যে? সারাক্ষণ হিশেব নিই তাদের ক্রিয়াকলাপের? আজ থেকে তিন দশক আগের পিতারা সন্তানদের যতোটা শাস্তি দিতো, এখনকার পিতারা ততোটা দেয় না; দিলে প্রতিবেশীরা তা মেনে নেয় না। বিধাতাকে যারা হিংস্র প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ সত্তারূপে কল্পনা করেছে তাদের মানসিক জগত ভ'রে রাজত্ব করছিলো কোনো দুঃস্বপ্ন? হিংস্রতার প্রচণ্ডতা প্রতিহিংসাপরায়ণতাই কি দরকার ছিলো তাদের? ইহুদিরা হিংস্র বিধাতার দরকার বোধ করেছিলো প্রথম। তাদের দরকার ছিলো চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত; তাদের বিধাতা মিটিয়েছে তাদের অভিলাষ। *আদি বাইবেল*-এ বলা হয়েছে যে পরাজিত জাতিদের নির্মূল করতে হবে, মেষ আর গাভীও রক্ষা পাবে না। বিধাতাকে হিংস্ররূপে কল্পনা করেছে যে-সমাজ বা যে-প্রবর্তক, তার কাছে হিংস্রতাই মানুষকে দমন করার উপায় ব'লে মনে হয়েছে। আমরা ওই সমাজ ও প্রবর্তকদের মনোবিশ্লেষণ করতে পারি। রাসেল *অপ্রিয় প্রবন্ধাবলিতে* বলেছেন :

> বিষাদগ্রস্ত যে-সন্তরা নিজেদের বিরত রাখতেন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত সুখ থেকে, বাস করতেন মরুভূমির জনহীনতায়, বর্জন করতেন মাংস ও মদ্য ও নারীসাহচর্য, তাঁরা অবশ্য সব ধরনের সুখ থেকে নিজেদের বিরত রাখতেন না। মনের সুখকে বিবেচনা করা হতো দেহের সুখের থেকে অনেক উৎকৃষ্ট, আর মনের সুখের মধ্যে উচ্চস্থানে ছিলো চিরশাস্তি সম্পর্কে নিরন্তর চিন্তাভাবনা, যা দেয়া হবে সর্বেশ্বরবাদী ও নাস্তিকদের।

রাসেল বলতে চান যে প্রচণ্ড বিধাতা বিকৃত মনোব্যাধিগ্রস্ত কামক্ষুধার্ত সন্তদের কল্পনা। ইন্দ্রিয়সুখ থেকে বঞ্চিত মানুষ সুস্থ হ'তে পারে না; তাই 'বিধাতার মুক্তোখচিত' সন্তরা নিজেদের অপরিতৃপ্ত কামের ক্ষতিপূরণের জন্যে কল্পনা ক'রে চলতেন প্রচণ্ড নরক। তাঁদের অতৃপ্ত কাম জ্ব'লে উঠেছে প্রচণ্ড নরকরূপে।

বিধাতাকল্পনায় হিংস্রতার পর বড়ো ক'রে তোলা হয়েছে তাঁর স্তুতিপ্রিয়তা। সব ধর্মেই বিধাতার প্রিয় স্তাবকতা, স্তুতি; তিনি পছন্দ করেন নিরর্থক বন্দনা; প্রহরে প্রহরে তাঁর বন্দনা করতে হয়, নইলে তিনি সুখী হন না। তাঁকে স্তুতি করার জন্যে রচিত হয়েছে মানবভাষার বিপুল বাক্যসম্ভার। ওই স্তাবকতা বা বন্দনার শ্লোকগুলো খুব উৎকৃষ্ট নয়; নারীর উদ্দেশে এগুলোর থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট শ্লোক লিখেছে পুরুষ। *আদি বাইবেল*-এই দেখতে পাই অজস্র ঈশ্বরস্তুতির থেকে অনেক উৎকৃষ্ট ও অবিস্মরণীয় শলোমনের পরমগীত, যাতে বন্দনা করা হয়েছে দয়িতাকে। মহাজগতের মতো অনন্ত অসীমের স্রষ্টা যিনি, তিনি কী ক'রে উপভোগ করতে পারেন তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছ স্তাবকতা, তুচ্ছ স্তুতি; কী ক'রে তিনি সুখী হ'তে পারেন এই সব তুচ্ছ কানাকড়িতে? সামারসেট মম্ *সামিং আপ* বইটিতে তাঁর এক পুরোহিত বন্ধুর কথা বলেছেন, যিনি তাঁর ভাষণ থেকে বাদ দিয়েছিলেন বিধাতার সমস্ত স্তুতি। মম্ বিস্মিত হয়ে জানতে চান কেনো বিধাতাকে একবারও প্রশংসা করা হলো না? পুরোহিত বন্ধু বলেন মহান বিধাতা তুচ্ছ ভূস্বামীর মতো স্তাবকতা পছন্দ করতে পারেন না ব'লেই তাঁর বিশ্বাস, তাই তিনি কখনো বিধাতার স্তুতি করেন না। তবে বিভিন্ন ধর্মে বিধাতাকে পরিণত করা হয়েছে এক ক্রুদ্ধ হিংস্র স্তাবকপ্রিয় ভূস্বামীতে। আমরা কি এমন মানুষ কল্পনা করতে পারি, যে পছন্দ করে দিনরাত বন্দনা বা স্তুতি স্তাবকতা? নিরন্তর নিরর্থক স্তাবকতায় যেখানে অন্তঃসারশূন্য মানুষও ক্লান্তি ও ঘেন্না বোধ করবে, সেখানে কী ক'রে তা সহ্য ও উপভোগ করেন বিধাতা? বিশ্বাসীরা বিধাতার ওপর মহত্ত্ব আরোপ করতে গিয়ে, তাঁকে বিশাল ক'রে সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁকে ক'রে তুলেছে নিজেদের মতোই ক্ষুদ্র ও মহত্ত্বহীন। বিধাতা যদি সত্যিই বন্দনা চাইতেন, তাহলে তিনি শূন্য রাখতেন না মহাজগতকে; শুধু একটি ছোটো গ্রহে মানুষ সৃষ্টি করতেন না; মহাজগত ভ'রেই সৃষ্টি করতেন মানুষ, শুনতেন তাদের উচ্চকণ্ঠ বন্দনা। মানুষের বন্দনায় তাঁর কী দরকার? তিনি নক্ষত্রদের দিয়ে বন্দনা করাতে পারতেন, বন্দনা করাতে পারতেন নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে। মহাজগতে সূর্য এক তুচ্ছ তারা, পৃথিবী এক তুচ্ছ গ্রহ, মানুষ এক তুচ্ছ প্রাণী। মহাজগতের স্রষ্টা এতো তুচ্ছকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্তুতির জন্যে? এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিধাতাকল্পনা করতে গিয়ে মানুষ বিধাতাকে নিজের মতোই তুচ্ছ আর ক্ষুদ্র ক'রে তুলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি আদৌ আছেন বা তাঁরা কি সত্যিই আছেন? থাকলে কার কল্পনারটি আছেন? ইহুদির? খ্রিস্টানের? মুসলমানের? হিন্দুর? না কি আছেন সকলেরই কল্পনার বিধাতা? না কি তিনি সুধীন্দ্রনাথের আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত

দুঃস্বপন? তিনি আছেন কি নেই, এটা ইহুদি বা মুসলমান তাত্ত্বিকদের বিবেচনার কোনো বিষয় হয় নি। তাঁরা ধ'রে নিয়েছেন তিনি আছেন। তাঁকে প্রমাণ করার কোনো দরকার নেই। তাঁদের প্রশ্নহীনতা একদিকে ভালোই, কেননা বিধাতাকে প্রমাণ করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। বই বলেছে তিনি আছেন, তাই তিনি আছেন। তাঁরা বিধাতার উক্তি দিয়েই প্রমাণ করেন যে তিনি আছেন। তবে খ্রিস্টান কোনো কোনো সন্ত প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিধাতা আছেন। কিন্তু বিধাতা কি প্রমাণের বস্তু, তিনি কি দর্শনের বিষয়? পদার্থবিজ্ঞানের বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে কি প্রমাণ করতে হবে বিধাতাকে, বা আবিষ্কার করতে হবে তাঁকে? খ্রিস্টীয় কোনো কোনো সন্ত প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন খ্রিস্টীয় বিধাতাকে; যেমন সন্ত আনসেল্‌ম (১০৩৩-১১০৯), টমাস আকুইনাস (১২২৫-১২৭৪); সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিলেন কেউ কেউ, যেমন, ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬); এবং বিধাতাকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছিলেন নিট্‌শে (১৮৪৪-১৯০০)।

আনসেল্‌ম বিশ্বাসী ছিলেন, এবং ছিলেন ক্যান্টারবেরির মহাপুরোহিত; এবং তিনি অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন মাত্র একটি যুক্তি দিয়ে। বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে তিনি বের করতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র একটি যুক্তি, যেটি নিজেই প্রমাণ করবে নিজেকে, যেটিকে প্রমাণের জন্যে দরকার হবে না আর কোনো যুক্তি; আর ওই যুক্তিটিই প্রমাণ করবে যে বিধাতা সত্যিই আছেন। খুবই অসাধারণ তাঁর অভিলাষ। দু-দুটি বাইবেল ও আরো অজস্র গীতা আর সংহিতা যা প্রমাণ করতে পারছে না, আনসেল্‌ম এক স্বপ্রমাণিত যুক্তির সাহায্যেই প্রমাণ করবেন তাঁকে। তাঁর যুক্তিকে বলা হয় অস্তিত্বস্বরূপযুক্তি; কেননা এতে কোনো বাইরের প্রমাণ দরকার হয় না, এ-যুক্তি শুরু ও সমাপ্ত হয় বিধাতার স্বরূপ দিয়ে। তবে তাঁর যুক্তি বিশ্বাসীর বাজে যুক্তি। আনসেল্‌মের যুক্তি হচ্ছে বিধাতার প্রকৃতি বা স্বরূপ ভালোভাবে বিচার করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিধাতা অবশ্যই আছেন। তিনি বিধাতার সংজ্ঞা দেন : বিধাতা এমন সত্তা, যাঁর থেকে মহত্তর আর কিছু উপলব্ধি করা যায় না। বিধাতাকে দেখা যায় না, আমরা চাইলেই তাঁকে দেখতে পাই না; কারণ তিনি জাগতিক সব কিছু থেকে ভিন্ন। কিন্তু তিনি কেমন? আমরা যারা সাধারণ, তারা তাঁর প্রমাণ পেতে চাই; কিন্তু আনসেল্‌মের মতো অসাধারণেরা প্রমাণ চান না, চিন্তাভাবনাই যথেষ্ট তাদের জন্যে; এবং আনসেল্‌ম বিধাতার স্বরূপ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা ক'রেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে অবশ্যই বিধাতা আছেন। শুধু ভাবনা ক'রেই কি আমরা কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি? আমরা তো অনেক কিছুই ভাবি, কল্পনা করি, যা ছিলো না, নেই, এবং থাকবে না। আমাদের ভাবনার ফলে কি সে-সব জিনিশ সত্য হয়ে ওঠে? ভাবনায় অস্তিত্বশীল বিধাতা বলতে কী বোঝায়? আমরা বুঝি যে তিনি কারো কারো ভাবনায় আছেন, তাদের মনে তিনি অস্তিত্বশীল; কিন্তু বাস্তবে বা মহাজগতে তিনি কোথাও নেই।

এর উত্তরে কী বলেন আনসেল্‌ম? তিনি যা বলেন, তা খুবই হাস্যকর বাজেকথা। বিধাতা সত্যিই আছেন, এটা প্রমাণ করেন তিনি এ-যুক্তি দিয়ে যে বিধাতা নেই একথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, তাই বিধাতা আছেন। রাসেলের একটি প্রবন্ধ রয়েছে 'অ্যান আউটলাইন অফ ইন্টেলেকচুয়াল রাবিশ'—'বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনার রূপরেখা' নামে; আনসেল্‌মের যুক্তিকেও বলতে পারি বুদ্ধিজাত আবর্জনা। আনসেল্‌ম বলেন, বিধাতা এমন সত্তা, যাঁর থেকে মহত্তর আর কিছু উপলব্ধি করা যায় না, তাই বিধাতা শুধু উপলব্ধিতেই থাকতে পারেন না; তাই তিনি আছেন বাস্তবেও। তাঁর মতে বিধাতা ছাড়া আর সব কিছুকেই আমরা নেই ব'লে বোধ করতে পারি, কিন্তু বিধাতার সংজ্ঞা—বিধাতা এমন সত্তা, যাঁর থেকে মহত্তর আর কিছু উপলব্ধি করা যায় না—অর্থপূর্ণ হয় না যদি বিধাতা না থাকেন। তাই তাঁর মতে যারা বিধাতার স্বরূপ উপলব্ধি করে তাদের পক্ষে বিধাতা নেই এটা উপলব্ধি করা অসম্ভব। খুবই বাজে যুক্তি, বিশ্বাসীরা সাধারণত দিয়ে থাকেন এ-ধরনের যুক্তিই।

আনসেল্‌মের যুক্তির ভেতরে একটা মজা আছে—মজাটি হচ্ছে যে আমি দাবি করতে পারি যে বিধাতার স্বরূপ আমি বুঝি না; তবে আমি যদি দাবি করি যে বিধাতা কী জিনিশ তা আমি বুঝি, তখন আর আমি তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর বিধাতার সংজ্ঞা হচ্ছে বিধাতা এমন সত্তা, যাঁর থেকে মহত্তর আর কিছু উপলব্ধি করা যায় না; আর আমি যদি এ-সংজ্ঞাটি বুঝি তাহলে বিধাতা নেই এটা আর আমি উপলব্ধি করতে পারি না। বিধাতা কি বিরাজ করতে পারেন বিশেষ স্থানে ও কালে? না, তিনি পারেন না; অর্থাৎ স্থান ও কালের পক্ষে বিধাতাকে ধারণ করা সম্ভব নয়, কেননা তিনি এসবের থেকে মহত্তর। আনসেল্‌মের বিধাতার অস্তিত্ববাচক যুক্তি যতোটা যুক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি ধাঁধা; তাই তাঁর প্রমাণ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিলো শুরুতেই। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বিধাতার অস্তিত্ব। শুধু যুক্তি দিয়েই যদি আমরা কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি, তাহলে আমরা এমন অনেক কিছু আছে ব'লে প্রমাণ করতে পারি, যা আসলে নেই। কোনো কিছু কল্পনা করা আর তার অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে মৌল পার্থক্য। মানুষ অস্তিত্বহীন অনেক কিছুই কল্পনা করতে পারে, কিন্তু তাতে তা অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে না। আমি কল্পনা করতে পারি যে আমাদের পরিচারিকাটির চারটি লাল ডানা আছে, রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন যে ওই মহামানব আসে, কিন্তু তাতে চার ডানার পরিচারিকা ও মহামানব অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে না। সত্য বস্তু আর তার ভাবনা এক নয়।

টমাস আকুইনাস, উপাধিপ্রাপ্ত সন্ত, ছিলেন রোমীয় ক্যাথলিক গির্জার দর্শনগুরু ও ধর্মতাত্ত্বিক; তিনি অ্যারিস্ততলের দর্শনের সাথে মিলিয়েছিলেন খ্রিস্টধর্মকে। ধর্মতাত্ত্বিকদের দায়িত্ব তাঁদের ধর্মের বিশ্বাসগুলো প্রতিষ্ঠিত করা,

এবং প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অজস্র অপযুক্তির উদ্ভাবন। আকুইনাস তাই করেছিলেন দার্শনিকের বেশে। তাঁর দায়িত্ব ছিলো বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণ, তাই নানা যুক্তি তিনি বের করেছিলেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব কি দর্শন? এটা ভাবিয়েছিলো আকুইনাসকে। তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন যে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে: দার্শনিক সত্য উদঘাটন করেন যুক্তির মাধ্যমে, আর ধর্মতাত্ত্বিক শুধু যুক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, তিনি মেনে নেন প্রত্যাদেশকে, বিধাতার প্রেরিতবাণীকে, এবং তাঁর ধর্মের বিশ্বাসগুলো। তাঁকে শুধু যুক্তিই সাহায্য করে না, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে রয়েছেন ধর্মপ্রবর্তক, ররেছে ধর্মগ্রন্থ। তাঁর রয়েছে মহান অভিভাবক। তাঁর মতে কিছু কিছু সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত; যেমন খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ব বা পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মার ব্যাপারটি। এ-ব্যাপারটিকে যুক্তি দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে এটা অযৌক্তিক নয়, তবে যুক্তি দিয়ে এদের সত্যতা প্রমাণ অসম্ভব। ধর্মে রয়েছে আরো কিছু সত্য, যা প্রমাণ করা সম্ভব যুক্তি দিয়ে; এবং রয়েছে আরো একগুচ্ছ সত্য, যা দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উভয়েরই সীমার মধ্যে পড়ে—যেমন বিধাতার অস্তিত্ব। বিধাতা নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আছেন, তাই তিনি আছেন; তবে যুক্তির সাহায্যেও প্রমাণ করা যায় যে তিনি আছেন। ভেতরে ভেতরে তিনি বিশ্বাস করেন যে দর্শন ধর্মতত্ত্বের থেকে অনেক উৎকৃষ্ট জ্ঞান; তবু যেহেতু তিনি ধর্মতাত্ত্বিক, তাঁর মনে হয় যে দর্শন একলা মানুষের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে না। যুক্তির সাথে দরকার প্রত্যাদেশ ও বিশ্বাস। রাসেল বলেছেন আকুইনাসের মধ্যে দার্শনিকের স্বভাব রয়েছে খুবই কম; কেননা তিনি যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে সত্যে পৌছেন না; তিনি এমন কোনো অনুসন্ধানে ব্যাপৃত নন, যার ফল আগে থেকে জানা অসম্ভব। আকুইনাস আগে থেকেই জানেন তাঁর ফলটি কী, তিনি পৌছবেন কোন সত্যে। তাঁর সত্য আগে থেকেই প্রচারিত হয়ে আছে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসে; আকুইনাসের কাজ হচ্ছে নানা যুক্তি অবতরণা ক'রে তা প্রমাণ করা। রাসেল বলেছেন আকুইনাস যা করেছেন, তা দর্শন নয়, ওকালতি।

আকুইনাস বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন পাঁচটি উপায়ে। তাঁর উপায় বা যুক্তিগুলো শুরু হয় বাস্তব জগতে, শেষ হয় গিয়ে অবাস্তবে। তিনি শুরু করেন আমাদের পরিচিত গতি বা পরিবর্তন নিয়ে; এবং অনুসরণ করেন আরিস্ততলকে যে কোনো বস্তু চলতে বা গতিশীল হ'তে পারে না, যদি না তার থাকে গতিশীল হওয়ার শক্তি। তাঁর প্রথম যুক্তিটিই ভুল। আরিস্ততলের অনুসরণে তিনি বলেন কোনো কিছুর গতিশীল হওয়ার গুণ থাকলেও সে গতিশীল হ'তে পারে না যদি না সত্যিকার কোনো কিছু তাকে গতিশীল না করে। তাঁর, ও আরিস্ততলের মতে কোনো কিছুই নিজে গতিশীল হ'তে পারে না; অন্য কিছু তাকে গতিশীল করে। মনে করতে পারি যে একটি গতিশীল বস্তু অন্য একটি বস্তুকে করে গতিশীল,

তাকে গতিশীল করে অন্য একটি বস্তু; অর্থাৎ এটা চলতে থাকে অন্তহীনরূপে। কিন্তু আকুইনাসের কাছে চালকের পর চালক, অন্তহীন চালক অকল্পনীয়; তিনি মনে করেন যে চালক অন্তহীন নয়, রয়েছেন একজন আদিচালক, যিনি নিজে চলেন না, অন্যদের চালান। তিনি অচল বা অনড় চালক। তিনি বিধাতা। খুবই হাস্যকর, অযৌক্তিক, এবং বাঙলায় যাকে বলে—কষ্টকল্পিত যুক্তি। তাঁর চিন্তায় সব কিছুই অপর এক সত্তার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু সে-সত্তাটি, অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল নন, তিনি অচল চালক; তিনি আদি বা প্রথম, অর্থাৎ বিধাতা। তবে তিনি শুধু আরিস্ততলীয় যুক্তির ওপরই নির্ভর করেন না, নির্ভর করেন খ্রিস্টধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরও যে বিশ্ব চিরকাল ধ'রে অস্তিত্বশীল নয়, এক সময় ছিলো যখন বিশ্ব ছিলো না। আরিস্ততল যেমন এক অচল চালক প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর বিশ্বযন্ত্রকে সচল রাখার জন্যে, আকুইনাসও তাই করেন;—আরিস্ততলের বিশ্বকাঠামো ধার ক'রে আরিস্ততলীয় অচল চালকের সাহায্যে তিনি চালান সমস্ত সচল বস্তুকে।

আকুইনাসের দ্বিতীয় যুক্তি কার্যকারণবিষয়ক। প্রাকৃতিক জগতে যা কিছু আছে বা ঘটে, তার সব কিছুর পেছনে রয়েছে কোনো-না কোনো কারণ; কোনো কিছুই কারণহীন নয়; তবে, তার মতে রয়েছেন এক আদি বা প্রথম কারণ, যা অন্য কোনো কারণের ফল নয়। ওই আদিকারণ হচ্ছেন বিধাতা, যিনি জাগতিক সব কার্যকারণের আদি ও উৎস। তৃতীয় যুক্তিতে তিনি পার্থক্য করেন অনিবার্য বা প্রয়োজনীয় ও আকস্মিক অস্তিত্বের মধ্যে। তাঁর মতে জগত জুড়ে কতো কিছুই অস্তিত্বশীল হয় ও ধ্বংস হয়; তাদের অস্তিত্ব অনিবার্য নয়, তারা আকস্মিক; কিন্তু রয়েছেন এক সত্তা, যাঁর অস্তিত্ব অনিবার্য, কেননা তিনিই অস্তিত্বশীল করেছেন অন্য অস্তিত্বদের। আমরা দেখি কোনো অস্তিত্বের জন্যে দরকার পূর্ব কারো অস্তিত্ব, তবে তাঁর কাছে অন্তহীন পূর্বচক্র বা পূর্বঅস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য নয় : তিনি মনে করেন এক জায়গায় গিয়ে অবশ্যই থামতে হবে। তিনি গিয়ে থামেন বিধাতায়, যিনি সমস্ত অস্তিত্বের কারণ, কিন্তু নিজে কোনো কারণের পরিণতি নন। তিনি আদি, তাঁর থেকে উদ্ভূত অন্যরা। আকুইনাসের চতুর্থ যুক্তিও মহাজাগতিক যুক্তি; এতে তিনি সমস্ত সদগুণের উৎসরূপে দেখতে পান বিধাতাকে। তাঁর মতে বিভিন্ন আকস্মিক সত্তার মধ্যে যে-সমস্ত গুণ দেখতে পাই, সেগুলো তারা পেয়েছে কোনো পরমসত্তা থেকে, কেননা পরমসত্তার মধ্যে ওই গুণগুলো আছে পরমরূপে। তাই সমস্ত সদগুণের আছেন এক পরম আধার বা উৎস; তিনি হচ্ছেন বিধাতা।

বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে যে-সব মহাজাগতিক যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন আকুইনাস, সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে এক মৌল বিশ্বাসের ওপর ও যে বিশ্বজগতের অস্তিত্বের মূলে অবশ্যই রয়েছেন এক আদিকারণ বা পরম কারণ। বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে সবশেষে তিনি দেন মহৎ লক্ষ্যমূলক বা মহাপরিকল্পনামূলক যুক্তি। তাঁর এ-যুক্তি মাতিয়ে রেখেছিলো নানা ধর্মের

বিশ্বাসীদের, যার এক শিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জগতে, আকুইনাস বিশ্বাস করেন, সব কিছু কাজ ক'রে চলছে সুন্দর বিন্যাস বা সুষমা রক্ষা ক'রে; তারা এক বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্যপূরণের জন্যে কাজ ক'রে চলছে এভাবে। তিনি মনে করেন জগতের সুষমা কোনো আকস্মিক ব্যাপার হ'তে পারে না; নিশ্চয়ই এসবের মূলে রয়েছে এক অলৌকিক মহাশক্তির মহাপরিকল্পনা। জগতে রয়েছে নানা তুচ্ছ বস্তু, যাদের কোনো বুদ্ধি নেই, তারাও পূরণ করছে একই মহৎ লক্ষ্য, যা তাদের কাছে আশা করা যায় না। তারা কেনো মহৎ লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্যে কাজ ক'রে চলছে? আকুইনাস বলেন এর পেছনে রয়েছেন এক মহাসত্তা, যিনি সব কছুকে চালাচ্ছেন এক পরম পরিণতির দিকে; ওই মহাসত্তা হচ্ছেন বিধাতা। জগত সুষমা আর মহৎ লক্ষ্য বা মহাপরিকল্পনা দেখা বিশ্বাসীদের একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। বিধাতার মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে মনে পড়ছে রাসেলের দুটি স্মরণীয় ব্যাখ্যা :

> [ক] আমি বুঝতে পারি না প্রকৃতির কোথায় পাওয়া যায় 'সৌন্দর্য' ও 'সুষমা'। সারা পশুরাজ্য জুড়ে পশুরা একে অন্যকে শিকার করে নৃশংসভাবে। তাদের অধিকাংশই অন্য পশুদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয় বা ক্ষুধায় ধীরে ধীরে মারা যায়। আমি ফিতাক্রিমির মধ্যে কোনো মহৎ সৌন্দর্য ও সুষমা দেখতে পাই না। এটা বলবেন না যে এটিকে আমাদের পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্যে পাঠানো হয়েছে। আমার মনে হয় 'সৌন্দর্য' আর 'সুষমা'র ধারণা এসেছে নক্ষত্রখচিত আকাশের সৌন্দর্য-সুষমার বোধ থেকে। তবে মনে রাখা দরকার যে নক্ষত্রগুলো যখন-তখন বিস্ফোরিত হচ্ছে, আর তাদের চারপাশকে পরিণত করছে ঘোলাটে কুয়াশায়। [খ] বিবর্তনবাদ ফ্যাশন হয়ে ওঠার পর থেকে মানুষের ওপর মহত্ত্ব আরোপ নিয়েছে এক নতুন রূপ। আমাদের বলা হয় যে বিবর্তনের পেছনে কাজ করছে এক মহৎ লক্ষ্য : লাখ লাখ বছর ধ'রে যখন ছিলো শুধু আঠালো কাদা, বা ট্রিলোবাইট, যুগ যুগ ধ'রে যেখানে ছিলো ডাইনোসর আর দানবিক উদ্ভিদ, মৌমাছি আর বন্য ফুল, তার মধ্য দিয়ে বিধাতা প্রস্তুত করছিলেন এই মহাপরিণতি। পরিশেষে তিনি তৈরি করেছেন মানুষ, যার মধ্যে রয়েছে নিরো ও কালিগুলো, হিটলার ও মুসোলিনির মতো প্রজাতি, যাদের অসামান্য মহিমা এই দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে। বিধাতার পরম পরিকল্পনার পরিণতির এই খোঁড়া ও নপুংশক ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হওয়ার থেকে আমি চিরশাস্তিকেও অনেক কম অবিশ্বাস্য ও কম হাস্যকর মনে করি।

সমাজ ও রাষ্ট্রের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে ঘটছে এমন সব অশ্লীল ঘটনা, যা কোনো মহাপরিকল্পনার ফল নয়। একটি দুর্বৃত্ত একনায়ক দেখা দিয়েছে, এটা কোন মহাপরিকল্পনার অংশ? দেশ জুড়ে অনাহার, বন্যা, মহামারী? এটা কোন মহাপরিকল্পনার অংশ? ধর্ষিত হচ্ছে নারীরা, গর্ভবতী হয়ে পড়ছে পরিচারিকারা; এটা কোন মহাপরিকল্পনার অংশ? প্রকৃতির নিয়মগুলো চলে প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে, কোনো মহাপরিকল্পনা অনুসারে নয়। আকুইনাস পাঁচটি যুক্তি বের ক'রে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বিধাতা আছেন; কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য ধার্মিকেরা মানে না তাঁর আবিষ্কৃত বিধাতাকে। তাদের মতে, যেমন পাস্কাল দাবি করেছেন, 'দার্শনিকের বিধাতা' আর 'আব্রাহাম, আইজাক ও জ্যাকবের বিধাতা' এক জিনিশ

নয়। ধার্মিকেরা যুক্তি দিয়ে বোঝে না বিধাতাকে, তারা অন্ধ অযৌক্তিক মানুষ; তারা বিশ্বাস করে, তাদের ধর্মের বিধান অনুসারে, বিশেষ বিধাতায়। তাই বিভিন্ন ধর্মের বিধাতা বিভিন্ন, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একই বিধাতায় বিশ্বাস করে না; কিন্তু দার্শনিক যুক্তিতে আবিষ্কৃত হয় যে-বিধাতা—যদি আদৌ আবিষ্কৃত হয়, তা এক অভিন্ন ভাবনা। বিধাতা আছেন এবং তিনি বাণী বা প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে, এটা অনেকেই বিশ্বাস করে না; ডেভিড হিউমও এটা বিশ্বাস করেন নি। প্রতিটি ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে অলৌকিক অবিশ্বাস্য প্রত্যাদেশের ওপর। প্রত্যাদেশ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী; প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করতে হ'লে অস্বীকার করতে হয় প্রাকৃতিক নিয়মকে। যে-সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে ব'লে মনে করা হয়, হিউমের মতে সেগুলো ওই ব্যক্তিদের বোঝার ভুল মাত্র। তাঁর মতে ধর্ম ও যুক্তি পরস্পরবিরোধী; ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে অযৌক্তিক ভিত্তির ওপর।

প্রথা ও ধর্মকে সবচেয়ে শাণিতভাবে আক্রমণ করেছেন বার্ট্র্যান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)। সভ্যতায়, ধর্মের কিছুটা দান রয়েছে—তিনি স্বীকার করেন; তবে তাঁর কাছে ধর্ম হচ্ছে 'ভয় থেকে উৎপন্ন রোগ এবং মানবজাতির শোচনীয় দুর্দশার উৎস।' তিনি নিজেকে নাস্তিক না ব'লে বলতেন সন্দেহবাদী; এবং প্রচার করতেন গোত্রমুক্ত মানবতাবাদ। তিনি চাইতেন মানুষ হবে আত্মবিশ্বাসী, যাপন করবে নিজের জীবন, ভয় পাবে না চিরশাস্তির, লোভে পড়বে না কোনো পারলৌকিক পুরস্কারের। তিনি *কেনো আমি খ্রিস্টান নই* নামে একটি বই লিখেই ছেড়ে দেন প্রথা থেকে পাওয়া ধর্ম। ওই ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর বড়ো আপত্তি হচ্ছে নরক। তিনি বলেছেন, 'ক্রাইস্টের নৈতিক চরিত্রে রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি, তা হচ্ছে তিনি বিশ্বাস করতেন নরকে।' তিনি জেসাসের থেকে মহৎ মনে করেন সক্রেটিসকে, আবার সক্রেটিসের মহত্ত্বেও তাঁর সন্দেহ ছিলো; সক্রেটিসের হেমলকপানকে তিনি মহৎ মনে করেন না, কেননা সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন স্বর্গে তিনি থাকবেন দেবতাদের সাথে। তিনি মনে করেন প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসগুলো লোপ পাবে। তিনি দেখিয়েছেন সব ধর্মই একটি শক্তির ওপর আরোপ করে বিপুল সম্মান, যে মানুষের প্রতি অনীহ; মানুষ যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাঁর মতে বিধাতায় বিশ্বাস খর্ব করে মানুষের স্বাধীনতা। ধর্ম, তাঁর মতে উপকারের থেকে অপকার করছে অনেক বেশি; কেননা ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে অপরীক্ষিত অভিজ্ঞতার ওপর, এবং ধর্ম বুদ্ধির শত্রু। আমরা আরো মুক্ত হবো, আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো নিজেরাই, যদি আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারি বিধাতায় বিশ্বাস থেকে, এবং বিশ্বাস আনতে পারি মানুষের বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধিতে। তখন মুক্ত হবো মোহ থেকে, নিজেদের আর প্রবোধ দেবো না; দাঁড়াবো সম্পূর্ণরূপে নিজেদের পায়ের ওপর, নিজেরাই হবো নিজেদের জীবন ও মৃত্যুর

অভিভাবক। মেনে নেবো যে জীবন তাৎপর্যহীন, তবে তাৎপর্যহীন জীবনকে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তুলতে পারি নিজেদের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে।

একদেবতা বা বিধাতা কল্পনার আগে এসেছিলো যে দীর্ঘ এক যাদু বা ইন্দ্রজালের কাল, সব ধর্মের ভেতরে যা আজো সংগোপনে পবিত্র বিশ্বাস ও আচরণরূপে টিকে আছে, আমি একটু সেকালে যেতে চাই। বাঙলায় যাদু ও যাদুকর সম্পর্কিত শব্দের সংখ্যা প্রচুর : ইন্দ্রজাল, যাদু, ভোজবাজি, ভেলকি, ভানুমতীর খেল, কুহক, সম্মোহন, তুকতাক, বাণমারা, মায়া, গুণকরা, মন্ত্র, মন্ত্রকরা, বশীকরণ, শাম্বরী; এবং আদি বাঙলা সাহিত্য ভ'রে আছে যাদুটোনায়। আমার ছেলেবেলায়ও গ্রামে আমরা বাস করতাম যাদুটোনা, ভূতপ্রেত, আর বিধাতার অনন্ত ভয়ের মধ্যে। আদিম সমাজে দেখা দিয়েছিলো যাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকেরা, তাদের উদ্দেশ্য ছিলো অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে সামজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা, এমনকি রাজা হওয়া যাদুকরের লক্ষ্য ছিলো প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করা, কিন্তু তারা প্রকৃতির শক্তির স্বরূপ বুঝতে পারে নি, তাকে বশ করতে পারে নি; কিন্তু সম্মোহিত করতে পেরেছে মানুষকে। যাদু ও বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য একই, কিন্তু যাদু ভুল পথে গিয়ে হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানের অবৈধ বোন—যেমন বলেছেন জেমস ফ্রেজার। ধর্মের মূলকথা হচ্ছে একাধিক/এক অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, যারা/ যে মানুষের থেকে উন্নততর, এবং চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃত ও মানুষের জীবন। ওই শক্তিতে বিশ্বাস তাত্ত্বিক ব্যাপার, তবে শুধু তত্ত্বেই ধর্মের চলে না; তার একটি প্রয়োগগত দিকও থাকতে হয়। প্রয়োগগত ব্যাপারটি হচ্ছে ওই শক্তিগুলোকে পরিতৃপ্ত করা দরকার; শুধু আদিম নয়, আধুনিক সব ধর্মেই রয়েছে অলৌকিক শক্তিগুলোকে তৃপ্ত করার নানা রীতি। কিন্তু যদি বিশ্বাস করি যে রয়েছে অলৌকিক শক্তি, যারা নিয়ন্ত্রণ করে জগত, আর আমরা যদি তাদের কাছে চাই সুযোগসুবিধা, তার অর্থ দাঁড়ায় প্রাকৃতিক নিয়ম শিথিল করা সম্ভব; প্রার্থনা ক'রে বা পশুবলি দিয়ে ওই শক্তিদের সাহায্যে বদলে দিতে পারি প্রাকৃতিক নিয়ম। অলৌকিক-শক্তিদের কাছে মানুষের অধিকাংশ প্রার্থনাই স্থূল; বাইবেল থেকে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

> হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি তোমার শরণ লইয়াছি;
> আমার সকল তাড়নাকারী হইতে আমাকে নিস্তার কর, আমাকে উদ্ধার কর।
> পাছে [শত্রু] সিংহের ন্যায় আমার প্রাণ বিদীর্ণ করে,
> খণ্ড খণ্ড করে, যখন উদ্ধারকারী কেহ নাই।...
> হে সদাপ্রভু, ক্রোধভরে উত্থান কর,
> আমার বৈরীদের কোপের প্রতিকূলে উঠ [*গীতসংহিতা* ৭]

> আমার শত্রুগণের হইতে, আমার তাড়নাকারীগণ হইতে, আমাকে উদ্ধার কর।
> দুষ্টগণ লজ্জিত হউক, পাতালে নীরব হউক।

সেই মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর সকল বোবা হউক,
যাহারা ধার্ম্মিকের বিপক্ষে দর্পকথা কহে,
অহঙ্কার ও তুচ্ছজ্ঞান সহকারে কহে [*গীতসংহিতা* ৩১]

প্রার্থনায় অবশ্য কখনোই কাজ হয় না, নির্বোধেরা শুধু একটু সাময়িক শান্তি পায়। প্রার্থনা সম্বন্ধে বার্ট্র্যান্ড রাসেলের কথা শোনার মতো :

প্রার্থনা বা বিনয়ের সাহায্যে আপনি নিজের ইচ্ছেমতো কিছুই বদল করতে পারেন না, কিন্তু পারেন প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ক'রে। এভাবে আপনি যে-শক্তি অর্জন করেন, তা প্রার্থনার-সাহায্যে-অর্জন-করা-যায়-ব'লে-বিশ্বাস-করা শক্তির থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য; কেননা আপনি জানেন না স্বর্গে আপনার প্রার্থনা সদয়তার সাথে বিবেচিত হবে কিনা। তাছাড়া প্রার্থনার রয়েছে বিশেষ সীমা; খুব বেশি চাওয়া অধার্মিকতা ব'লে বিবেচিত হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের শক্তির কোনো সীমা নেই। আমাদের বলা হয়েছে বিশ্বাস পর্বত স্থানান্তরিত করতে পারে, কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করে না; এখন আমাদের বলা হয় আণবিক বোমা পর্বত স্থানান্তরিত করতে পারে, এবং সবাই তা বিশ্বাস করে।

হায়, প্রার্থনা;—আত্মসম্মানবোধহীন দুর্বলের লোলুপবাণীবিন্যাস।

প্রার্থনায় প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম বদলে দেয়া যেতে পারে, এটা যাদুকর ও বিজ্ঞানী কেউ বিশ্বাস করেন না; তাঁরা জানেন প্রকৃতির নিয়মগুলো অপরিবর্তনীয়, অবিচল, ওগুলোর কাছে 'প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা'। বিজ্ঞান কোনো পরমসত্তায়ই বিশ্বাস করে না; তবে ধর্ম বিশ্বাস করে এক/একাধিক লোকোত্তর শক্তিতে; মনে করে ওই শক্তিগুলো যদিও স্বেচ্ছাচারী, তবু আবেদননিবেদন ক'রে তাদের তুষ্ট ক'রে ফল পাওয়া যেতেও পারে। ফল না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই, যদি পাওয়া যায় তাহলে অনেক লাভ। এটা সৎ মানুষের স্বভাব নয়, বস্তুবাদী চতুর মানুষের স্বভাব। যাদুতে অনেক সময় নানা ধরনের প্রেতের সাহায্য নেয়া হয়; তবে ওই প্রেত দেবতা নয়, তাকে পুজো করা হয় না, নানা মন্ত্র দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করা হয়। যাদু পুজো না ক'রে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় অলৌকিক শক্তিদের। যাদু ও ধর্মের মধ্যে বড়ো পার্থক্য এখানেই : যাদু যা করতে চায় নিয়ন্ত্রণ ক'রে ধর্ম তা করতে চায় প্রার্থনা ক'রে। যাদুকর ধর্মের চোখে বিধাতাদ্রোহী, তাই ধর্মপ্রবর্তক ও পুরোহিতেরা চিরকালই চেষ্টা করেছে যাদুকরদের নির্মূল করতে। এর মূলে ছিলো একটা স্বার্থগত প্রতিযোগিতাও : ধর্মপ্রবর্তক ও পুরোহিত নিজেদের মনে করে বিধাতার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম, সেখানে যদি ভাগ বসায় যাদুকর, তাহলে নষ্ট হয় তাদের স্বার্থ। প্যালেস্টাইন অঞ্চলের ধর্মগুলোতে যাদুকরদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশ চোখে পড়ে।

ধর্মবিষয়ক জনপ্রিয় নিম্নমানের বই পেলেই আমি উল্টেপাল্টে দেখি, কেননা এগুলোই তৈরি করে অধিকাংশ বিশ্বাসীর ধর্মবোধ, যারা ধর্মের মূল বইগুলো

পড়তে পারে না, যদিও এগুলোর কোনো কোনো অংশ ধর্মের মূল বিশ্বাসবিরোধী। কিছু দিন আগে 'বাংলাদেশ হুকুমতের ভূতপূর্ব প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট' মৌলবী মোহাম্মদ শামছুল হুদা বি.এ.বি.এল সাহেবের *নেয়ামুল-কোরআন* (ত্রয়োবিংশ সংস্করণ, ১৯৮৯, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) বইটির ১৫১ পৃষ্ঠাটি খুলে আমি চমকে উঠি। এটি একটি জনপ্রিয় ধর্মবিষয়ক বই; বইটিতে আয়াতের সাহায্যে কীভাবে চাকরচাকরাণী বাধ্য রাখা যায়, নষ্ট চাকুরি ফিরে পাওয়া যায়, যাদু নষ্ট করা যায়, স্বামীকে বশীভূত করা যায়, ধ্বজভঙ্গ ও প্রমেহ রোগ সারানো যায়, গর্ভপাত নিবারণ করা যায়, স্ত্রীলোকের প্রসব কষ্ট দূর করা যায়, স্বপ্নদোষ বন্ধ করা যায়, বিচারকের দয়া আকর্ষণ করা যায়, সঙ্গম শক্তি বাড়ানো যায়, সাপ ও কুকুরের বিষ নষ্ট করা যায়, প্রস্রাব খোলাসা করা যায়, পরীক্ষায় পাশ করা যায়, এমন অজস্র জরুরি বিষয়ে তদবীরের রীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতো উপকারী বই কমই আছে পৃথিবীতে। বইটির ১৫১ পৃষ্ঠাটি আমাকে শিউরে দেয়। এ-পাতায় তিনি বর্ণনা করেছেন 'দুইজনের মধ্যে শত্রুতা ও মতান্তর সৃষ্টি করার তদবীর'। দুজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির ব্যাপারটি নৈতিকভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আমার কাছে, কিন্তু ধার্মিকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য। লেখক পরামর্শ দিয়েছেন : 'দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা ও মতান্তর সৃষ্টি করিতে হইলে এই আয়াত গাছের পাতার উপর লিখিবে :—[আরবিতে আয়াতটি লেখা হয়েছে], উৎস নির্দেশ করা হয়েছে : (৬ পারা, সূরা আল্‌মায়েদা, ৬৪ আয়াতের অংশ) : অর্থ দেয়া হয়েছে : এবং তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছি।' লেখক এখানেই থামেন নি; পরামর্শ দিয়েছেন, 'তৎপর উপরোক্ত আয়াতের নীচে এই নকশা লিখিবে।' তিনি নকশার ছবিও দিয়েছেন, যাতে আরবিতে চারবার লেখা আছে 'আল্লাহ', এবং মাঝখানে নিচ থেকে ওপর দিকে তিনবার লেখা আছে 'সেহর', যার অর্থ হচ্ছে 'যাদু'। তিনি নকশাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> **নকশার বর্ণনা** :—যাদুকরের কুফরী কালামের কিছু কিছু শক্তি বর্তমান আছে, কিন্তু আল্লাহর পাক কালামের শক্তির নিকট ইহাদের শক্তি কিছুই নহে। পূর্বকালে লোকেরা যাদুমন্ত্রের দ্বারা মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিত। এই নকশায় আল্লাহর নামের নীচে "সেহর" (যাদু) শব্দটি দ্বারা প্রতীয়মান করা হয় যে, যাদুমন্ত্র আল্লাহর অসীম শক্তির নিকট অকিঞ্চিৎকর। এই নকশায় উক্ত ভাবের বর্ণনা থাকায় ইহার বরকতে উপরোক্ত ফল লাভ হয়।
>
> তৎপর এই নকশার নীচে লিখিবে অমুক ও অমুকের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হউক। অমুক অমুকের স্থলে দুইজনের নাম লিখিবে এবং ইহা তাবীয করিয়া পুরাতন দুই কবরের মাধ্যস্থলে পুঁতিয়া রাখিলে তাহাদের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হইবে। (অন্যায়ভাবে এই আমল করিলে কবীরাহ গোনাহ হইবে)।

ন্যায়সঙ্গতভাবে কীভাবে দুজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা যায়, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না—ধার্মিকদের নৈতিকতা বড়োই বিস্ময়কর; তবে এ-নকশার

বর্ণনায় এটা স্পষ্ট যে ধর্ম ও যাদু পরস্পরের বিরোধী। এর আরো গভীর ব্যাখ্যাও সম্ভব, নকশাটি তাই দাবি করছে, তবে তাতে আমি যাচ্ছি না। ধর্ম ও যাদুর বিরোধ অবশ্য ধর্মগুলোর সূচনাকালেই ঘটে নি, ঘটেছে বেশ পরে; আগে পার্থক্য ছিলো না পুরোহিত ও যাদুকরের মধ্যে, একই ব্যক্তি ছিলো পুরোহিত ও যাদুকর। পুরোহিত-যাদুকর একই সাথে পালন করতো ধর্মীয় ও ঐন্দ্রজালিক আচার, একই সাথে সে প্রার্থনাও করতো মন্ত্রও আবৃত্তি করতো, যাতে সে পেতে পারে তার ঈপ্সিত ফল। ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মিশ্রণ সব ধর্মেই দেখা যায়। প্রাচীন ভারত, মিশর, প্যালেস্টাইনে ধর্ম ও যাদু মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। ভারতীয় ধর্মের শ্লোকগুলোকে যে মন্ত্র বলা হয়, তার কারণ হয়তো এগুলো মূলত ছিলো যাদুকরদের অভিচারশ্লোক। আজকাল যাদু বা ইন্দ্রজাল তার গৌরব হারিয়েছে, কিন্তু আদিতে ইন্দ্রজালই ছিলো ধর্মের ভিত্তি। যখন কেউ দেবদেবীর কাছে সুযোগসুবিধা চাইতো, তখন দরকার হতো দেবদেবীকে বশীভূত করা; এবং বশ করার জন্যে দরকার হতো বলি, প্রার্থনা, মন্ত্র; অর্থাৎ ইন্দ্রজাল।

ধর্মের থেকে ইন্দ্রজাল অনেক পুরোনো; প্রকৃতিকে বশ করার জন্যে ধর্মের অনেক আগেই উদ্ভূত হয়েছিলো যাদু, এবং ধর্মে এখনো তা মিশে আছে। এখনো অনেক জনগোষ্ঠী আছে যাদের মধ্যে ধর্মের বিকাশ ঘটে নি, বা আধিপত্যশীল ধর্মগুলো গিয়ে পৌঁছে নি, কিন্তু সেখানে যাদু ও যাদুকরের কোনো অভাব নেই। এক সময় আমাদের দেশে বিশ্বাস করা হতো যে আসামের সবাই, বিশেষ ক'রে নারীমাত্রই, যাদুকর; তারা পুরুষ পেলেই তাকে ভেড়া বানায়; এ-শতকের প্রথম দিকে দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সবাই যাদুকর, কিন্তু তাদের কোনো পুরোহিত নেই, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ ধর্ম নেই। সেখানে সবাই মনে করতো তারা যাদু দিয়ে অন্যদের বশ করতে পারে, বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে প্রকৃতিকে, কিন্তু কেউ সেখানে কোনো দেবতার পুজো করতো না। ফ্রেজার মনে করেন একদা পৃথিবী জুড়েই এসেছিলো এক ইন্দ্রজাল বা যাদুর যুগ। ধর্মের উত্থানের ফলে যাদুর অবসান ঘটে নি, ঐন্দ্রজালিকভাবেই সে বদল করেছে তার রূপ, বিভিন্ন ধর্মের ভেতরে এখনো গোপনে বেঁচে আছে। মানুষের কাছে এখনো ধর্মের কঠোর বিধানের থেকে ইন্দ্রজালের আবেদন বেশি। এর প্রকাশ পৃথিবী জুড়েই দেখা যায়। পৃথিবী ভ'রেই ধর্মের যুগের আগে দেখা দিয়েছিলো যাদুর যুগ; কিন্তু মানুষ কেনো যাদু ছেড়ে আশ্রয় নিলো ধর্মের? এর কারণ যাদুর ব্যর্থতা; মানুষ দেখতে পায় যাদু কাম্য ফল দিচ্ছে না; পালন করা হলো অনেক আচার, আবৃত্তি করা হলো অনেক মন্ত্র, কিন্তু কোনোই ফল ফলছে না। মানুষ একদিন বুঝতে পারে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি নেই ইন্দ্রজালের। যা ব্যর্থ, তা মানুষ ধ'রে রাখে না; মানুষ পুজো করে সফলতার, সফলতা মানুষের বিধাতা।

যাদুতে এক সময় বিশ্বাস ছিলো মানুষের; যেদিন সে-বিশ্বাস নষ্ট হয়, সেদিন তাদের দরকার পড়ে নতুন শক্তির, যা যাদুর থেকে শক্তিমান, যা তাদের দিতে

পারে তাদের কাম্য ফল। আমরা কল্পনা করতে পারি সেই সংকটকালের উদ্বিগ্ন চিন্তাবিদদের, আরণ্যিক নির্বোধদের, যারা খুঁজছিলো নতুন পথ, নতুন উপায়, নতুন শক্তিদের, যারা তাদের উদ্ধার করতে পারে, দিতে পারে তাদের কামনার বস্তু। ওই শক্তিকে অবশ্যই হ'তে হবে ইন্দ্রজালের থেকে শক্তিমান, কেননা ইন্দ্রজালের ব্যর্থতা তারা দেখেছে। তারা তখন প্রকৃতির নিরন্তর আক্রমণে পর্যুদস্ত; তাদের মনে হয় নিশ্চয়ই রয়েছে এমন বহু শক্তি, যারা প্রবাহিত করে ঝড়, বিদ্যুতে ফেড়ে ফেলে আকাশ, বজ্রপাত করে চারদিক কাঁপিয়ে, আকাশে জ্বেলে দেয় আলোকমালা, ফলবতী করে নারী ও ভূমিকে ইত্যাদি। নিশ্চয়ই যাদুর থেকে শক্তিমান ওই শক্তিসমূহ। তারা এক ভুল থেকে আরেক ভুলে পৌছে—দেখে ভ্রান্ত দুঃস্বপন; যাদু ছেড়ে তারা নিজেদের সমর্পণ করে কল্পিত ওই শক্তিরাশির পায়ে। যাদুকর যেমন বোঝে নি প্রকৃতিকে, তারাও বোঝে না; তবে যাদুর ব্যর্থতা এর মাঝেই প্রমাণিত হয়ে গেছে ব'লে নতুন শক্তি কল্পনা করতে তাদের বাধে নি। ওই কল্পিত শক্তিগুলোকে তারা ক'রে তোলে দেবতা; তাদের কাছে চায় সম্পদ, চায় আশীর্বাদ, প্রার্থনা করে অভয়। এভাবেই একদিন মানুষ যাদু ছেড়ে আশ্রয় নেয় কল্পিত অতিমানবিক শক্তিরাশির; যাদু থেকে উত্তীর্ণ হয় ধর্মে। যাদু থেকে মানুষ অবশ্য এক দিনে উঠে আসে নি ধর্মে, লেগেছে হাজার হাজার বছর, এমনকি আজো পুরোপুরি উঠে আসে নি। তবে ধর্মে—বহুদেবতায়, বহুদেবতা থেকে একদেবতায়—উঠে লাভ হয় নি মানুষের, বরং যাদুকরের মধ্যে যে-ঔদ্ধত্য ছিলো, তা সে হারিয়েছে; সে হয়ে উঠেছে কল্পিত অতিমানবিক শক্তির পুতুল। ধর্ম হয়ে উঠেছে অবাস্তব অতিমানবিক শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, বিসর্জন করা সমস্ত নিজস্বতা ও মর্যাদা। কিন্তু ধর্মের কাছে মানুষ যা চায় তা কি তারা পায়? যা চায়, মানুষ তা পায় না; যেমন এক সময় পেতো না যাদুর কাছে। যাদু যদি তার কামনা পূরণ করতে পারতো, তাহলে মানুষ যাদুকে ছাড়তো না; ধর্মের কাছে মানুষ যা চায়, তা না পেয়ে মানুষ একদিন ধর্মও ছেড়ে দেবে। মানুষের বিধাতা আসলে সফলতা।

প্রশ্ন হচ্ছে বিধাতা বা বিধাতারা আছেন কি না? আমরা দেখেছি দার্শনিকের বিধাতাকে মানে না ধার্মিকেরা, কেননা তাতে বিধাতা হয়ে ওঠেন বিমূর্ত ভাব, যা সব ধর্মেই অভিন্ন। কিন্তু পৃথিবীতে ধর্ম অনেক, ও সেগুলো পরস্পরবিরোধী; সেগুলোর প্রতিপালকরূপে রয়েছেন একান্ত নিজস্ব বিধাতা। তাহলে এমন হ'তে পারে বিধাতা একজন নন, অনেক; আর যদি তিনি একলা হন, তাহলে একটি বাদে সবগুলো ধর্মই অসত্য। আজকাল মানুষ বেশি সাবধান হয়ে গেছে, তারা বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না; তাই তারা যখন কারো কাছে জানতে চায়—'আপনি কি বিধাতায় বিশ্বাস করেন', তখন তারা বিশেষ ধর্মের বিধাতার কথা জানতে চায় না। কেউ বিধাতায় বিশ্বাস করে এটুকু জানলেই ধার্মিকেরা কাচ-চালানোর-মতো সন্তুষ্ট হয়। এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো আইনস্টাইনের

জীবনে। পঞ্চাশপূর্তি উপলক্ষে যখন তাঁকে সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন চলছিলো নানা দিকে, তখন বস্টনের এক যাজক ক্রমশ তাঁকে জড়িয়ে ফেলছিলো ধর্মীয় বিতর্কে। ওই যাজকের মতে আপেক্ষিকতত্ত্ব হচ্ছে 'মুখোশপরা নাস্তিকতার প্রেত', যা 'বিশ্বজনীন সন্দেহ সৃষ্টি করেছে বিধাতা ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে'। নাস্তিককে কি সংবর্ধনা দেয়া যায়? তখন এক ধর্মযাজক টেলিগ্রাম ক'রে জানতে চান, 'আপনি কি বিধাতায় বিশ্বাস করেন?' আইনস্টাইন উত্তর দেন : 'আমি বিশ্বাস করি স্পিনোৎসার বিধাতায়, অস্তিত্বশীল বস্তুরাশির সুষমার মধ্যে যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন; তবে ওই বিধাতায় বিশ্বাস করি না যে ভাগ্য ও মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত।' তাঁর উত্তর পেয়ে ওই যাজক সকলকে বোঝাতে সমর্থ হন যে 'স্পিনোৎসাকে বলা হয় বিধাতামাতাল মানুষ, যিনি প্রকৃতির সবখানে দেখতে পেতেন বিধাতার প্রকাশ, তাই তাঁকে আমরা নাস্তিক বলতে পারি না। আর আইনস্টাইন নির্দেশ করেন ঐক্য। আইনস্টাইনের তত্ত্বকে যদি যৌক্তিক পরিণতিতে নেয়া হয়, তাহলে তা উপস্থিত করবে একেশ্বরবাদের এক বৈজ্ঞানিক সূত্র। তিনি দ্বৈতবাদী ও বহুত্ববাদী সমস্ত চিন্তা বিনষ্ট করেছেন।' তাঁর উত্তরে সবাই উৎফুল্ল হয় যে আইনস্টাইন বিধাতায় বিশ্বাস করেন। তাই তাঁকে সংবর্ধনা দিতে হবে। কিন্তু আইনস্টাইন বিশ্বাস করেন 'স্পিনোৎসার বিধাতায়', ইহুদির বিধাতায় নয়; ওই বিধাতা ধর্মীয় বিধাতা নন, তিনি হয়ে ওঠেন প্রকৃতির সুশৃঙ্খলা সূত্রের সমষ্টি। 'আপনি কি বিধাতায় বিশ্বাস করেন?'—এ-লঘু প্রশ্নের উত্তর বারবার দিতে হয়েছে তাঁকে; এবং তিনি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে-সব উত্তর দিয়েছেন (তাঁর দুটি বিখ্যাত উক্তি : 'বিধাতা বিশ্ব নিয়ে পাশা খেলেন না'; 'বিধাতা সূক্ষ্ম, তবে তিনি বিদ্বেষপরায়ণ নন'), সেগুলোর অর্থ দাঁড়ায় তিনি বিধাতায়—যে-বিধাতা মানুষের পাপপুণ্য স্বর্গনরক নিয়ে ব্যস্ত—, ও প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে পাওয়া ধর্মে বিশ্বাস করেন না।

আইনস্টাইন মহাবিজ্ঞানী; কিন্তু কোনো মহাবিজ্ঞানী বিধাতায় বিশ্বাস করলেই কি প্রমাণিত হয়ে যান বিধাতা? বিজ্ঞানীরাই কি বিধাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত বিশেষজ্ঞ? বিধাতা সম্পর্কে শেষকথা কি শুনতে হবে বিজ্ঞানীদেরই কাছে? বিজ্ঞানীদের মুখে 'বিধাতা আছেন' শুনে যারা মনে করে প্রমাণিত হয়ে গেছেন বিধাতা, আর কোনো সন্দেহ নেই তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তারা আসলে অবিশ্বাসী; গোপনে গোপনে তারা সন্দেহ পোষণ করে তাদের ধর্মপ্রবর্তকে ও ধর্মগ্রন্থে। বিজ্ঞানীমাত্রই মুক্ত মনের মানুষ নন, বহু বিজ্ঞানী ছিলেন ও আছেন, যাঁরা অত্যন্ত কুসংস্কারগ্রস্ত; যেমন—নিউটন, ও সাম্প্রতিক সালাম। নিউটন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে বিধাতাকে পরিণত করেছিলেন এক অন্ধ ঘড়িপ্রস্তুতকারীতে, যে ঘড়ি তৈরি ক'রে দম দিয়ে দিয়েছে, তার আর কিছু করার নেই; কিন্তু নিজে কয়েক হাজার পাতা লিখেছিলেন ধর্মের পক্ষে; তবে তা প্রকাশ করেন নি। সালামের জন্যে আমার মায়া হয়, তাঁকে আমার এক করুণ প্রহসনের নায়ক ব'লেই মনে

হয়। মুসলমানেরা তাঁকে মুসলমান ব'লে স্বীকার করতো না, কিন্তু তিনি নিজেকে মনে করতেন অন্ধ মুসলমান। খুবই সংকীর্ণ এলাকায় আজকাল কাজ করেন বিজ্ঞানীরা, কোনো এলাকায় নোবেলপ্রাপ্ত অন্য এলাকা সম্পর্কে অজ্ঞ হ'তে পারেন চৌরাস্তার মুদিটির মতোই। বিধাতা মহাজগত ঘেঁটে প্রমাণ করার বস্তু নন, তিনি ধরা পড়বেন না হাবেল টেলিস্কোপে, তাঁর ছবি ওই দূরবীক্ষণযন্ত্রের ক্যামেরা তুলতে পারবে না। বিধাতাকে মহাজগতে খুঁজতে হবে না, খুঁজতে হবে মানুষের ইতিহাসে; খুঁজে দেখতে হবে তাঁকে/ তাঁদের কখন সৃষ্টি করেছে মানুষ; মানুষের কোন দুঃস্বপ্ন থেকে উৎপত্তি হয়েছে তাঁর/তাঁদের।

ধার্মিকেরা মনে করে আকাশমণ্ডল, ওই গ্রহতারাচাঁদ, প্রকাশ করছে বিধাতার গৌরব; আর ধুলোবালিপাথরজলের পৃথিবী হচ্ছে বিধাতার হস্তকর্ম। *পুরোনো বাইবেল*-এ এমন একটি গীত রয়েছে, ওই গীত কোনো সত্যের প্রকাশ নয়, ওই গীত জেগেছিলো মহাজগতকে বুঝতে না পারা মানুষের মনে। ওই তারকাপুঞ্জ, ওই নতুন একফালি বা পূর্ণিমার ধবধবে চাঁদ, ওই সোনালি সূর্য বিধাতার গৌরব গাইছে না, ওগুলো আমাদের চারপাশের ধুলোবালির থেকে সামান্যতম পরিমাণেও পবিত্র নয়। চাঁদে বেশ আগেই মানুষ ফেলে এসেছে তার পায়ের ছাপ। বিজ্ঞানীরা, বিশেষ ক'রে এ-বিষয়ে ভাবেন যে-বিজ্ঞানীরা, তাঁরা কী মনে করেন বিধাতা ও বিধাতার সৃষ্টি বা হাতের কাজ সম্পর্কে? তাঁরা মনে করেন যদি আবিষ্কার করা যেতো এমন কোনো প্রাকৃতিক সূত্র, যা বিধাতার কাজ সম্পর্কে আমাদের দিতো বিশেষ ধারণা, তাহলে ওই সূত্র হতো প্রকৃতির চূড়ান্ত সূত্র। প্রকৃতির ওই শেষসূত্র যদি বের করা যেতো, তাহলে আমরা জানতাম সে-সূত্রগুলো, যা চালাচ্ছে মহাজগতের সব কিছু। স্টিফেন হকিং এ-সূত্রগুলোকেই বলেছেন 'বিধাতার মন' বা 'the mind of God'। বিজ্ঞানীরা God শব্দটি মাঝেমাঝে ব্যবহার করেন; তবে ওই বিধাতা কোনো বিশেষ ধর্মের বিধাতা নন; ওটি রূপক, প্রাকৃতিক চূড়ান্ত সূত্রগুলোর রূপক হচ্ছে 'বিধাতার মন'। অনেক মানুষের মনেই বিধাতার ধারণা অত্যন্ত বিস্তৃত ও নমনীয়; তারা সবখানেই দেখতে পেতে পারে তাদের বিধাতাকে। তাদের প্রয়োগে বিধাতা এক অস্পষ্ট ধারণা, সেটি বহুঅর্থময়। স্টিভেন হ্বেইনবার্গ বলেছেন, 'আপনি যদি বলেন যে বিধাতা হচ্ছেন শক্তি', তাহলে আপনি একতাল কয়লার মধ্যে বিধাতাকে পেতে পারেন।'

বিভিন্ন ধর্মের বিধাতারা একতাল কয়লার মধ্যে থাকেন না, পারমাণবিক ঘর্ষণের মধ্যে পাওয়া যাবে না তাঁকে/তাঁদের; তিনি/তাঁরা ছড়িয়ে থাকেন না বিশ্বের কল্পিত শৃঙ্খলা সুষমার মধ্যে। তিনি/তাঁরা নির্বিকার প্রাকৃতিক শেষসূত্র নন। তাঁকে/তাঁদের বুঝতে হবে ঐতিহাসিকভাবে, যেভাবে তাঁকে/তাঁদের কল্পনা করেছে মানুষ, যেভাবে আছেন তিনি/ তাঁরা বিভিন্ন ধর্মে ও ধর্মগ্রন্থে। ওই বিধাতারা নির্বিকার নিরাসক্ত উদাসীন নন তাঁদের ভক্তদের সম্বন্ধে, বরং অত্যন্ত বেশি, কখনো কখনো বিরক্তিকররূপে, আগ্রহী ও আসক্ত মানুষের সব কিছুতে; আর

ভক্তদের বিশ্বাসে তাঁরা বিশ্বজগতের স্রষ্টা, বিধানকর্তা, শেষ বিচারক। তাঁরা মানুষের অন্তরঙ্গতম ব্যাপারের ওপরও তীক্ষ্ণ চোখ রাখেন; এমনকি স্নানাগারেও নগ্ন স্নান করা যায় না, তাঁরা উঁকি দেন সেখানেও। বিজ্ঞানীরা মাঝেমাঝেই God বা বিধাতা শব্দটি এমনভাবে প্রয়োগ করেন যে তাঁর সাথে কোনো পার্থক্য থাকে না প্রাকৃতিক ধ্রুব সূত্রগুলোর। কিন্তু বিধাতা/বিধাতারা বিভিন্ন ধর্মের বিধাতা যাঁদের রয়েছে বিশেষ বিশেষ নাম। ওই বিধাতাদের, যাঁরা মানুষের জন্মমৃত্যু বিবাহ একবিবাহ বহুবিবাহ ভালোমন্দ পাপপুণ্য সঙ্গম জেনা বিহার বিপরীত বিহার প্রার্থনা উপবাস স্বর্গ নরক নিয়ে ভাবছেন নিরন্তর, যাঁরা আগ্রহী আসক্ত, তাঁদের কি পাওয়া যেতে পারে প্রকৃতির শেষসূত্রগুলোতে? বিজ্ঞানীরা বলেন তাঁকে/তাদের পাওয়া যাবে না প্রাকৃতিক শেষসূত্রে। বিজ্ঞানের সূত্রগুলো শীতল অবিচল নির্বিকার; মানুষ সম্পর্কে সেগুলোর কোনো আগ্রহ আসক্তি নেই, ওগুলো কোনো পাপপুণ্য স্বর্গনরক স্বকীয়া পরকীয়া পুজো আরাধনা উপবাস তীর্থযাত্রা জানে না। প্রতিবেশীকে ভালোবাসলে বা না বাসলে সেগুলোর কিছু যায় আসে না।

বিজ্ঞানহীন আদিম মানুষ করেছিলো মহজগতের রহস্যীকরণ; আর বিজ্ঞান যতোই এগিয়েছে ততোই করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ;—আকাশমণ্ডলকে উদ্ধার করেছে রহস্যজাল থেকে, করেছে মহাজগতের বিরহস্যীকরণ। কোপারনিকাস দাবি করেছেন পৃথিবী মহাজগতের কেন্দ্র নয়; গ্যালিলিও প্রমাণ করেছেন কোপারনিকাস সত্য; ব্রুনো জানিয়েছেন যে অজস্র নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটি নক্ষত্রমাত্র; নিউটন দেখিয়েছেন গতি ও মাধ্যাকর্ষণের একই সূত্র কাজ করে পৃথিবীতে ও সৌরলোকে, যে-সূত্রে গ্রহউপগ্রহ ঘোরে সেই একই সূত্রে আপেল পড়ে মাটিতে। এর ফলে ঘটতে থাকে আকাশমণ্ডলের বিরহস্যীকরণ। হাবেল এই বিরহস্যীকরণপ্রবণতাকে বেশ এগিয়ে দেন, দেখান যে মহাজগতে রয়েছে আরো অজস্র নক্ষত্রমণ্ডল (১৯২৯), বাড়ছে মহাজগত। আরিস্ততল, টলেমি ও ধর্মগ্রন্থের জগতের সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে চ'লে গেছেন হাবেল; কিন্তু কোথাও দেবদূত, বিধাতা, স্বর্গ নরক নামের বিখ্যাত ব্যাপারগুলো দেখতে পান নি। কোনো দিন দেখা যাবে না।

বিজ্ঞান শুধু মহাজগতকেই আদিম রহস্যজাল থেকে উদ্ধার করে নি, জীবন বা প্রাণকেও উদ্ধার করেছে। লাইবিগ, উনিশশতকেই, দেখিয়েছিলেন যে গবেষণাগারে প্রাণের উদ্ভব ঘটানো খুবই সম্ভব। তবে চার্লস ডারউইন ও আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ঘটান কালান্তর, উল্টেপাল্টে দেন ধর্মীয় বিশ্বাস; তাঁরা দেখান প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে, কোনো বিধাতার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, বিকশিত হ'তে পারে জীবন। জীবনকে রহস্যের জাল থেকে মুক্ত করা ধর্মীয় অনুভূতিকে অনেক বেশি আহত করে আকাশমণ্ডলকে রহস্যমুক্ত করার থেকে। ধর্মগুলো তাই পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কোলাহল করে না, করে জীববিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। তবে ধর্ম, বিশেষ ক'রে খ্রিস্টধর্ম, বারবার নিজেকে খাপ খাওয়ানোর

চেষ্টা করেছে বিজ্ঞানের সাথে; খাপ খাওয়াতে তার বিশেষ অসুবিধা হয় না, কেননা ধর্মকে টেনে নানা দিকে সুবিধা মতো ছড়ানো যায়। খ্রিস্টীয় যাজকেরা এক সময় বাধা দিতে চেষ্টা করে ডারউইনি বিবর্তনবাদকে, কেননা তা ধর্মবিরোধী; শেষে না পেরে বিবর্তনবাদকে ঘোষণা করে পরম বিধাতার মহাপরিকল্পনারূপে। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের তাল মেলানোর এটা এক করুণ হাস্যকর উদাহরণ। সত্যিই বিরোধ রয়েছে বিবর্তনবাদ ও বিধাতার মধ্যে। বিবর্তনবাদ মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে বিধাতা আদিকারণমাত্র, তিনি সূচনা করেছেন প্রাকৃতিক সূত্রগুলো, সচল করেছেন মহাজগতকে; তারপর আর তাঁর কোনো কাজ নেই, তিনি অবসর নিয়েছেন মহাজগতের সব কিছু থেকে। কিন্তু ধর্মগুলো অবসরপ্রাপ্ত বিধাতায় বিশ্বাস করে না। বড়ো কথা হচ্ছে ধর্মগুলো প্রথম দেখা দেয় নি আদিকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের মধ্যে, দেখা দিয়েছিলো এমন ব্যক্তিদের মনে, যাঁরা কল্পনা করেছিলেন মানুষের সমস্ত ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহী ও আসক্ত বিধাতাদের। কিছু কিছু কপট মানুষ, বিশেষ ক'রে রাজনীতিবিদেরা ও সুবিধাবাদী বিখ্যাত ব্যক্তিরা, ব'লে থাকেন যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; তবে এটা মিথ্যেকথা—ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী; বিজ্ঞান সত্যের সাধক আর ধর্ম মিথ্যের পূজারী।

বিজ্ঞানের সূত্রগুলোর রয়েছে সৌন্দর্য; কোনো দিন যদি আবিষ্কৃত হয় প্রকৃতির শেষসূত্র, যা ব্যাখ্যা করবে মহাজগতের সব কিছু, তাও হবে সুন্দর। তবে ওই সূত্রগুলোতে কোনো বিশেষ মর্যাদা পাবে না জীবন, মানুষ, বুদ্ধি। তাতে মিলবে না কোনো মূল্যবোধ বা নৈতিকতা বা ধর্ম; তাতে পাওয়া যাবে না কোনো বিধাতা, যিনি/যাঁরা মানুষ সম্পর্কে সর্বদা ভাবিত চিন্তিত উদ্বিগ্ন বিনিদ্র আসক্ত। বিজ্ঞান আজকাল মনে করে না যে বিধাতার অস্তিত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে মহাজগত ভ'রে ছড়িয়ে আছে জৈব উপাদান, যার ফলে মহাজগত ভ'রেই জন্মাতে পারে বুদ্ধিমান প্রাণী। এটা এখনো অনুমান; এটা ঠিক হ'লেও তা কোনো বিধাতার পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয় না। যতোই আবিষ্কৃত হচ্ছে মৌলিক ভৌত সূত্র, ততোই স্পষ্ট হচ্ছে যে ওগুলোর সাথে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই; ওগুলো মানুষের সংবাদ জানে না। প্রাকৃতিক সূত্রে মানুষ সম্পর্কে আগ্রহী কোনো বিধাতার উপস্থিতি নেই, পরিচয় নেই তাঁর কোনো পরিকল্পনার; ওই সূত্রে মানুষের বিশেষ মূল্য নেই। ওই সূত্রের কাছে 'অমৃতের পুত্র', 'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ' নিরর্থক। বিজ্ঞানীরা এখন ধর্ম ও বিধাতা সম্পর্কে ভাবেনই না, যদিও দু-একটি গোঁড়াও মিলবে। তাঁদের অধিকাংশ ধর্ম সম্পর্কে এতো অনীহ যে তাঁদের নাস্তিকও বলা যায় না। আজকাল যেমন রয়েছে ধর্মীয় মৌলবাদীরা, তেমনি আছে ধর্মীয় উদারতাবাদীরা। ধর্মীয় মৌলবাদীরা আদিম, তারা তাদের বিশ্বাসে অবিচল এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর; উদারতাবাদীরা বিভ্রান্তিকর।

উদারতাবাদীরা মনে করে মানুষ পোষণ করতে পারে নানা বিশ্বাস, এবং তাদের সবার বিশ্বাসই চমৎকার। তারা কেউ বিশ্বাস করতে পারে পুনর্জন্মে, কেউ অপুনর্জন্মে; কেউ বিধাতার ত্রিত্বে, কেউ নিঃসঙ্গ একাকীত্বে; এবং সবাই বিশ্বাস করতে পারে তাদের বিধাতাই সত্য, এসবই চমৎকার তাদের কাছে। কিন্তু একটি গোলমাল রয়েছে : ধার্মিকদের বিশ্বাস অবশ্যই ভুল; কিন্তু ধর্মীয় উদারতাবাদীদের এমনকি ভুলও বলা যায় না, তারা ভুলের থেকে বেশি ভুল।

১৯৮১তে স্টিফেন হকিং গিয়েছিলেন ভাটিকানের এক সম্মেলনে, যাতে ক্যাথলিক গির্জা স্বীকার করে যে গ্যালিলিওকে শাস্তি দেয়া ঠিক হয় নি; তারা অনুতপ্ত। পোপ উপদেশ দেন যে বিগ ব্যাংয়ের পর মহাজগতের বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে পারেন; তবে বিগ ব্যাং নিয়ে গবেষণা করা উচিত হবে না, কেননা সেটি ছিলো সৃষ্টির মুহূর্ত; তাই সেটি ছিলো বিধাতার কাজ। পোপ বিগ ব্যাংয়ের কথা শুনেছেন, কিন্তু ওই দিন হকিং যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা শোনেন নি। তাঁর মূল বক্তব্য ছিলো স্থান-কাল সসীম, তবে তার সীমারেখা নেই; অর্থাৎ মহাজগতের শুরু নেই, কোনো সৃষ্টির মুহূর্ত নেই; তাই কোনো বিধাতাও নেই। মহাজগত সম্পর্কে নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে হকিং বলেছেন :

> যতোদিন আমরা মনে করছি মহাজগতের একটা শুরু আছে, ততোদিন আমরা মনে করতে পেরেছি যে এর একজন স্রষ্টা আছেন। কিন্তু মহাজগত যদি হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ, যার কোনো সীমানা নেই, তখন তার কোনো শুরু থাকে না, শেষও থাকে না : তখন শুধু থাকে মহাজগত। তখন স্রষ্টার/বিধাতার কী দরকার?

এভাবেই নষ্ট হলো আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার অবিশ্বাস

এ-বইয়ের পরিচ্ছেদগুলো লেখার সময় মনে পড়েছিলো ম্যাথিউ আরনল্ডকে, যিনি একশো তিরিশ বছর আগে, ১৮৬৭তে, দেখেছিলেন আলো নিভে আসছে ফরাশি উপকূলে, আর সমুদ্রের ভাঁটার টানে শুনেছিলেন বিষাদের সুর। সমুদ্রের ভাঁটার টানে তিনি পেয়েছিলেন একটি রূপক—ধর্মীয় বিশ্বাসের অবসানের রূপক; এবং লিখেছিলেন একটি মহান কবিতা : Dover Beach। বাঙলায় এমন কবিতা কেউ লেখন নি—(বহু পরে সুধীন্দ্রনাথ বেদনাহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন 'শূন্যগর্ভ পুরাণ-সংহিতা'); আমাদের কবিদের হয়তো সমুদ্রের স্বরের সাথে বিশেষ পরিচয় নেই, এবং এখনো হয়তো তাঁদের বিশ্বাসের সমুদ্রে চলছে প্রচণ্ড জোয়ার। বিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের জন্যেই এক বড়ো আশ্রয়;—তা কোনো আশ্রয়ই দিতে পারে না, কিন্তু তারা মনে করে কোনো এক মহাশক্তিমান সব সময়ই তাদের সাথে রয়েছেন অভিভাবক হিশেবে। এক চমৎকার মতিভ্রম সুখী ক'রে রাখে তাদের। আমার এক ছাত্রীও একদিন বিচলিত হয়ে কেঁপে কেঁপে বলেছিলো, 'স্যার, বিশ্বাস না করলে আমরা বাঁচবো কী নিয়ে, আমরা কি নিঃস্ব হয়ে যাবো না, শূন্য মনে হবে না নিজেকে? আমাদের কী থাকবে?' আমি জানি বিশ্বাস মানুষকে শান্তি দেয়, নির্বোধ সুখে রাখে; কিন্তু শান্তি আর সুখ গর্দভদেরই উপভোগ্য, মানুষের নয়। বিশ্বাসকে যারা করেছে জীবনের বড়ো আশ্রয়, তারা ওটি হারাতে ভয় পায়; কেননা বিশ্বাসে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের সুখে রাখে অভ্যাস, তারা ভয় পায় অভ্যাস থেকে স'রে যেতে। একদিন মানুষ যখন মুক্ত হবে অলৌকিক বিশ্বাস থেকে, তারা ভয় পাবে না; কেননা অভ্যাস আর প্রথা তাদের পীড়ন করবে না। বিশ্বাস না থাকলেও জীবনে অনেক কিছু থাকে; সে-সবের জন্যেই জীবন যাপন করার উপযুক্ত। বিশ্বাসের থেকে বারান্দার চড়ুইটিও জীবনের জন্যে অনেক মূল্যবান; চড়ুইটি যা দিতে পারে বিশ্বাস তা দিতে পারে না। আমি বারবার বলেছি—'জীবন তাৎপর্যহীন'; এটা ভীতিকর মনে হবে অনেকের; আবার কেউ কেউ বলতে পারেন—'তাৎপর্য? তাৎপর্য থাকতে হবে কেনো জীবনের? আমার জীবন আছে, একদিন থাকবে না। এই তো সব।' আমাদের সমাজ আদিম; এখানে প্রশ্ন নেই, তাই যন্ত্রণাও নেই, রয়েছে বিভ্রান্ত বিশ্বাসের নিরন্তর নির্বোধ উত্তপ্ত উদ্দীপনা।

ম্যাথিউ আরনল্ড ভিন্ন সমাজের, তিনি কবি ও জ্ঞানী; তিনি দেখেছিলেন শেষ হয়ে আসছে বিশ্বাসের কাল; এবং তাঁরই মনে হয়েছিলো যে একদিন কবিতাই নেবে ধর্মের স্থান। আমি অবশ্য কবিতাকে ধর্মের মতো নিরর্থক মনে করি না; কবিতা ধর্মের স্থান নেবে—এটাও এক সুন্দর বাজেকথা; কবিতা থাকবে কবিতা হয়েই, কবিতাকে অন্য কারো জায়গা জুড়ে বসতে হবে না। অন্যদের তুলনায় তিনি বেশ আগেই দেখেছিলেন সত্যটি যে বিশ্বাসের সমুদ্রে ভাঁটা চলছে; কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যায় আরনল্ড যা বোধ করেছিলেন আবেগের ভেতর দিয়ে, রূপায়িত করেছিলেন যা রূপকে, একদল জ্ঞানী তা দেখছেন মগজ দিয়ে, এবং লিখছেন বিধ্বংসী বইপত্র। বেশ সংকটে তখন ইউরোপি সভ্যতার সব কিছু, তবে সবচেয়ে সংকটে ধর্ম। ডারউইন জীবন সৃষ্টির দায়িত্ব থেকে তখন মুক্তি দিয়েছেন বিধাতাকে, আর নিটশে ঘোষণা করেছেন 'বিধাতা মৃত'; তবে এগুলো নয়, ধর্মকে সবচেয়ে বেশি আহত করেন ধার্মিকেরাই। গবেষকেরা তখন বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন এমন এক খ্রিস্টধর্মীয় বিদ্যার, যার নাম 'উচ্চতর সমালোচনা' (আহা, কবে যে এ-বিদ্যার বিকাশ ঘটবে নবীন ধর্মগুলো নিয়ে); আর এ-বিদ্যাই বাজিয়ে দেয় বিশ্বাসের মৃত্যুঘণ্টা। ১৮৬০-এ বেরোয় *প্রবন্ধ ও সমালোচনা* নামে যাজকদের লেখা একটি বই, যাতে তাঁরা দাবি করেন খ্রিস্টধর্মীয় বইগুলোকেও বিচার করতে হবে অন্যান্য বইয়ের মতোই। এতে শুরু হয় কোলাহল, এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আনা হয় ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ। ফরাশি দেশে বেরোয় আর্নেস্ত রেনাঁর *জেসাসের জীবন*, জর্মনিতে বেরোয় স্ট্রাউসের একই বিষয়ের বই। ওয়েলহাউসেন *ইসরায়েলের ইতিহাস* নামক বইতে দেখান যে পুরোনো বাইবেলের কিছু অংশ লেখা হয়েছিলো মোজেসের অন্তত এক হাজার বছর পর। এটা এক বড়ো আঘাতের মতো দেখা দেয়, কেননা এতোদিন বিশ্বাস করা হতো বাইবেল হচ্ছে বিধাতার নিজের বাণী; তাই কোনো সন্দেহ নেই এ-বইয়ে। ১৮৭২ সালে জর্জ স্মিথ দেখান নুহের প্লাবনের উপাখ্যান আসলে এসেছে ব্যাবিলনের এক উপাখ্যান থেকে। এটা আরেক বড়ো আঘাত দেয় বিশ্বাসীদের মনে। দেখানো হয় যে বাইবেলের অনেক কিছুরই মিল রয়েছে ব্যাবিলন ও অন্যান্য প্রাচীন জাতির উপাখ্যানের সাথে, যাদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিলো ইহুদিদের। এর ফলে ধসে পড়তে থাকে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মীয় বিশ্বাস। আরনল্ড শুনেছিলেন বিষাদের সুর; এ-বইগুলো কোনো সুর ধ্বনিত করে না, চারদিকে ছড়িয়ে দেয় ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ।

বিশ্বাসের অবসানের কাল এসে গেছে, ভাঁটায় গড়াচ্ছে তার সমুদ্র—আরনল্ড এটা অনুভব করেছিলেন অনেকেরই আগে। বেদনা বোধ করেছিলেন তিনি, তবে হাহাকার করেন নি। ওই বেদনা থেকে জন্মেছিলো তাঁর মহান কবিতা 'ডোভার সৈকত'। তাঁর কবিতাটিকে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ভাঁটার কবিতা মনে হয় না

আমার; সমস্ত বিশ্বাসের ভাঁটার কবিতাই মনে হয় এটিকে। কবিতাটি পড়তে ইচ্ছে করছে আমার। কবিতাটি অনুবাদ করতে চাই আমি।

ডোভার সৈকত

ম্যাথিউ আরনল্ড

সমুদ্র প্রশান্ত আজ রাতে।
ভরা জোয়ার এখন, ভাসে রূপবতী চাঁদ
প্রণালির জলের ওপরে;—ফরাশিদের উপকূলে
আলো মৃদু হয়ে নিভে গেলো এইমাত্র; বিলেতের উপকূলশৈলগুলো,
মৃদু আলোকিত ও বিস্তৃত, দাঁড়িয়ে রয়েছে শান্ত উপসাগরের থেকে মাথা তুলে।
জানালার ধারে এসো, কী মধুর রাতের বাতাস!
শুধু, পত্রালির দীর্ঘ সারি থেকে
যেখানে সমুদ্র মেশে চাঁদের আলোয় শাদা তটদেশে,
শোনো! তুমি শোনো ঢেউয়ের টানে স'রে-যাওয়া নুড়িদের
ঘর্ষণের শব্দ, এবং অবশেষে,
যখন ফিরে আসে উচ্চ বালুময় তটে,
শুরু হয়, আর থামে, তারপর শুরু হয় পুনরায়,
কোলাহলপূর্ণ ধীর লয়ে, এবং বয়ে আনে
মনে বিষাদের চিরন্তন সুর।

সোফোক্লিজ বহুকাল আগে
শুনেছিলেন এ-সুর অ্যাজিআনে, আর এটা তাঁর মনে
বয়ে এনেছিলো মানুষের দুর্দশার
ঘোলাটে জোয়ার-ভাটা; আমরাও
এই শব্দে পাই একটি ভাবনা,
সেই সুর শুনে এই দূর উত্তর সাগরের তীরে।

বিশ্বাসের সমুদ্রও
একদিন ছিলো ভরপুর, এবং পৃথিবীর তটদেশ ঘিরে
ছিলো উজ্জ্বল মেখলার মতো ভাঁজেভাঁজে।
কিন্তু এখন আমি শুধু শুনি
তার বিষণ্ন, সুদীর্ঘ, স'রে-যাওয়ার শব্দ,
স'রে যাচ্ছে, রাত্রির বাতাসের শ্বাস, বিশাল বিষণ্ন সমুদ্রতীর,
আর বিশ্বের নগ্ন পাথরখণ্ডরাশি থেকে।

আহা, প্রিয়তমা, এসো আমরা
সৎ হই একে অপরের প্রতি! কেননা এই বিশ্ব, যা আমাদের সামনে
স্বপ্নের দেশের মতো ছড়িয়ে রয়েছে ব'লে মনে হয়,
যা এতো বৈচিত্রপূর্ণ, এতোই সুন্দর, এমন নতুন,
তার সত্যিই নেই কোনো আনন্দ, কোনো প্রেম, কোনো আলো,
নেই কোনো নিশ্চয়তা, নেই শান্তি, নেই বেদনার শুশ্রূষা;
আর আমরা এখানে যেনো এক অন্ধকার এলাকায়,
ভেসে যাচ্ছি যুদ্ধ ও পালানোর বিভ্রান্ত ভীতিকর সংকেতে,
যেখানে মূর্খ সৈন্যবাহিনী রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধে ওঠে মেতে।

আরনল্ড শেষে আর অলৌকিক বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকেন নি, মুখোমুখি হয়েছেন লৌকিক বিশ্বাসেরও, প্রেম ও দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর,—Where ignorant armies clash by night: যেখানে মূর্খ সৈন্যবাহিনী রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধে ওঠে মেতে। আমরা এখন তার থেকেও অন্ধকার সময়ে রয়েছি।

সারাক্ষণ আমি ভাবি না বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে, বিশ্বাসের ব্যাপারটি ভুলেই থাকতে পারি, ভুলেই থাকি; তার থেকে অজস্র আকর্ষণীয়তায় ভ'রে আছে পৃথিবী ও জীবন। এই রোদ অজস্র বিশ্বাসের থেকে চিরন্তন, এই বৃষ্টি মূল্যবান লাখ লাখ বিশ্বাসের থেকে, কর্কশ কাকের ডাককেও মনে হয় পাঁচ কোটি বিশ্বাসের থেকে সুখকর; আর রয়েছে মানুষের শরীর, এবং রয়েছে বই। বার্ট্রান্ড রাসেল যখনই উল্লেখ করেছেন ধর্মগুলোর নাম, তখনই নাম করেছেন চারটি ধর্মের : ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম, ও সাম্যবাদ। সাম্যবাদও ধর্ম তাঁর কাছে, শুনে অনেকেই বিস্মিত হবে এতে প্রথম; কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যার পর আর সন্দেহ থাকে না যে ওটিও একধরনের ধর্ম। সব ধর্মই নিয়ন্ত্রণবাদী, সাম্যবাদও তাই; তবে এর সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এর কোনো বিধাতা নেই। ধর্মগুলো সাধারণত টিকে থাকে রাষ্ট্রনির্ভর ক'রে, কিন্তু রাষ্ট্রের ওপরও থাকতে হয় একজন বিধাতা : রাষ্ট্র ও বিধাতা মিলেই টিকিয়ে রাখে ধর্মগুলোকে। ধর্মের প্রবক্তারা জানেন বিধাতা সরাসরি কাজ করেন না, বাণী দিয়েই শেষ হয় তাঁর কাজ; তাই দখল করতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্র; রাষ্ট্রযন্ত্রই তখন কাজ করবে বিধাতার। কয়েক শতাব্দী ধ'রে উৎপীড়িত হয়ে খ্রিস্টানরা যেদিন দখল করে রোমীয় সাম্রাজ্য, তখন থেকে তাদের বিধাতার আর কোনো কাজ থাকে না; তারাই তখন পীড়ন করতে থাকে অন্যদের। ইসলাম ব্যাপারটি বুঝেছিলো শুরুতেই, তাই শুরুতেই দখল করেছিলো রাষ্ট্রযন্ত্র; যা নানা বাঁক নিয়ে ধারাবাহিকভাবে চলছে এখনো। জয়ীর মতো সফল আর কেউ নয়; কিন্তু জয় উৎকর্ষ বোঝায় না, পৃথিবী ভ'রে বারবার জয়ী হয়েছে নিকৃষ্ট, পরাভূত হয়েছে উৎকৃষ্ট। তবে জয়ী টিকে থাকে।

আমি আর দ্বিতীয়বার জীবন যাপন করতে চাই না; পুনর্জন্ম আর পরলোকে উত্থান আমার কাছে হাস্যকর, এমনকি কেউ যদি আমাকে আবার বাল্যকালে

পৌঁছে দিতে পারে, যাপন করতে দেয় আমার ফেলে-আসা বাল্যজীবন, আমি তাতে রাজি হবো না, যদিও বাল্যকাল আমার অত্যন্ত প্রিয়, এবং তা আমাকে দিন দিন আরো ব্যাকুল করছে। বাল্যকালে আমার একটি বড়ো সুখ ছিলো যে বিশ্বাস করতে হতো না। ধর্ম রাড়িখালে গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছিলো আমার বাল্যকালেই; ও নিয়ে কেউ মাতামাতি করতো না—কিন্তু এখন মাতামাতি শুরু হয়েছে। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নিজেদের মতো ক'রে তাঁদের বিধাতাকে বিশ্বাস করতেন, বিধাতা বলতে তাঁরা কী বুঝতেন, তা কেউ জানেন না। তাঁদের আমি বেশি মছিদে, মসজিদকে তাঁরা 'মছিদ' বলতেন—শব্দটিকে তাঁরা বাঙলা ক'রে নিয়েছিলেন, যেতে দেখি নি; নামাজ পড়তেও দেখেছি খুবই কম। তাঁদের সময়ই ছিলো না; সেই সকালে তাঁরা ক্ষেতে যেতেন, চাষ করতেন, বা ধান বুনতেন, বা গরু চরাতেন, তাঁদের ঘরে ফেরার ঠিক ছিলো না। ধর্মকর্ম ছিলো বিশেষভাবে নারীদের কাজ; তারাও তা যে ঠিকমতো করতেন, তা নয়। মাকে একবার আমি একটি সুরা বলতে বলেছিলাম, মা প্রথম রাজি হয় নি, পরে যখন বলে, দেখতে পাই তা অনেকখানিই ভুল। রাড়িখালের অধিকাংশই ধর্মের পদগুলো ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারতেন না; আজও পারেন না, কিন্তু তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে নি। এখন অবশ্য রাড়িখালে আমি অদ্ভুত শাদা লম্বা পোশাকপরা লোকদের ঘুরতে দেখি, যখনই গ্রামে যাই, তারা রাড়িখালের নয়, তাদের ভাড়া ক'রে আনা হয়েছে; আর তারা যখন ওই অদ্ভুত পোশাক প'রে পথ দিয়ে হাঁটে রাড়িখালের চাষীরা নরকের ভয়ে হয়তো কেঁপে ওঠে। রাড়িখালে এখন মাইক্রোফোনে ধর্মচর্চা হয়, যেমন ডিশ অ্যান্টেনায় চর্চা হয় সংস্কৃতির। কিন্তু পাতার ফাঁক দিয়ে ভোরে কারো মধুর কণ্ঠ ভেসে আসে না, ভেসে আসে মাইক্রোফোনের ঘড়ঘড় শব্দ। কয়েক দিন আগে ভোরের আগে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো; হঠাৎ আমি চারদিকে থেকে ছুটে আসা অজস্র মাইক্রোফোনের প্রচণ্ড ও অস্পষ্ট শব্দে কেঁপে উঠি। কোনোটির কথাই বুঝতে পারছিলাম না, আমি, যদিও আমি বোঝার খুবই চেষ্টা করছিলাম; আমি শুনতে পাচ্ছিলাম শুধু নিরন্তর গোলমাল। আমি শুনেছি একদিন নাকি পবিত্র বইগুলোর অক্ষররাশি মুছে যাবে, পবিত্র শ্লোকগুলো অর্থের বদলে প্রচার করবে গোলমাল। সে-সময় কি এসে গেছে এরই মাঝে?

ইস্কুলে যতোই ওপরের ক্লাশে উঠতে থাকি আমি, ততোই আমার সুখ কমতে থাকে; দেখতে পাই বইগুলো বিশ্বাস করতে বলছে, অনেকের স্তব করতে বলছে। ইতিহাস বই পড়তে গিয়ে মুগ্ধ না হয়ে আমি হয়ে উঠি সন্দেহপরায়ণ; ওই বইগুলোতে দেখি রাজাদের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস, যা আমার ভালো লাগে নি। বাঙলা বইগুলোতে যাঁদের লেখা থাকতো, শেষ দিকে থাকতো তাঁদের জীবনীও; ওই জীবনীতে খুবই প্রশংসা করা হতো তাঁদের, কিন্তু আমি বুঝে উঠতে থাকি যে ওই লেখকেরা অতো প্রশংসা পেতে পারেন না। মোঃ বরকতউল্লাহ্‌র দু-তিনটি লেখা

পড়তে হয়েছিলো ওপরের শ্রেণীতে; লেখকপরিচিতিতে বলা হয়েছিলো তিনি দার্শনিক; ওই বয়সে দার্শনিক কী, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, কিন্তু বুঝতে পারি যে তাঁর লেখায় কোনো প্রশ্ন নেই, নানা ভক্তি আছে, কতকগুলো পুরোনো কথা আছে। একটি লেখায় শেখ সাদিকে তিনি এক অলৌকিক মানুষে পরিণত করেন; আমরাও খুব অনুরক্ত হই সাদির; কিন্তু প্রতিশ্রুতিমতো বন্ধুর মৃত্যুর দিনে বন্ধুর বাড়িতে তাঁর আসা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি আমার, যদিও আমার বন্ধুরা ওই অলৌকিক ঘটনায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়। ওপরের শ্রেণীতে দুটি ঘটনা আমাকে নাড়া দেয়। প্রথমটি হচ্ছে দ্বিতীয় মওলানাসাব এক স্যারকে লাঠি দিয়ে মারতে যান, কেননা স্যার বলেছিলেন ধর্মের বইগুলো গল্পের বই; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয় পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সোরাওয়ার্দির একটি ভাষণ মুখস্থ করতে। প্রথম ঘটনাটি ইস্কুলে সাড়া জাগিয়েছিলো; দ্বিতীয়টি ঘটেছিলো নীরবে। সবাই ওই বক্তৃতা মুখস্থ করেছিলো, আমি করি নি; আমার মনে হয়েছিলো ওই নিকৃষ্ট বক্তৃতাটি আমি কেনো মুখস্থ করবো? তিনি শক্তিমান ব'লে? আমি কামিনী রায়ের কবিতা মুখস্থ করতে পারি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ মুখস্থ করতে পারি না।

দিন দিন আমার ভেতরে অবিশ্বাস জ'মে উঠতে থাকে; মনে হ'তে থাকে যা কিছু চলছে, যা কিছুকে খুবই মহৎ মনে করা হয়, তা অতো মহৎ নয়; যা কিছুকে সত্য মনে করা হয়, তার সবই সত্য নয়; যা কিছুকে মান্য করতে বলা হয়, তার সবই মাননীয় নয়।—কিন্তু আসলেই কিসে অবিশ্বাস আমার? দেখতে পাই আমার অবিশ্বাস শক্তিতে;—যা কিছু শক্তিমান, দর্পশালী, যা কিছু পীড়ন করে মানুষকে, তাতেই ক্রমশ আমার অবিশ্বাস গভীর হ'তে থাকে। বিনা প্রশ্নে কিছু মেনে নিতে আমার ইচ্ছে করে না; আর যা-কিছু সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ নেই, যা-কিছুর স্তুতি ক'রে অন্যরা সুখ পায়, সেগুলোতেই আমার বেশি সন্দেহ হ'তে থাকে। এখানে এখন সবাই শক্তির পূজারী; তারা বিধাতায় বিশ্বাস নাও করতে পারেন, কেননা কল্পিত বিধাতা সরাসরি নিজের শক্তি প্রয়োগ করেন না; কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন নেতায়, নায়কে, একনায়কে, পিতায়, রাষ্ট্রপিতায়, প্রথায়, ও আরো অজস্র বস্তুতে; কেননা এগুলো শক্তিমান। আমি শক্তিতে বিশ্বাস করি না, আমি অবিশ্বাস করি শক্তিতে, ক্ষমতায়, দর্পে। আমার সমস্ত অবিশ্বাস জন্মেছে শক্তিতে অবিশ্বাস থেকে। শক্তি অমানবিক, শক্তি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মূল্য দেয় না; শক্তি সব ধরনের যুক্তি ও মানবিকতাকে পর্যুদস্ত করতে চায়। নিটশে বিশ্বাস করতেন, এবং নিটশেকে গালি দিয়েও সবাই হিটলারের মতোই বিশ্বাস করে, যে 'জীবন শক্তিলাভের বাসনা ছাড়া আর কিছু নয়।' আমি মেনে নেই নিটশেকে যে সবাই প্রচণ্ড শক্তি চায়, যারা যতো আদিম তারা ততো বেশি শক্তি চায়;—শক্তি : সীমাহীন, অযৌক্তিক, প্রচণ্ড, অমানবিক; কিন্তু আমি ওই শক্তির প্রতিপক্ষ, আমি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই। কামিনী রায় বা জসীমউদ্‌দীন আমার শ্রদ্ধেয়

পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী আর আলেকজান্ডারের থেকে। শক্তিমানেরা তুচ্ছ, তারা ইতিহাসের পরিহাস; তাদের শ্রদ্ধা করার কিছু নেই। আমার ছেলেবেলায় চারপাশে খুবই প্রশংসা শুনতাম হিটলার আর নেপোলিয়নের; আমাদের বইতে তাদের সম্পর্কে লেখাও ছিলো; কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারতাম কেনো তাদের মহাপুরুষ ভাববো। তাদের আমি কখনো মহাপুরুষ ভাবি নি। শক্তি সব সময়ই দূষিত ও ক্ষতিকর, শক্তি রোগের মতো। আমি ঘৃণা করি শক্তি ও শক্তিমানদের, অবজ্ঞা করি শক্তি ও শক্তিমানদের; তারা রোগ; তারা দূষিত করে মানুষকে, নষ্ট করে মানুষের মস্তিষ্ক আর হৃদয়।

ভক্ত কখনো আমি হ'তে পারি নি, যদিও আমি অনেকেরই অনুরাগী। আমি দেখেছি অনেক প্রতিভাবান মানুষ বেঁচে থাকেন কারো উপগ্রহরূপে; ওভাবে বেঁচে থাকাতেই গৌরব বোধ করেন তাঁরা, ধন্য হয় তাঁদের জীবন; এটা আমার কাছে মর্মান্তিক। ভক্ত হ'লে নানা বাস্তব স্বার্থ চরিতার্থ হয়; তবে ভক্ত হওয়ায় মূলে থাকে বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক কারণ। ভক্তরা মহিমা অর্জন করে দেবতাদের সংস্পর্শে। ভক্তরা জানে, বা তাদের অবচেতন মনে একটি বোধ কাজ করে যে তারা দেবতা হয়ে উঠবে না কিন্তু দেবতার মহিমা তাদের ভেতরে সঞ্চারিত হোক, এটা তারা চায়; তাই দেবতার পায়ে আত্মোৎসর্গ ক'রে তারা অর্জন করে মহিমা। কোনো কোনো দার্শনিক প্রচার করেন যে মানুষের থাকা উচিত বিশ্বাস করার বসনা—'উইল টু বিলিভ'; আমি এটাকে খুবই বাজে দর্শন ব'লে মনে করি; আমি, অনেকটা রাসেলের মতোই, মনে করি মানুষের থাকা উচিত সন্দেহ করার, এমনকি অবিশ্বাস করার বাসনা। বিশ্বাস খুবই ক্ষতিকর। ধর্মের বইগুলো নির্দেশ দেয় বিশ্বাস করতে, বলে ওগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তন সত্য; তবে নির্দেশ মাত্রই অবিবেচিত শক্তির প্রকাশ। ওগুলোতে যদি সত্যিই চিরন্তন সত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হ'তে পারে না; কিন্তু আমরা কি একটু বিচার ক'রে দেখতে পারি না কাকে বলে চিরন্তন সত্য? চিরন্তন সত্য হচ্ছে, ওই বইগুলোর মতে, একরাশ নির্দেশ যা মানতে হবে বিনাপ্রশ্নে। ধর্মের বইগুলোর রীতি ঢুকে গেছে আমাদের সব কিছুতেই। রবীন্দ্রনাথ এখন বেশ বড়ো রকমের এক দেবতা হয়ে উঠেছেন বাঙালির; আমি তাঁর প্রতিভার অনুরাগী, কিন্তু আমি মনে করি না যে তিনি বিচারের ওপরে।

মানুষ অজস্র ব্যাপার মেনে চলে, বা মেনে চলতে বাধ্য হয়, যেগুলোকে তারা ধ্রুব মনে করে, বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে ওগুলোর মধ্যে রয়েছে মহত্ত্ব। তবে ওগুলোতে নেই কোনো মহত্ত্ব বা ধ্রুবতা, সব বিশ্বাসই অচিরজীবী ও আসার; ওগুলোর বড়ো অংশই আদিম পুরোনো কিছু মানুষের খামখেয়াল বা স্বার্থ বা বিশ্বাসের বাস্তবায়ন। কিছু মানুষ সব সময়ই হয় আত্মগর্বী উন্মাদ, যারা চায় অন্যদের জীবনকে নিজের চিন্তার মাপে কাটতে ও শেলাই করতে; তাই অধিকাংশ

মানুষ নিজেদের জীবন যাপন করতে পারে না, করে পরের জীবন যাপন, কিছু প্রাচীন মানুষের পরিকল্পিত উদ্ভট জীবন। জীবনযাপনে মানুষ প্রাচীন উদ্ভট পরিকল্পনার বন্দী; পুরোনো কালের কিছু মানুষ হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে আধুনিক কালের মানুষদের। তাই মানুষ ভালো নেই, মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ; মানুষ যাপন করছে পোকার জীবন। মানুষের সবচেয়ে বড়ো রোগ অবশ্যই দারিদ্র্য, ওই দারিদ্র্যও সৃষ্টি করেছে মানুষ; তবে দারিদ্র্য পেরিয়ে গিয়ে পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রও, সভ্যতায় মানুষ যে-জীবন যাপন করে, তা মানুষকে অসুস্থ অসুখী ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, সভ্যতা একরাশ হাস্যকর বিধিবিধানের সমষ্টি, জমকালো কুচকাওয়াজের মতোই হাস্যকর, তাতে প্রচুর রয়েছে উচ্চরোল, অভিবাদন, দৃঢ় পদক্ষেপ; কিন্তু সবটাই অসার। বিধিবিধান মানুষের স্বভাববিরোধী, কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে মানুষই তৈরি করেছে বিধিবিধান, আর কোনো প্রাণী করে নি। তবে মানুষ কখনোই আন্তরিকভাবে মেনে নেয় নি, বিধিবিধান; সাধারণত যারা বিধান তৈরি করে, সেই শক্তিমানদের প্রথম কাজই হয় বিধান ভাঙা, কিন্তু তারা বিধান দিয়ে বেঁধে ফেলে অধিকাংশ মানুষকে। মানুষ ভালো নেই; মানুষের মুখের দিকে তাকালে কারো মুখে আমি ভালো থাকার ছাপ দেখি না;—অরিস্ততলের মুখে দেখতে পাই ভালো না থাকার দাগ, যাজ্ঞবল্কের মুখেও দেখি, সম্রাট ও দস্যুদের মুখে দেখি ওই দাগ, রবীন্দ্রনাথের মুখেও দেখি; ফেরিঅলার মুখেও দেখতে পাই একই দাগ—মানুষ ভালো নেই। আমার মুখেও দেখি একই দাগ।

জীবনে মানুষ জীবন যাপন করে না; যাপন করে অন্য কিছু; জীবনযাপনের নামে মানুষ ক'রে চলেছে প্রথাযাপন। প্রথা জীবনের শত্রু, প্রথা জীবনকে নিরক্ত ক'রে তোলে, তার ভেতর থেকে শুষে নেয় প্রাণ; কিন্তু প্রথায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে প্রথাকেই মনে হয় জীবন। অধিকাংশ মানুষ প্রথা যাপন ক'রে গৌরব বোধ করে যে তারা জীবন যাপন করছে। প্রথার হাত এমন তুষারশীতল যে তার ছোঁয়ায় একান্ত মানবিক উষ্ণ ব্যাপারগুলোও তুষারিত হয়ে যেতে পারে, তাতে আর থাকে না কোনো মানবিক তাপ। যে-সমাজে প্রথার পরিমাণ যতো বেশি, তার মানুষ ততো মৃত, নিরক্ত, অসুস্থ, বিকৃত, ততো প্রতিভাহীন; সেখানে দিকে দিকে দেখতে পাওয়া যায় লাশ, দেখা যায় বিকৃত অসুস্থ মানুষ। প্রথার বাইরে গেলে মানুষ সুস্থ ও সৎ হয়ে ওঠে, কমে তার কপটতা; তখন সে মানুষ হয়ে ওঠে। প্রথা হচ্ছে সে-সমস্ত বিধান, যেগুলোর কোনো অন্তঃসার নেই, কিন্তু মেনে চলতে বাধ্য হয় মানুষ। প্রথা জীবনের মৃতরূপ, জীর্ণ লোকাচার, স্রোতহীনতা, শৈবালাচ্ছন্নতা। প্রথাগুলো, সাধরণত, মানুষ পায় ধর্ম থেকে; জীবনকে প্রথায়, নিরর্থক রীতিতে, পরিণত করাই ধর্মের কাজ। ধর্মের কোনো উপকারিতা নেই, বস্তুগতভাবে কখনোই প্রমাণ করা যাবে না যে এর রয়েছে উপকারিতা; তবে এর অপকারিতা

রয়েছে প্রচুর, বস্তগতভাবে সব সময়ই তা প্রমাণ করা যায়; কিন্তু ধর্ম যেহেতু শক্তিশালী, সব সময় মানুষকে রাখে সামাজিক ও মহাজাগতিক ভয়ের মধ্যে, তাই ধর্মের অপকারিতার কথা কেউ বলে না। মহাজাগতিক ভয়ের থেকে অবশ্য সামাজিক রাষ্ট্রিক ভয়ের পরিমাণ বেশি; কেননা অধিকাংশ সমাজ ও রাষ্ট্রও কাজ করে ধর্মের রক্ষীবাহিনীরূপে, তার তৎপরতার কোনো শেষ নেই। ধর্ম ও ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এক বড়ো সম্পর্ক; ধর্মের বিধাতাদের কল্পনা করা হয় সর্বশক্তিধররূপে, আর ধর্মও ক্ষমতা ছাড়া চলতে পারে না।

বাল্যকাল, এখন, আক্রান্ত তিনটি আদিম শক্তি—রাজনীতি, ধর্ম, ও কাম—দিয়ে, যেগুলোর পীড়নে বাল্যকাল থেকে ঝ'রে যাচ্ছে সমস্ত স্বপ্ন সমস্ত সুখ; আমার বাল্যকাল আক্রান্ত ছিলো একটি আদিম শক্তি—রাজনীতি দিয়ে। গ্রামে গিয়ে পৌঁছোতো একের পর এক দীর্ঘ দূরবর্তী নাম : কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলি খান, ফিল্ডমার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান—এসব গিয়ে পৌঁছোতো, আমরা এসব নামকে দেবতাদের নাম, যদিও মুসলমানের দেবতা নেই, মনে ক'রে মুখস্থ করতাম; নামগুলো পুরোপুরি বলতাম যাতে প্রকাশ না পায় অবিনয়। মুসলমানরা নামের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর, তারা নামের ডানে বাঁয়ে নানা বস্তু লাগিয়ে থাকে, যা মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন আরবের একটি বিশ্বাস যে নামের সাথে রয়েছে যাদুর সম্পর্ক। আরবরা আসল নাম গোপন ক'রে রাখতো, ব্যবহার করতো আবু লাহাব বা আবু হুরায়রার মতো অভিধা, যাতে কেউ যাদু করতে না পারে;—যাদু করার জন্যে দরকার আসল নাম! বাঙালি মুসলমান কেমন পাগল ছিলো ওসব পাকিস্তানি নামে, তা কি আমি দেখি নি? দীর্ঘ দেহের ওই সব ক্ষুদ্র মানুষদের দ্বারা কেমন বিহ্বল ছিলো বাঙালি মুসলমান, তা কি আমি ভুলে গেছি? মুসলমানের কাছে তাদের অতীদের সব নাম ও সব কিছু পবিত্র, তাই তাদের সম্পর্কে কোনো কথা বলা যায় না। আমি একবার মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ বলেছিলাম, এক স্যার তাতে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, আমাকে দিয়ে কয়েকবার কায়েদে আজম বলিয়েছিলেন। তিনি কায়েদে আজম, জাতির পিতা, তিনি ছাড়া মুসলমানরা থাকতো হিন্দুদের চাকর, এসব বলেছিলেন স্যার। তখন থেকেই এসব নামে আমার বিরাগ দেখা দিতে থাকে, ঘেন্না লাগতে থাকে রাজনীতিক দেবতাদের। ছাত্রজীবন থেকে আজ পর্যন্ত নানা রাজনীতিক বিধাতা সম্পর্কে কবিতা লেখার চাপ পড়েছে আমার ওপর;—আমি তা অবহেলা ক'রে গেছি; আমার খুব ভালো লাগে যে আমার বন্ধুরা অবলীলায় রাজনীতিক বিধাতার পর বিধাতা নিয়ে কবিতা লিখে ফেলেন, বিহ্বল হয়ে ঘোষণা করেন যে ওই বিধাতারা না থাকলে থাকতেন না তাঁরা, কিন্তু আমি কখনো ওই রকম আবেগ বোধ করি নি। রাজনীতিকদের আমার কখনো মনে হয় নি মহান, আমি তাঁদের মধ্যে দেখেছি শক্তি ও অন্তঃসারশূন্যতার যৌগ।

রাজনীতির লক্ষ্যই হচ্ছে শক্তি, আর যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, সারাটি জীবন ব্যয় করেন শক্তির জন্যে, তাঁদের আমার বেশ দানবিক মনে হয়।

কিন্তু আমার মতো সবার মনে হয় না; তাঁরা শ্রদ্ধাভক্তি ক'রে সুখী হন। বাঙলা ভাষা এক সময় 'সমৃদ্ধ' হয়ে উঠেছিলো জিন্নাহ বা কায়েদে আজমকে আশ্রয় ক'রে—কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকাররা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তির অলৌকিক মহিমায়। তাঁরা ওই ভদ্রলোকের এতো স্তুতি রচনা করেছিলেন, যা অনেক আর্য দেবতারও ভাগ্যে জোটে নি। আবুল ফজল, পরে যিনি জাতির বিবেক ব'লে গণ্য হন এবং আরো পরে যিনি বিবেকচ্যুত হয়ে এখন কাটাচ্ছেন নির্বাসনের কাল, একটি নাটক লিখেছিলেন মোহাম্মদীতে। পুরোনো ওই পত্রিকাটি আমি পেয়েছিলাম আমাদের বাসার পুরোনো বইপত্রের মধ্যে; কায়েদে আজমকে নিয়ে লেখা নাটকটি প'ড়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম আমি। কী শোচনীয় সামান্য মানুষ আমাদের লেখকেরা, তাঁরা ধন্য হন রাজনীতিবিদদের মতো বাহ্যিক মানুষদের স্তব ক'রে। স্তবের মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে অনুভব করেন তাঁদের দেবতাদের মহিমা, অর্থাৎ শক্তি। আমার সামনে এখন একটি লেখা প'ড়ে আছে 'আধুনিক জগতের অন্যতম বিস্ময় : কায়েদে আজম' নামে, লেখক ইব্রাহিম খাঁ। এভাবেই বিস্মিত হন আমাদের লেখকেরা, স্তুতি করেন রাজনীতিক বীরদের। লেখকদের কতোটা পতন ঘটতে পারে তা পাকিস্থানপর্বের বাঙালি মুসলমান লেখকদের লেখা পড়লে চমৎকার বোঝা যায়। সুফিয়া কামাল ঈদ আর কায়েদে আজম নিয়ে হয়তো শতাধিক পদ্য লিখেছিলেন; তাঁর পদ্যের নাম 'হে মহান নেতা', 'হে সিপাহসালার', 'হে মশালধারী', 'হে অমর প্রাণ', 'নির্ভীক মহাপ্রাণ' ইত্যাদি। তিনি লিখেছিলেন এ-ধরনের চরণমালা :

> তসলীম লহ, হে অমর প্রাণ! কায়েদে আজম! জাতির পিতা!
> মুকুটবিহীন সম্রাট ওগো! সকল মানব-মনের মিতা।
>
> তোমার মুখের কালাম শুনিল : আজাদ। আমরা আজাদ জাতি!
> নিমিষে দাঁড়াল ঝাণ্ডা উড়ায়ে : সম্মুখে আঁধার গহীন রাতি। ['হে অমর প্রাণ']
>
> কায়েদে আজম! আমরা তোমার দান,
> শির পাতি নিয়া বক্ষঃরক্তে রাখিয়াছি সম্মান। ['হে সিপাহসালার']

কী শোচনীয় অর্থবিরহিত শূন্যগর্ভ স্তবস্তুতি। এখানে এসে পড়ে বিশ্বাসের ব্যাপারটি, এবং জানিয়ে দেয় বিশ্বাস কতো স্বল্পায়ু, কতো হাস্যকর। মহিলাকবি ওপরের ছ-পংক্তিতে যা লিখেছেন, তা কবিতা হয়ে ওঠে নি, কতকগুলো পুরোনো মরচেপড়া আবেগ সাজিয়েছেন তিনি এগুলোতে, কিন্তু বুঝতে পারি তাঁর আবেগ উঠে এসেছে তাঁর বিশ্বাস থেকেই। তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেন নি, নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বাস করতেন যে ওই ভদ্রলোক 'জাতির পিতা', বিশ্বাস করতেন, 'কায়েদে আজম! আমরা তোমার দান'। কিন্তু বিশ্বাস খুবই করুণ ব্যাপার; তিনি নিশ্চয়ই এখন আর এ-বিশ্বাস পোষণ করেন না। তবে এখনো তিনি বিশ্বাস করেন জাতির

পিতায়, শুধু ব্যক্তিটি ভিন্ন, ঠিক যেমন ঘটেছে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের বেলা;—যখন তারা এক দেবতা ছেড়ে বিশ্বাস এনেছে আরেক দেবতায়।

আমি রাজনীতিক দেবতায় বা বিধাতায় বা মহানায়কে বা নেতায় বিশ্বাস করি না। অতিজাগতিক বিধাতাদের মতো রাজনীতিক বিধাতাদের কাজও মানুষকে বন্দী ক'রে ফেলা, তাদের নিজেদের বন্দনাকারীতে পরিণত করা। রাজনীতিক বিধাতারা তুচ্ছ মানুষ আমার কাছে; আমি জানি তাঁরা শক্তিমান, কিন্তু শক্তির স্তব করার মতো শোচনীয়তা আর নেই। আমি যাঁদের স্তব করি, স্তব নয়—যাঁদের প্রতি অনুরাগ বোধ করি, তাঁরা কেউ রাজনীতিক দেবতাদের মতো বাহ্যিক শক্তিধর নন। রাজনীতিক নেতারা আন্তর প্রতিভাসম্পন্ন নন, তাঁদের সবটাই বাইরের, ভেতরে কিছু নেই; বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁরা হঠাৎ বিশাল আকারে দেখা দেন; ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁরা অনেকেই চোখের আড়ালে থেকে যেতেন। পৃথিবী চিরকাল চতুর্থপঞ্চম শ্রেণীর মানুষদের দিয়ে শাসিত হয়েছে, যদিও তাঁদের কেউ কেউ রাজ্য স্থাপন করেছেন, জয় করেছেন মহারাজ্য, এমনকি এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা কি কখনো একজন রাজনীতিক এনে দিতে পারেন? পৃথিবী জুড়েই দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ রাজনীতিকই দুর্বৃত্ত; ক্ষমতা দখল করার পর আর তাঁরা ক্ষমতা ছাড়তে চান না, মানুষকে অশেষ দুর্দশায় তলিয়ে তাঁরা উপভোগ করেন মধ্যযুগীয় সম্রাটের জীবন, তাঁদের অবৈধ ধন ও নারীর কোনো হিশেব নেই; কিন্তু তাঁরা করেন অতিমানবিক আচরণ, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা দাবি করেন বিধাতার মর্যাদা। অধিকাংশ রাজনীতিক, যাঁদের মৃত্যুতে সাত দিন ধ'রে শোক পালন করা হয়, ঝুলিয়ে রাখা হয় পতাকা, পরে স্মৃতিসৌধ তোলা হয়, তাঁদের মৃত্যুতে সামান্যও শূন্যতা সৃষ্টি হয় না সমাজে। তাঁরা সাধারণত বিশেষ কোনো কাজের যোগ্য নন। বাজারের চর্মকারটি মারা গেলে বাজারে একটা শূন্যতা দেখা দেয়, বহু লোক জুতো শেলাই করাতে এসে ফিরে যায়, তাদের জীবনে কিছু সময়ের জন্যে হ'লেও বিপর্যয় দেখা দেয়; কিন্তু একজন নেতার মৃত্যুতে তেমন কোনো শূন্যতা দেখা দেয় না। ওই নেতা জুতোও শেলাই করতে পারতেন না, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্ণমালা বা সরল অঙ্ক শেখানোর যোগ্যতাও তাঁর ছিলো না, তিনি আসলে সমাজের কোনো প্রকৃত কাজেই লাগেন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই শক্তিধর; এবং তাঁর মৃত্যুর পর আমরা সাত দিন শোক পালন করি, যদিও শোক পালন করা উচিত বাজারের চর্মকারটির মৃত্যুতে। রাজনীতিকদের মতো আন্তর গুণহীন লোক সমাজে আর নেই। মানুষের দুর্ভাগ্য আন্তর গুণহীন মানুষেরাই শাসন করে মানুষকে।

খুব ক্ষতিকর একটি বিশ্বাস দু-হাজার বছর ধ'রে প্রশংসিত ও জনপ্রিয় যে মানুষের জীবনের থাকা উচিত একটা আদর্শ, মানুষকে জীবন যাপন করা উচিত আদর্শ অনুসারে; তার জীবনের লক্ষ্যই হওয়া উচিত ওই আদর্শের বাস্তবায়ন। কিন্তু

প্রতিটি আদর্শই কারাগার; কোনো আদর্শকে পরম মনে করা হচ্ছে কারাগারকে পরম মনে করা। আদর্শের শেষ নেই পৃথিবীতে, অজস্র আদর্শ ছড়ানো পথেঘাটে, পৃথিবী জুড়ে দশকে দশকে মাতারা জন্ম দিচ্ছেন বিচিত্র আদর্শের জনকদের; তাঁদের সবারই উদ্দেশ্য নিজেদের কারাগারে সবাইকে চিরকালের জন্যে আটকে ফেলা। অন্যদের আটকে ফেলে, নিজেদের কারাগারে রেখে পীড়ন ক'রে, সুখ পায় একদল মানুষ। আদর্শগুলোর মুখে অবশ্যই চমৎকার কারুকাজকরা মুখোশ থাকে, মুখোশের আড়ালের হিংস্র কুৎসিত মুখটিকে দেখা যায় না, মনে হয় মুখোশের আড়ালে আছে অপার্থিব সুন্দর মুখ; কিন্তু মুখোশ সরিয়ে নিলেই কুৎসিত মুখ দেখে কেঁপে উঠতে হয়। ধর্মগুলো জীবনযাপনের আদর্শের কারাগাররূপে বন্দী ক'রে ফেলতে পেরেছে মানুষকে; মানুষ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে সব ধরনের কারাগারের মধ্যে নিকৃষ্টতম কারগারগুলো। এটা ঘটেছে এজন্যে যে ধর্মগুলোই সবচেয়ে দক্ষতার সাথে সবচেয়ে উঁচু এবং সবচেয়ে প্রশস্ত দেয়ালের কারাগার তৈরি করতে পেরেছে। কারাগারে বাস করার মধ্যে যেমন নেই কোনো মহত্ত্ব, তেমনি আদর্শের মধ্যে থাকাও সম্পূর্ণ মহত্ত্বহীন। কিন্তু মানুষকে দীক্ষিত করতে পারলে তারা কারাগারের স্তুতিতেও মুখর হয়ে উঠতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে যে কারাগারই স্বর্গ, দাবি করতে পারে যে আমাদের কারাগারই সত্য ও শ্রেষ্ঠ; তাই সবাইকে ঢুকতে হবে আমাদের কারাগারে। মানুষ জীবন যাপন করার জন্যে জন্মেছে, তার জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই—কেনো থাকবে? জীবন যাপনই তার লক্ষ্য, বিশেষ আদর্শযাপন জীবনের লক্ষ্য নয়। জীবন হচ্ছে বিস্তৃত, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়ানো প্রান্তর, তাতে আছে অপরিমিত আলো বাতাস জল রোদ বৃষ্টি ছায়া মাটি মাধুর্য; আদর্শ হচ্ছে ছিদ্রহীন দেয়ালের পরাক্রান্ত বেষ্টনী। আদর্শের ভেতরে যারা আছে, তারা অসুস্থ; হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, শিখ, বাহাই, কাদিয়ানি, ফ্যাশিবাদী, মৌলবাদী, কঠোর সাম্যবাদী অসুস্থ। ক্যালিগুলার একটা আদর্শ ছিলো, যেমন ছিলো মুসোলিনি, হিটলার, স্তালিন, ও আরো অনেকের, যেমন আছে একনায়কদের; আমরা জানি সেগুলো মানুষের জন্যে কতো মর্মান্তিক। জীবনকে যে কয়েকটি সরল সূত্রে পরিণত করেছে, জীবনে যে শুধু দেখতে চায় ওই সূত্রগুলোর কাজ, সে সুস্থ নয়; আর যারা ওই সূত্রানুসারে বেঁচে থাকে, তারাও সুস্থ নয়। তারা মানুষ নয়, তারা খচ্চর।

আদর্শগুলো বিধিবিধান বা প্রথা ছাড়া আর কিছু নয়; ওগুলোর কাজ বিশেষ ধরনের সমাজ টিকিয়ে রাখা। ওগুলো খুঁজতে দেয় না নিজের পথ, বের করতে দেয় না তার নিজের নিরর্থক জীবনের তাৎপর্য। মানুষ তাই বলি হয়ে গেছে বিশেষ ধরনের সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, ও পরিবারের; মানুষের একান্ত মানবিক ব্যাপারগুলোও হয়ে উঠেছে ক্লান্তিকর। তাই সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে মানুষের : তার কাম, বিয়ে, পরিবার, সন্তান সবই পর্যবসিত হয়েছে ব্যর্থতায়। সমাজ, রাষ্ট্র,

সভ্যতা আরো পরের ব্যাপার ব্যক্তির জীবনে, সেগুলো সম্মিলিত ক্রিয়াকাণ্ড; সেগুলোর ব্যর্থতা তো আরো শোচনীয়, কিন্তু মর্মান্তিক হচ্ছে প্রতিটি নারীনরের কাম, বিয়ে, পরিবার, সন্তান নিয়ে ব্যর্থতা। প্রতিটি মানুষের—নারী ও নরের—মুখের দিকে তাকালে চোখে পড়ে ব্যর্থ তার কাম, ব্যর্থ তার বিয়ে, ব্যর্থ তার পরিবার, ব্যর্থ তার সন্তান। মানুষ যে-সব মহৎ ব্যাপার গ'ড়ে তুলেছে বিবাহ, পরিবার, সন্তান নামে, সেগুলো গ'ড়ে উঠতো না, যদি না থাকতো তার সুন্দর ভয়াবহ অশ্লীল কাম; বিয়ে, পরিবার, সন্তান তার কামের সৃষ্টি। তবে কাম ও সন্তান জৈবিক, বিয়ে ও পরিবার জৈবিক নয়, সামাজিক; কাম থেকে জন্মে তার সন্তান, সমাজ থেকে জন্মে বিয়ে ও পরিবার। কাম ও সন্তান অকৃত্রিম, বিয়ে ও পরিবার কৃত্রিম। কামের রূপ সর্বত্র অভিন্ন, কিন্তু বিয়ে ও পরিরারের রূপ বিভিন্ন। বিবর্তনের ফলে যেদিন উদ্ভব হয়েছিলো কামের, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের যন্ত্রণা; ধর্মীয় বিশ্বাসে ঘটে একই ব্যাপার—কামই হচ্ছে নরনারীর জন্যে নিষিদ্ধ গন্দম। বিজ্ঞানীদের ধারণা দু-বিলিঅন বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিলো কাম। তার আগে বিভিন্ন জৈববস্তু এলোমেলো পরিব্যক্তি অর্থাৎ জিনগুলোর প্রকৃতিবদলের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করতো অবিকল নতুন জৈববস্তু; কিন্তু কাম বিকাশের পর সব কিছু বদলে যায়। আধুনিক বিশ্বের সব কিছু—সন্তান, কবিতা, নভোযান, কম্পিউটার—জন্মেছে কাম থেকে; সব কিছুই শক্তিমান সুন্দর অশ্লীল কামের আত্মজ।

বোকাচ্চিওর *দেকামেরন*-এর একটি গল্প, 'কীভাবে শয়তানকে নরকে পুরতে হয়', মনে পড়ছে। অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ মজার গল্প এটি। এক তরুণ সন্ন্যাসী সাধনা ক'রে চলছিলেন গুহায়, সেখানে এসে উপস্থিত হয় এক সরল রূপসী নিষ্পাপ তরুণী, যে নিজেকে সমর্পণ করতে চায় ক্রাইস্টের পায়ে। স্বর্গে আদমের যে-অবস্থা হয়েছিলো, তাই হয় তরুণ সন্ন্যাসীর; কয়েক দিনের মধ্যে জেগে ওঠে শয়তান—তাঁর কাম। কামে সন্ন্যাসী থরথর কাঁপতে থাকেন। নিষ্পাপ তরুণী জানতে চায়—কী হয়েছে, সন্ন্যাসী, আপনি কাঁপছেন কেনো? সন্ন্যাসী বলেন—আমার ভেতর শয়তান জেগে উঠেছে, তাই কাঁপছি আমি। তরুণী জানতে চায়—কোথায় শয়তান, সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী তরুণীকে দেখিয়ে দেয় উত্তেজিত পাপিষ্ঠ শয়তানকে। তরুণী জানতে চায়—প্রভু, আমি কী করতে পারি, আমাকে বলুন। সন্ন্যাসী বলেন—শয়তানকে নরকে পুরতে হবে, তাহলেই শান্তি পাবো আমি, সুখী হবেন ক্রাইস্ট। তরুণী বলে—নরক কোথায় পাবো, সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী তরুণীকে দেখিয়ে দেয় যে নরক রয়েছে তার নাভিমূলের নিচে। তরুণী বলে—তাহলে আপনি শয়তানকে নরকে পুরুন। সন্ন্যাসী ও তরুণী কয়েক দিন ধ'রে দিনরাত শয়তানকে নরকে পুড়ে শান্তি দিতে থাকে, দাউদাউ জ্বলতে থাকে নরক, পুড়তে থাকে শয়তান। অবিরাম নরকে জ্ব'লে নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে শয়তান, সে আর যন্ত্রণা

দিতে পারে না; কিন্তু তরুণী আবেদন জানাতে থাকে—সন্ন্যাসী, শয়তানকে নরকে পুরুন, আমার নরক জ্বলছে। আর না পেরে গুহা ছেড়ে পালাতে থাকেন তরুণ সন্ত; তার পেছনে পেছনে দৌড়োতে থাকে তরুণী, এবং চিৎকার করতে থাকে—হে সন্ন্যাসী, আপনার শয়তান তো শাস্তি পেয়ে শান্ত হয়েছে, কিন্তু আমার নরক যে জ্বলছে। ওই তরুণ হয়তো পরে হয়ে উঠেছিলেন কামবিদ্বেষী কোনো সন্ত; কোনো সন্ত পল, বা কোনো সন্ত টমাস।

কাম নিয়ে শুরুতে মানুষের বিশেষ উদ্বেগ ছিলো না; কামকে তারা তখন নৈতিকতার মানদণ্ডে পরিণত করে নি, পুরুষ ও নারী উভয়েই এটা উপভোগ করেছে অপরাধবোধে না ভুগে। কিন্তু যেই দেখা দিতে থাকে সম্পত্তি ও সম্পত্তির অধিকার, পুরুষ ক্রমশ হয়ে উঠতে থাকে প্রভু, বুঝতে পারে সন্তান উৎপাদনে তার ভূমিকা, তৈরি করে কতগুলো কৃত্রিম সংস্থা—বিয়ে, পরিবার, সমাজ, তখনই কাম হয়ে উঠতে থাকে মানুষের বড়ো উদ্বেগ, স্বর্গচ্যুতি ঘটে মানুষের। এর আগে নারী কাম উপভোগ করেছে দেহপ্রাণভ'রে; কিন্তু পুরুষ বিয়ে, পরিবার, সমাজ তৈরি ক'রে ছিনিয়ে নেয় নারীর কামসুখ, তাকে ভেঙেচুরে বিন্যস্ত করে নিজের নিচে, কিন্তু খোলা রাখে নিজের কামসুখের সমস্ত দরজা ও সরণি। পুরুষ নিজের জন্যে রাখে বহুপত্নী, অজস্র উপপত্নী, এবং অসংখ্য পতিতা। পুরুষ থেকে যায় বহুগামী, কিন্তু ভুলতে পারে না যে নারীও ছিলো বহুগামী, এবং তার বহুগামিতার শক্তি পুরুষের থেকে অনেক বেশি। তাই পুরুষ মেতে ওঠে নারীনিন্দায়; বলে নারী হচ্ছে জরায়ুর মুখ, যে নিজের তৃপ্তির জন্যে মিলিত হয় শয়তানের সাথেও; বলে নারী হচ্ছে অভিচারিণী, ডাইনি, কির্কি, সাইরেন; বলে স্ত্রীলোক স্বভাবতই রতিপ্রিয়, পুরুষসংসর্গ তাদের যেমন প্রীতিকর দেবতারাও তাদের কাছে তেমন প্রীতিকর নয়; বলে নারী নরকের দরজা; বলে নারী আর আগুনের ক্ষুধাই শুধু কখনো মেটে না। এটা ঠিক যে নারীর উপভোগশক্তি পুরুষের থেকে অনেক বেশি; কিন্তু পুরুষের সভ্যতা নারীকে বিকল ক'রে অবারিত ক'রে রাখে পুরুষের ভোগের পথ। পুরুষ নিজের সুবিধা ও সুখের জন্যে সৃষ্টি করে একনিষ্ঠতা, সতীত্ব নামে নানা নৈতিক ধারণা; তবে পুরুষ কখনোই একনিষ্ঠ আর সৎ থাকে নি, কিন্তু নারীকে বাধ্য করেছে একনিষ্ঠ ও সতী থাকতে, এবং সব সময়ই সন্দেহ করেছে নারীর সতীত্ব সম্পর্কে। পুরুষ হচ্ছে সব ধরনের নৈতিক ধারণার স্বাপ্নিক ও প্রণেতা, আর নারী তার দণ্ডভোগী। উনিশশতকে ভিক্টোরীয়রা নিজেদের সুবিধার জন্যে নারীর ভাবমূর্তি বদলে দিয়ে রটাতে থাকে যে নারী স্বভাবতই একনিষ্ঠ, তার কামও কম; কিন্তু মানুষ, নারী ও পুরুষ, কখনোই একনিষ্ঠ নয়। আমি কয়েকজন নারীর সাথে কথা ব'লে দেখেছি;—তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দেন নারীর একনিষ্ঠতার ধারণা, জানান যে বাধ্য হয়েই তাঁরা একনিষ্ঠ, যদিও তাঁদের স্বামীরা বহুগামী। এক তরুণী, যার প্রথম বিয়ে ভেঙে যায় কয়েক মাসেই, এবং দু-মাসের মধ্যেই আরেকটি বিয়ে করে, তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম দুটি পুরুষের সাথে সংসর্গে

তার মনে কোনো অপরাধবোধ জেগেছে কি না। তরুণী হেসে উঠে বলে—কী যে বলেন, স্যার, এতেই তো মজা। সম্প্রতি পত্রিকায় একটি সংবাদ বেরিয়েছে বাঙলাদেশেরই পল্লীর এক তরুণী সম্পর্কে, যে একই সাথে দুটি বিয়ে ক'রে কিছু দিন থাকছিলো এক স্বামীর সাথে এবং কিছু দিন অন্যজনের সাথে। একনিষ্ঠতা তার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়; বুঝতে পারি দ্বিনিষ্ঠ হয়েই সে পাচ্ছিলো তার কাম্য সুখ। কিন্তু সমাজ এটা মেনে নিতে পারে না; তবে তার ভাগ্য ভালো সমাজ তাকে বেশি শাস্তি দেয় নি।

পুরুষ কামের দাস, কাম চরিতার্থ করার জন্যে সে সব সময় ব্যগ্র; কিন্তু তার মনে কাম জাগায় পাপবোধ; কাম তার কাছে পাপ। এ-পাপবোধকে তীব্র ক'রে তুলেছিলেন খ্রিস্টান সন্তরা; কাম তাঁদের কাছে চরম পাপ। সন্তরা নিজেরা অবশ্য চিরকৌমার্যব্রত পালন করেন নি; যৌবনে প্রচুর কামে ক্লান্ত হয়ে ঘেন্না ধ'রে যায় তাদের, তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করেন কামের বিরুদ্ধে; এবং এক সময় গির্জা তাঁদের অভিষিক্ত করে সন্ত হিশেবে। সন্ত পলের মতে সব ধরনের যৌনসংসর্গ, বিবাহিতই হোক আর অবিবাহিতই হোক, পাপ। এর প্রভাব পড়েছিলো ব্রাহ্মদের, এমনকি তলস্তয় আর গান্ধির ওপরও। উনিশশতকে কিছু ব্রাহ্ম স্বামী-স্ত্রী ঠিক করেছিলো তারা জীবনে আর কখনো সঙ্গম করবে না, থাকবে ভাইবোনের মতো। তলস্তয়, যিনি যৌবনে মনে করতেন রূপসী তরুণী উপভোগ পাপ নয়, স্বাস্থ্যের লক্ষণ, আর গান্ধি, দু-তিনটি তরুণী ডাক্তারের সঙ্গ ছাড়া যিনি সুস্থ থাকতেন না, বুড়ো বয়সে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন সঙ্গম খুবই খারাপ কাজ। ক্লান্ত বুড়োদের মগজে দেখা দেয় কতোই না বিকৃতি। সন্ত পলের মতে কৌমার্য স্বর্গীয়। রাসেল বলেছেন সন্তরা স্বর্গীয় কৌমার্য টিকিয়ে রাখার জন্যে গিয়ে আশ্রয় নিতেন মরুভূমিতে, যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন শয়তানের সাথে, যে তাঁদের কল্পলোক ভ'রে দিতো বিচিত্র ধরনের কামোদ্দীপক দুঃস্বপ্নে। সন্ত জেরোম জানিয়েছেন কেমন কামযন্ত্রণায় কাটতো তাঁর সময় চলসিসের মরুভূমিতে, কামযন্ত্রণায় দেখতে পেতেন তাঁর সামনে নাচছে দলে দলে তরুণী। টমাসের মতে মানুষের প্রধান কাজ বিধাতাকে ভালোবাসা, দ্বিতীয় কাজ প্রতিবেশীদের অল্পস্বল্প ভালোবাসা। তিনি অবিবাহিত সঙ্গম নিষিদ্ধ করেন, কেননা সন্তানদের পিতামাতার সাথে থাকা দরকার। প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব'লে তিনি নিষিদ্ধ করেন জন্মনিয়ন্ত্রণ; তবে তিনি চিরকৌমার্য নিষিদ্ধ করেন নি। তিনি নির্দেশ দেন একবিবাহের কেননা পুরুষের বহুবিবাহ নারীদের প্রতি অন্যায়, আর নারীদের বহুবিবাহ সৃষ্টি করে পিতৃত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চিতি। তিনি ভাইবোনের অজাচার নিষিদ্ধ করেন এ-যুক্তিতে যে এতে স্বামীস্ত্রী ও ভাইবোনের ভালোবাসা মিলে এমন আবেগ সৃষ্টি করবে যে তারা সারাক্ষণ লিপ্ত থাকবে সঙ্গমে। সংসর্গ পাপ, কিন্তু পাপ যে কোথায় শুরু হয় খ্রিস্টান গির্জা তা ঠিকমতো শনাক্ত করতে পারে নি। খ্রিস্টান গির্জা চুম্বন, আলিঙ্গন, মর্দনকে বিশেষ সীমা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে না। এক ক্যাথলিক ধর্মযাজক বিধান দিয়েছিলেন যে স্বীকারোক্তির সময় পুরুষ ধর্মযাজিকার স্তনযুগল

মর্দন করতে পারে, যদি তার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য না থাকে। খ্রিস্টান সন্তরা মুখর ছিলেন সঙ্গমের নিন্দায় : অগাস্টিনের মতে সঙ্গম মূলতই ঘেন্নার ব্যাপার; আরনোবিউসের মতে এটা নোংরা ও হীন কাজ; তারতুলিয়ানের মতে সঙ্গম লজ্জাজনক। সন্তরা বিস্মিত হয়ে ভাবতেন সন্তান জন্মানোর এমন নোংরা উপায়ের বদলে বিধাতা কেনো বের করলেন না কোনো উৎকৃষ্টতর উপায়। বিধাতা কি করতে পারেন এমন নোংরা কাজ? না, এর জন্যে বিধাতার কোনো দোষ নেই; সন্তরা ভেবে বের করেন যে সব দোষ আদম ও হাওয়ার।

পুরোনো ভারত ও গ্রিস পত্নী, উপপত্নী, ও পতিতা সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্তে পৌচেছিলো তার সারকথা বলেছিলেন দেমোসথেনেস : 'পুরুষের কামসুখের জন্যে আছে গণিকারা; প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্যে আছে উপপত্নীরা, আর তার সন্তান লালন ও সতী গৃহিণীর দায়িত্ব পালনের জন্যে আছে পত্নীরা।' এ-তিন ধরনের নারীর মধ্যে পত্নীরাই পেয়েছে সবচেয়ে কম মূল্য, তারা পেয়েছে শুধু পত্নী ও সন্তানের জননী হওয়ার গৌরব। গ্রিসের পুরুষেরা শুধু উপপত্নী ও গণিকায়ই তৃপ্ত ছিলো না; তাদের কাছে প্রমোদের শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিলো বালক। সক্রেতিসের ছিলো আলকিবিয়াদেশ নামে এক বালক প্রেমিক, যার জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন দার্শনিক। উপপত্নী সব পুরুষ রাখতে পারে না, তাদের জন্যে ছিলো, এবং এখনো রয়েছে, সারিসারি পতিতা। পতিতাকে এখন পতিত মনে করা হয়, শুরুতে এমন মনে করা হতো না, তাদের স্থান ছিলো অত্যন্ত উচ্চে; পতিতারা শুরুতে ছিলো 'উচ্চিতা'; তারা জড়িত ছিলো পবিত্র ধর্ম ও ঐশ্বর্যের সাথে। প্লাইতুস বলেছিলেন, 'পতিতা সমৃদ্ধ মহানগরীর মতো, অজস্র মানুষ ছাড়া যার চলে না।' *আদিপুস্তক*-এ (৩৮ পরিচ্ছেদ) একটি অসাধারণ গল্প রয়েছে শ্বশুর জিহুদা আর পুত্রবধূ তামর সম্পর্কে। তামরের বিয়ে হয়েছিলো জিহুদার প্রথম পুত্র এরের সাথে; এর 'সদাপ্রভুর চোখে দুষ্ট' বিবেচিত হওয়ায় সদাপ্রভু তাকে মেরে ফেলেন। এর কেনো 'দুষ্ট' বিবেচিত হয় সদাপ্রভুর চোখে, তা অবশ্য বলা হয় নি বাইবেলে; তবে সম্ভবত সে ছিলো সমকামী, যে স্ত্রীর সাথে প্রথাসিদ্ধ সঙ্গম করতে চায় নি। সমকাম সদাপ্রভুর চোখে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিভীষিকার কাজ, তাই তাকে মেরে ফেলা হয়। এরের কনিষ্ঠ ভাই ওনন; জিহুদা ওননকে বলে, 'তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর, ও তাহার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর।' ওনন জানতো ভাবীর গর্ভে সে উৎপাদন করবে যে-সন্তান, তা তার হবে না, হবে ভাইয়ের; তাই সে 'ভূমিতে রেতঃপাত করিল'। এতেও ক্ষিপ্ত হন সদপ্রভু—তিনি খুবই ক্ষিপ্ত ব্যক্তিত্ব, ক্ষেপে উঠতে তাঁর সময় লাগে না, এবং বধ করেন ওননকে। ওনন যা করে, তাকে আজকাল বলা হয় coitus interruptus, মুসলমানরা বলে 'আজল', যা ইসলামে সিদ্ধ। জিহুদার শেল নামের আরেক পুত্র ছিলো, কিন্তু সে অপ্রাপ্তবয়স্ক; তাই সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত জিহুদা তামরকে পিতার গৃহে গিয়ে বাস করতে বলে।

বহু দিন চ'লে যায়, পরলোকগত হয় জিহুদার স্ত্রী; এবং জিহুদা মেষের লোম কাটার জন্যে যায় তিম্নায়। শ্বশুর আসছে জেনে তামর বিধবার পোশাক ছেড়ে মুখ আবরণে ঢেকে পথের পাশে ব'সে থাকে। জিহুদা তাকে দেখে বেশ্যা মনে করে, পুত্রবধূকে চিনতে না পেরে গিয়ে বলে, 'আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি।' তামর রাজি হয় তাতে; তবে জানতে চায় মিলনের জন্যে কি পারিশ্রমিক দেবে জিহুদা। জিহুদা পাল থেকে একটা ছাগবৎস পাঠাতে রাজি হয়, এবং কাজ সেরে বন্ধক হিশেবে তামরের কাছে নিজের 'মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্টি' রেখে চ'লে যায়। তামর মুখের আবরণ ফেলে আবার বিধবার পোশাক পরে। কিছু দিন পর জিহুদা বন্ধক ফেরত পাওয়ার জন্যে ছাগবৎস পাঠায়, কিন্তু কিছুতেই পথের পাশের বেশ্যাটিকে আর পাওয়া যায় না। তিন মাস পর জিহুদাকে কেউ এসে বলে যে তার পুত্রবধূ বেশ্যা হয়েছে, বেশ্যাবৃত্তির ফলে তার গর্ভ হয়েছে। জিহুদা সৎ মানুষের ক্রোধে জ্ব'লে উঠে বলে, 'তাহাকে বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া দাও।' তামরকে ধ'রে আনা হয় জিহুদার কাছে, এবং সূত্রপাত হয় এক বাইবেলীয় নাটকীয় ঘটনার। তামর বলে, 'যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষ হইতে আমার গর্ভ হইয়াছে।' সে সাথে সাথে বের ক'রে দেখায় তার শ্বশুরের 'মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্টি।' জিহুদাকে স্বীকার করতে হয় যে ওগুলো তারই। জিহুদা নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বের করে এক খোঁড়া যুক্তি যে 'সে আমা হইতেও অধিক ধার্ম্মিকা, কেননা আমি তাহাকে আপন পুত্র শেলাকে দিই নাই।' পুরুষ চিরকাল কামকে রেখেছে নৈতিকতার ওপরে, অন্তত নিজের বেলা; এতে পৌরাণিক ও আধুনিকের মধ্যে পার্থক্য নেই; তবে পুরোনোদের নীতিবোধ ছিলো আরো শিথিল।

গ্রিক পতিতা থাইসকে মনে পড়ছে, যার তরুণ প্রেমিক ইউথিদেমুসকে নানা যুক্তি দিয়ে ভাগিয়ে নিয়েছিলেন এক দার্শনিক। দর্শন অসাধারণ জিনিশ, কাম খুবই খারাপ, এ-যুক্তি দিয়ে ওই তরুণ প্রেমিককে ভাগিয়েছিলেন কোনো এক প্লাতো বা আরিস্ততল (মনে রাখতে পারি প্লাতো আর আরিস্ততলের ছিলো একাধিক রক্ষিতা; বিশশতকে যে-দুই দার্শনিকের, সার্ত্র ও বোভোয়ার, প্রেম কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে তাঁরাও একনিষ্ঠ ছিলেন না; সার্ত্রের মৃত্যুর পর জানা যায় তাঁর ছিলো বেশ কয়েকটি রক্ষিতা, আর বোভোয়ারও মাঝেমাঝে ঘুমোতেন অন্যদের সাথে)। তাতে দুঃখে ভেঙে পড়েছিলো পতিতা থাইস; এবং লিখেছিলো এ-পত্রটি :

> যখন থেকে তুমি দর্শন পড়া শুরু করেছো সে থেকেই তুমি অবজ্ঞা করছো আমাদের মন্দিরকে। সে থেকে তুমি বেশ গর্বে এবং হাতে বই নিয়ে যাচ্ছো অ্যাকাডেমিতে, হেঁটে যাচ্ছো আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যেনো তুমি কখনো চোখ ফেলো নি এ-বাড়ির ওপর। তুমি পাগল হয়ে গেছো, ইউথিদেমুস; তুমি কি জানো না ওই দার্শনিকটি, যে অমন গম্ভীর মুখে তোমার উদ্দেশে বর্ষণ করে ওইসব বিস্ময়কর বক্তৃতা, সে কী ধরনের মানুষ? তুমি কি জানো ওই লোক আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যে চেষ্টা ক'রে

আসছে কতোখানি? আর সে কতোখানি পাগল মেগারার পরিচারিকা হারপিলিসের জন্যে? তবে আগে তাকে আমি গ্রহণ করতাম না, ওই দার্শনিকের সোনার বদলে তোমাকে বাহুতে জড়িয়ে ধ'রেই ঘুমোতে পছন্দ করতাম আমি। তবে সে যখন আমার ভালোবাসা থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমি এখন তাকে আসতে দেবো; এবং যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমাকে দেখতে দেবো যে তোমার নারীবিদ্বেষী বিদ্যালয়শিক্ষক শুধু রাতের স্বাভাবিক প্রমোদেই সন্তুষ্ট নয়। তুমি কি মনে করো যে দার্শনিক গণিকার থেকে উত্তম? যখন কেউ গণিকার সাথে থাকে সে কখনো স্বৈরাচারীর ক্ষমতা চায় না, বা দ্রোহ সৃষ্টি করে না রাজ্যে।...বিধাতা আমাদের বেশি আয়ু দেন নি; ঘুম থেকে জেগে তুমি দেখো না যে তুমি নিজেকে অপচয় ক'রে ফেলেছো বাঁধা এবং বাজেকথায়। বিদায়।

পুরুষ হচ্ছে রাজা; আর পুরুষদের রাজা হচ্ছে রাজারা। রাজারা যেভাবে কাম উপভোগ করেছে, তার মধ্যেই মিলে পুরুষদের কামক্ষুধার পরিচয়, পারলে প্রতিটি পুরুষই রাজাদের মতো মেটাতো নিজেদের ক্ষুধা। রাজারা চিরকালই বহু বিয়ে করেছে, রেখেছে অজস্র উপপত্নী, সেবা নিয়েছে অসংখ্য পতিতার। বহুবিবাহ কেমন রাজকীয় রূপ নিতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায় হাজার বছর আগের চীনের রাজপ্রাসাদে। সেখানে নিয়ম ছিলো রাজার থাকবে ১টি রানী, ৩টি পত্নী, ৯টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্নী, ২৭টি তৃতীয় শ্রেণীর পত্নী, এবং ৮১টি উপপত্নী। রাজার এমন বিশাল প্রমোদবিভাগ চালানোর জন্যে থাকতো কয়েকজন নারী 'কাম সচিব'। এদের দায়িত্ব ছিলো রাজা যাতে ঠিক নারীটির সাথে ঠিক দিন ঠিক সময় পর পর ঠিক মতো মিলিত হয় তা পরিচালনা করা। ত্যাং রাজত্বকালে রাজার নারীদের সংখ্যা বেড়ে হাজারে পৌঁছে, এবং কাম সচিবের কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়। হিন্দু আর মুসলমান রাজারা যখন যার সাথে ইচ্ছে হতো তারই সাথে মিলতো, চীনা রাজাদের সে-স্বাধীনতা ছিলো না, মিলিত হতো সচিবদের নিপুণ হিশেব অনুসারে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে নারী সংগ্রহ ও উপভোগের জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে বাগদাদের বাদশারা, এবং পরে তুরস্কের অটোমান রাজারা, যাদের মহাকীর্তির নাম হারেম। অটোমান রাজাদের হারেমে থাকতো ৩০০ থেকে ১২০০র মতো রক্ষিতা, এবং তাদের দেখাশোনার জন্যে থাকতো একপাল প্রহরী, সহচর, খোজা, বস্ত্ররক্ষয়িত্রী, দাসী। সৌদি আরবের স্থপতি আবদুল আজিজেরও ছিলো ১৭টি স্ত্রী; আর জন্মেছিলো ৫৪টি পুত্র ও ২১৫টি কন্যা।

পুরুষ কখনো একনিষ্ঠ নয়, কামে সৎ পুরুষ উপকথামাত্র। ধর্মগুলোর মধ্যে শুধু ইসলামেই পুরুষের বহুকামিতা স্বীকার করে, এবং রেখেছে পুরুষের চারটি বিয়ের বিধান, তবে নারীর জন্যে বিধান করেছে কঠোর একবিবাহ। ইসলামপূর্ব আরব নারী অবশ্য উপভোগ করতো একই সাথে একাধিক স্বামীর সংসর্গ, তার সে-সুখের অবসান হয় ইসলামের আবির্ভাবে। আরব ছিলো অনেকটা মাতৃতান্ত্রিক, ইসলামপূর্ব আরবে পিতৃপরিচয় গৌণ ব্যাপার ছিলো, সন্তানেরা পরিচিত হতো

মায়ের পরিচয়েই। ষষ্ঠশতকের শেষ দিকে আরবসমাজের বদল শুরু হয়েছিলো, ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে প্রচুর ধন জমছিলো পুরুষদের হাতে, দেখা দিচ্ছিলো পিতৃতন্ত্র; পুরুষেরা চাচ্ছিলো তাদের ধনের উত্তরাধিকারী হবে তাদের ঔরসজাত সন্তানেরা, অন্য পুরুষের সন্তানেরা নয়। ইসলাম ওই সময়ে আরবসমাজে প্রতিষ্ঠা করে পিতৃতন্ত্র; মাতা হয়ে ওঠে গৌণ। ধর্মেও ঘটে একই ব্যাপার; অবসান ঘটে মক্কার লাত, মানত, উজ্জা, নামের দেবীদের। ইসলামপূর্ব আরবে পুরুষ বিয়ে ক'রে যেতো স্ত্রীর গোত্রে, স্ত্রী থেকে যেতো নিজের গোত্রেই; এবং নারী একই সাথে কয়েকটি বিয়ে করতে পারতো, পুরুষও অবশ্য পারতো। ইসলাম পুরুষের বহুবিবাহ সীমাবদ্ধ করে চারটিতে, এবং নারীর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে সম্পূর্ণরূপে। নারীর বহুস্বামী নিষিদ্ধ করায় শুরুতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও হয়েছিলো, কিন্তু শক্তিমান ইসলাম নারীদের স্তব্ধ ক'রে দিতে দ্বিধা করে নি।

একই সাথে পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখা এখন অত্যন্ত নিন্দিত; এবং নারীর একই সাথে একাধিক স্বামী রাখার কথা সভ্যরা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, যদিও তিব্বতে এটা এখনো প্রচলিত। এ-কামনির্ভর একনিষ্ঠ নৈতিকতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে খ্রিস্টধর্ম থেকে; একেই এখন মনে করা হয় নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা। এক সাথে চার স্ত্রী রাখার বিধানের জন্যে ইসলাম আজকাল খুবই বিব্রত, তাই অনেক মুসলমান রাষ্ট্রে এটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে নানা শর্ত জুড়ে। পৃথিবী জুড়ে সবাই এখন নির্বিচারে বিশ্বাস করে যে এককালে এক স্বামী-এক স্ত্রীই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নৈতিকতা। নৈতিকতার মানদণ্ডে কোনো কিছু বিচার করাই অনৈতিক—যুগে যুগে নৈতিক বিচার ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, এবং তথাকথিত আধুনিক মানুষের এ-বিশ্বাস মূলত ঘোর অনৈতিক ও শিহরণজাগানো কপটতায় পরিপূর্ণ। এক স্বামী-এক স্ত্রী সংস্থার মধ্যে যেমন নেই কোনো নৈতিকতা, তেমনি কোনো অনৈতিকতা নেই এক স্বামী-একাধিক স্ত্রী, এবং এক স্ত্রী-একাধিক স্বামীর মধ্যে। আমাদের নৈতিকতাবোধ দূষিত, কেননা এর ভিত্তি কাম বা যৌনসংসর্গ। তবে কাম বা যৌনসংসর্গ পেরিয়ে গভীরে ঢুকলে দেখি যে বর্তমান নৈতিকতার ভিত্তি মালিকানা বা অধিকার। আমরা নিজেদের সম্পত্তির ওপর অন্যের সামান্যতম অধিকার যেমন স্বীকার করি না, তেমনি নারী ও পুরুষের শরীর ও কামকে মনে করি একান্তভাবে পরস্পরের সম্পত্তি; পুরুষটি ও তার দেহ ও তার কাম নারীর সম্পত্তি, আর নারীটি ও তার দেহ ও তার কাম পুরুষটির সম্পত্তি। কাম ও অধিকারভিত্তিক নৈতিকতা কোনো নৈতিকতাই নয়, তা অনৈতিকতা।

এর ভেতরে রয়েছে এক বড়ো কপটতাও। পৃথিবী জুড়ে পুরুষ প্রকাশ্যেই বহু নারী ভোগ করছে, আর নারীরাও গোপনে, যদিও পরিমাণে অনেক কম, ভোগ করছে বহু পুরুষ। ইউরোপ-আমেরিকায় নারীপুরুষ উভয়েরই বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু বহুকাম নিষিদ্ধ নয়; সেখানে পুরুষ ও নারী উভয়েই একই সময়ে ও সারা

জীবনে উপভোগ করছে বহু নারী ও পুরুষ। তাই একনিষ্ঠতা এক হাস্যকর কপট ধারণায় পরিণত হয়েছে; পরিণত হয়েছে বলা ঠিক হচ্ছে না, একনিষ্ঠতা কখনোই ছিলো না। কাম ও অধিকারকে নৈতিকতার ভিত্তি ক'রে মানুষ কোন অনৈতিক পাতালে নেমেছে, তার পরিচয় পাই টেস্টটিউবে শিশুপ্রজননে। এ-অসাধারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে রয়েছে করুণ কামভিত্তিক নৈতিকতা। মনে করা যাক স্ত্রীটি উর্বর, কিন্তু স্বামীটি অনুর্বর; এ-ক্ষেত্রে বর্তমান আবিষ্কার কোনো অজ্ঞাত পুরুষের বীর্যে ও নারীটির ডিমে টিউবে উন্মেষ ঘটাচ্ছে একটি মানুষের; তারপর সেটি ঢুকিয়ে দিচ্ছে নারীটির জরায়ুতে। আবিষ্কারটি অসাধারণ, ব্যাপারটি খুবই চমৎকার; কিন্তু সবটাই গভীরভাবে অনৈতিক। আমরা যদি উন্নত নৈতিকতার অধিকারী হতাম, কামকে ভিত্তি না করতাম নৈতিকতার, তাহলে একটি উর্বর পুরুষ দিয়ে সহজেই গর্ভবতী করতে পারতাম নারীটিকে। কিন্তু নারীর সতীত্ব আমাদের টিকিয়ে রাখতেই হবে, তার ভেতর অন্য কোনো পুরুষকে আমরা ঢুকতে দিতে পারি না; স্ত্রীটি একটু সুখ পাক, তাও আমরা চাই না, কিন্তু সন্তান চাই; এবং সাথে সাথে বেশ বড়ো একটা ব্যবসাও ক'রে দিতে চাই। এর চেয়ে শোচনীয় অনৈতিকতা আর হ'তে পারে না। প্রাচীন ভারত ছিলো আমাদের থেকে অনেক উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন; সেখানে ব্যবস্থা ছিলো ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মদানের। *মহাভারত*-এ বিচিত্রবীর্যের ছিলো দুই স্ত্রী, অম্বালিকা ও অম্বিকা। সন্তান জন্মদানের আগেই ক্ষয়রোগে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হ'লে সত্যবতী ব্যাসকে দিয়ে অম্বালিকার গর্ভে উৎপাদন করে পাণ্ডুকে, আর অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রকে। অন্য পুরুষের দ্বারা নারীর সন্তান জন্মানোই ছিলো ক্ষেত্রজ রীতি, ওই সন্তান পরিচিত হতো পিতার নামেই, বীর্যদাতা পুরুষটির পরিচয়ে নয়। তারা কামকে বড়ো ক'রে তোলে নি ব'লে তারা ছিলো উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন। আমাদের নৈতিকতা অনৈতিক ও কপট। বিবাহ ও পরিবার যে পরিণত হয়েছে ব্যর্থ সংস্থায়, তার মূলে এই অনৈতিক ও কপট নৈতিকতা; বর্তমান বিবাহরীতিতে নারীপুরুষ উভয়েই অসুখী। এখন পৃথিবী জুড়ে চলছে অবিশ্বাস ও অপ্রেমের সংসার। ইউরোপ আমেরিকা এখন মেনে নিচ্ছে সমকাম ও সমলৈঙ্গিক বিয়ে, চলছে স্বামীস্ত্রী বিনিময়, এবং সেখানে গোপনে চলছে সম্মিলিত বিয়ে বা কাম, ও আরো অজস্র রীতি। যদি কোনো পুরুষ একাধিক নারীর সাথে বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবন যাপন করতে চায়, তারা সবাই যদি তাতে সুখী হয়, তাতে কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়; এবং কোনো নারী যদি একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবন যাপন করতে চায়, তারা সবাই যদি তাতে সুখী হয়, তাতেও কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। তাদের ওই জীবনযাপন অন্য কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, সুখী করে তাদের; তাই তা অনৈতিক নয়। মানুষ ক্রমশ সেদিকেই এগোচ্ছে, বর্তমানের অনৈতিক নৈতিকতা বেশি দিন তাদের বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। একদিন সমাজ থেকে উঠে যাবে কাম ও অধিকারভিত্তিক বিবাহ, পরিবার, ও নৈতিকতা।

নৈতিকতার সীমা হওয়া উচিত সংকীর্ণ : আমার কোনো কাজ যেনো অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রে—এটুকু; কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত নীতিপ্রণেতারা এর সীমা বাড়িয়ে মানুষের জীবনের সব কিছুকে ঘিরে ফেলেছে, বন্দী ক'রে ফেলেছে, তার বাস্তব ও স্বপ্নকে বিপর্যস্ত ক'রে ফেলেছে; তবে 'আমার কোনো কাজ যেনো অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে'—এ-শর্তটিকেও পূরণ করতে পারে নি। প্রথাগত নৈতিকতার লক্ষ্য স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া; তা যতো বেশি স্বাধীনতা কাড়তে পারে ততো বেশি নৈতিক মনে করে নিজেকে। এ-সমাজ কি নারীকে মুখ খোলা রেখে বাইরে বেরোতে দেয়? না, দেয় না; তাই এ-সমাজ অত্যন্ত নৈতিক ও ধার্মিক। এ-সমাজে কি পুরুষ অন্য কোনো নারীর সাথে বেড়াতে যেতে পারে? না, পারে না; তাই এ-সমাজ খুবই নৈতিক ও ধার্মিক। নৈতিকতা এমনই পীড়াদায়ক ও হাস্যকর। কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণকে বিবেচনা করা উচিত অত্যন্ত অনৈতিক ব'লে, মানুষ স্বাধীনতা দেয়াই হওয়া উচিত নৈতিকতার ভিত্তি। নৈতিক মানদণ্ড খুবই নিকৃষ্ট মানদণ্ড, কেননা তা বস্তুনিষ্ঠ নয়; তা কিছু অসুস্থ মানুষের তৈরি মানদণ্ড। এখন সমাজগুলো চলছে নানা ধর্মীয় নৈতিকার মানদণ্ডে, অর্থাৎ কয়েক হাজার বছর আগের কিছু মানুষের ভালোলাগা/মন্দলাগা ও বিশ্বাসের ওপর। খুব সরল উদাহরণ হিশেবে খাদ্যের ওপর বিধিনিষেধের ব্যাপারটি বিবেচনা করতে পারি। বিভিন্ন ধর্মে বেশ কিছু খাদ্য নিষিদ্ধ; হিন্দুর গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ বা অনৈতিক, মুসলমানের শুয়োরমাংস খাওয়া ও মদ্যপান নিষিদ্ধ বা অনৈতিক। মুসলমান ও, হিন্দু ছাড়া, সবাই গোমাংস খায়, তাদের ধর্ম ও নৈতিকতা ক্ষুণ্ন হয় না, কোনো ক্ষতিও হয় না; মুসলমান ছাড়া সবাই তৃপ্তির সাথে শুয়োরমাংস খায় ও মদ্যপান করে, তাদের ধর্ম ও নৈতিকতা নষ্ট হয় না, কোনো ক্ষতিও হয় না। যা অধিকাংশের জন্যে নৈতিক, তা অল্প কিছু মানুষের জন্যে অনৈতিক; তাই বুঝতে পারি এখানে যে-নৈতিকতা কাজ করে, তা নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী; তাই একে নৈতিকতা বলা যায় না। হিন্দু গরু খেলে কারো কোনো ক্ষতি হয় না, মুসলমান শুয়োরমাংস খেলে বা মদ্যপান করলে কারো কোনো ক্ষতি হয় না; তাই একে অনৈতিক মনে করতে পারি না। কিন্তু এ-নিষেধগুলো কেনো? এ-নিষেধগুলোর পেছনে নৈতিকতা নেই, বিজ্ঞান নেই;—আজকাল ছদ্মবিজ্ঞানীরা আদিম মানুষের অজস্র কুসংস্কারকে বিজ্ঞানসম্মত ব'লে প্রমাণ ক'রে প্রচুর ধন উপার্জন করছে; এগুলোর পেছনে আছে বিধানপ্রণেতাদের কুসংস্কার ও স্বেচ্ছাচার।

মুসলমানের চোখে শুয়োর জঘন্যতম ঘেন্নার বস্তু; এর নামে মুসলমান যতোটা শিউরে ওঠে নরকের নামেও ততোটা ওঠে না। বন্দুকের টোটায় শুয়োরের চর্বির গুজব শুনে তারা মহাবিদ্রোহই ঘটিয়েছিলো ১৮৫৭ সালে। একটি ঘটনা মনে পড়ছে। বিলেতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আপ্যায়নে আমরা ছিলাম কিছু দিন। প্রাতরাশে একটি সুস্বাদু মাংসটুকরো প্রতিদিনই থাকতো, যার নাম 'বেকন'।

কয়েক দিন পর আমার এক ধার্মিক বাঙলাদেশীয় বন্ধু ও আমি একই টেবিলে বসি। তিনি বেকন কেটে কেটে খেতে বলেন—'এই বেকন জিনিশটা যে কী বুঝতে পারছি না, কিন্তু এর থেকে সুস্বাদু জিনিশ আর আমি খাই নি।' তিনি জানতে চান—'বেকন কী?' আমি বলি—'এটা শুয়োরমাংস।' বন্ধুটি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যান, দু-হাতে মুখ চেপে ধরেন, প্রাতরাশ না ক'রেই দৌড়ে বেরিয়ে যান। ঘৃণা ও সংস্কার কতোটা প্রবল হ'তে পারে মানুষের সেদিন আমি চোখের সামনে দেখতে পাই। শুয়োর একটি নিরীহ প্রাণী, সেটি কোনো নৈতিকতা ও ধর্মের কথা জানে না; জানে না তাকে কারা ঘৃণা করে, কারা করে না। ঘৃণার ব্যাপারটিই আপত্তিকর, ঘৃণাকারীরা অসুস্থ। বলা হয়েছে যে শুয়োরমাংস হচ্ছে 'রিজস', অর্থাৎ 'abomination', 'unclean', বা 'ঘৃণা ও ভীতির বস্তু' বা 'অপবিত্র'। অধিকাংশ মুসলমান, যদি জিজ্ঞেস করা হয় সে কেনো শুয়োর খায় না, বলে যে এটা নিষিদ্ধ। তবে একদল শিক্ষিত মেলে যারা গর্বের সাথে বলে, তারা এটা খায় না, কেননা এটা খেলে রোগ হয়। মজা হচ্ছে যে আরবে শুয়োর ছিলো অপরিচিত; তবে এটা কেনো নিষিদ্ধ হলো? এটা ঠিক যে শুয়োরমাংস খেলে Trichinosis নামে একটি মৃদু রোগ হতে পারে, তবে এটা উনিশশতকের আগে কেউ জানতো না। গরু, ছাগল, মেষ প্রভৃতি পশুর মাংস থেকেও মানুষের শরীরে রোগ ছড়াতে পারে, সেগুলো তো খাই আমরা। শুয়োর নিষিদ্ধ হলো কেনো? আমি তা ব্যাখ্যা করবো না। অবশ্য শুয়োর মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ হওয়ায় শুয়োররা যে খুব দুঃখিত, তা নয়; তারা এসে কেঁদেকেটে বলে না যে দয়া ক'রে আমাদের খাও; লাভই হয়েছে তাদের এতে, তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে।

মদ্যপানও নিষিদ্ধ মুসলমানের জন্যে; তবে মদকে শুয়োরমাংসের মতো ঘেন্না করে না তারা, বরং ধনী মুসলমান খুবই ভালোবাসে অ্যালকোহল, গরিবরাও অপছন্দ করে না। মদের বিরুদ্ধে মুসলমান জগতে একটা বড়ো অপপ্রচার চলে ব'লে এই চমৎকার বস্তুটির ভাবমূর্তি বেশ নষ্ট হয়ে গেছে; এবং মুসলমান পরিবারে খামোখা গোলমাল লেগে থাকে। স্বর্গে মদ থাকবে, মর্তেও এটা খারাপ নয়। মদ সম্বন্ধে মুসলমানের কপটতা ভালোভাবে ধরা পড়ে বর্তমানে উৎপাদিত 'ইসলামি বিয়ার' ও এ-ধরনের পানীয়তে। বিয়ার হচ্ছে বিয়ার, তাতে অ্যালকোহল থাকবে; কিন্তু ধার্মিক মুসলমান অ্যালকোহল খাবে না, মদের নাম খাবে। কী শোচনীয় এই নৈতিকতা। মদ মুসলমানের কল্পনাকে বেশ ভ'রে রাখে—মুসলমান মদের প্রতি বিকর্ষণ বা আকর্ষণ বোধ করে, কিন্তু কখনো ভুলে থাকতে পারে না। মদ মুসলমানের কল্পনাকে কতোখানি ভ'রে রাখে তার পরিচয় পাই বিপুল পরিমাণ আরবি ও ফারসি কবিতায়; এবং নজরুলের এ-পবিত্র পংক্তিটিতে : 'খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে।' আরবি কবিতা ও *আরব্যরজনী* মদের গন্ধে ভরপুর। ইসলামি পাকিস্থানে মদ্যপান সম্পর্কে খুশবন্ত সিং জানিয়েছেন যে

মদ সেখানে রাভি নদীর মতো প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় না, তবে সব ধনীর বাড়িতেই চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। চার্লস গ্লাস (*টাইম্‌স্ লিটেরেরি সাপ্লিমেন্ট*, ২২ এপ্রিল ১৯৯৪) সৌদি আরবে মদ্যপানের কপটতা সম্পর্কে লিখেছেন :

> অ্যালকোহল রাখা নিষিদ্ধ, কিন্তু আমি যেখানেই গেছি, রাজপুত্র, মন্ত্রী, দূতদের ভবনে আমাকে আপ্যায়ন করা হয়েছে হুইস্কি দিয়ে (জনপ্রিয় হচ্ছে জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল)। আমি জানতে পারি যে এক সন্ধ্যায় যে-রাজপুত্রের সাথে আমি হুইস্কি পান করছিলাম, তিনি পরদিন ভোরে এক ব্যক্তিকে মদ্যপানের অপরাধে কারাদণ্ডিত করবেন।

পৃথিবী জুড়েই মুসলমান মদ্যপান করে; আর আরবরা পান করে না, মাছের মতো গিলে। মদ্যপান মুসলমানের জন্যে একদিনে নিষিদ্ধ হয় নি, হয়েছে ক্রমশ, এক বিখ্যাত ব্যক্তির মত্ততার জন্যে এটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় চিরকালের জন্যে; এর জন্যে ব্যবস্থা হয় আশিটি চাবুকের, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের। তবে আরবরা নতুন ধর্মের আগেও মদ খেয়েছে, পরেও খেয়েছে ও খাচ্ছে, এবং মদ খাওয়া নিয়ে লিখেছে প্রচুর কবিতা, যেগুলো পরিচিত 'খামারিয়া' বা 'মদের কবিতা' নামে। দ্বিতীয় খলিফার কালে বারবার মদের প্রশংসা ক'রে কবিতা লিখে কারাগারে গেছেন, ও নির্বাসিত হয়েছেন কবি আবু মিহ্‌জান; তাঁর একটি কবিতার অংশ এমন :

> দাও, বন্ধু, একটুকু মদ আমি পান করি; আমি
> ভালোভাবে জানি মদ সম্পর্কে কী নির্দেশ দিয়েছে বিধাতা।
> আমাকে দাও খাঁটি মদ যাতে আমার পাপ হয় বৃহৎ
> কেননা অমিশ্র মদ পান করলেই পরিপূর্ণ হয় পাপ।

এ-কবিতার প্রতিবাদটুকু চোখে পড়ে সকলেরই। মদের শ্রেষ্ঠ কবি আবু নুয়াস (৭৬২-৮১৪), যাঁকে বারবার দেখা যায় *আরব্যরজনীতে* হারুন আলরশিদের সাথে। মদের প্রশংসা ক'রে মৃত্যুদণ্ড তিনি এড়াতে পারেন নি; হায়, নির্বোধ কবি, কেনো প্রশংসা করো; প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে নিন্দে করো, এবং গোপনে মাছের মতো খাও। শুধু কবিরাই নন, বীরেরাও মদ খেতেন, তাঁরাই খেতেন বেশি, খালিদ ইবনে ওয়ালিদের জীবনীকার গর্বের সাথে জানিয়েছেন খালিদ যৌবনে নিয়মিত নামতেন মদ্যপানের প্রতিযোগিতায়, এবং প্রথম হতেন।

মদ্য একদিনে নিষিদ্ধ হয় নি, প্রথমে এটি প্রশংসিতই ছিলো, পরে নিষিদ্ধ হয় কয়েক পর্যায়ে। আদিমুসলমানদের কেউ কেউ পান ক'রে খুবই অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলেন, যার জন্যে এটা নিষিদ্ধ হয় যায়। এ-সম্পর্কে যে-কাহিনী প্রচলিত, তা সত্যিই স্তম্ভিত করে আমাদের। কোনো সচিব সচিবালয়ে গিয়ে বা কোনো অধ্যাপক ক্লাশে গিয়ে মাতলামো করেছে, এমন কখনো ঘটে নি; কিন্তু ওই ব্যক্তি খুবই অশোভন আচরণ করেছিলেন উপাসনালয়ে। ১৬.৬৭ তে আছে : 'And among fruits you have the palm and the vine, from which you get

wine and healthful nutriment: in this, truly, are signs for those who reflect'(রোডওয়েল)। এতে রয়েছে একটি শব্দ 'সকর'। এর অর্থ নিয়েই অনুবাদকদের মধ্যে বিরোধ : দাউদ অনুবাদ করেছেন; 'intoxicants', পিকথল করেছেন 'strong drink', ইউসুফ আলি করেছেন 'wholesome drink'; ইসলামিক ফাউন্ডেশন করেছে 'মাদক'। মদ্যপান একেবারেই খারাপ নয়; আমি খাই, শামসুর রাহমান খান এবং খায় লাখ লাখ বাঙালি ও মুসলমান, এবং খেয়েছেন গ্যালিলিও, নিউটন, শেক্সপিয়র, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন; খান অজস্র সচিব, সম্পাদক, অধ্যাপক, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাষ্ট্রপতি, উপাচার্য বিচারপতি, দূত, পুলিশ। নিষেধ মানসিক রোগ সৃষ্টি করে; মুসলমান যখন মদ খায়, তার মনে অপরাধবোধ জন্মে, কেননা পরিবার ও সমাজ তাকে মনে করে মাতাল, দেখে খারাপ চোখে। অনেককে জানি আমি যারা মদ খেয়ে বাসায় ফেরার আগে খান প্রচুর পানগুপুরিজির্দা, কেউ কেউ চিবোন পেয়ারাপাতা; অনেকে অপরাধবোধে ভুগে ভুগে পুরোপুরি মাতাল হয়ে পড়েন, কাঁদতে থাকেন, বাসায় আর ফিরতে পারেন না। এ-অসুস্থতা থেকে উঠে আসতে হবে মুসলমানকে; মদকে মনে করতে হবে একটি পানীয়, যা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পান করে।

বহু দিন মার্ক্স, এঙ্গেলস, সাম্যবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, বিপ্লব শব্দগুলো শুনি না। কেউ বললে বা দেয়ালে এ-শব্দগুলো দেখলে কেঁপে উঠি, তারপর শান্ত হই। আমি কখনো শ্লোগানে মুখর হই নি, যাঁরা মুখর হ'তেন এখন তাঁদের পুঁজির শ্লোগানে মেতে থাকতে দেখি। পৃথিবী কি তার শেষ সামাজিক পরিণতিতে পৌঁছে গেছে, সব অসুখ কি সেরে গেছে পৃথিবীর? পৃথিবীতে কি আর গরিব নেই? পৃথিবী কি এখন ভাসছে ডলারের স্রোতে? এ-শব্দগুলো এখন নিষিদ্ধ শব্দের মতো, এবং এগুলো আজ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। মার্ক্স যে বলেছিলেন দার্শনিকেরা এতো দিন শুধু নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বকে, এখন দরকার তাকে বদলে দেয়া; আমরা কি ফিরে যাবো আবার মার্ক্সের আগে, শুধু ভাষ্যের পর ভাষ্য লিখবো পৃথিবীর? শুধু স্থগিত রাখবো তাকে বদলে দেয়া? গরিব আরো গরিব হ'তে থাকবে, ধনী আরো ধনী; আর গরিবেরা শুধু ব্যবহৃত হবে ধনীদের ক্ষমতা দখলের শ্লোগানে? মার্ক্স ধর্মকে বলেছিলেন 'গরিবদের আফিম'; অনেকটা প্রশংসার্থেই তিনি প্রয়োগ করেছিলেন রূপকটি, কিন্তু এর আধুনিকত্বে মর্মাহত হয়েছেন ধার্মিকেরা। ধার্মিকেরা ব'লে থাকেন যে বিধাতাই শেষ আশ্রয়, যার আর কিছু নেই তার আছে বিধাতা, মার্ক্স এ-অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন রূপকটি; তবে তিনি এর মূল্য বদলে দিয়েছিলেন। সব কিছু নিরর্থক হয়ে যাওয়ার পরই এক সময় মানুষ খেতো আফিম, যেমন আজকাল গ্রহণ করে মাদক; আফিমের মাদকতায় তারা সুখ পেতো, কিন্তু শেষে অসার হয়ে পড়তো; বিধাতায়ও তাই হয়, সুখ পেতে পেতে শেষে মানুষ অসার হয়ে পড়ে। গবিরদের সাথে বিধাতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাকে পাওয়ার জন্যে টাকাপয়সা লাগে না। ভাওয়ালে

পর্তুগিজ পাদ্রি আস্‌সুম্পসাঁউও বুঝেছিলেন 'ঈশ্বর থাকেন গরিবদের আঙিনায়'; তাই যেতে হবে সেখানেই। মানুষ শিক্ষিত হয়ে জন্ম নেয় না, জন্ম নিয়েই সে বিচার করতে পারে না সব কিছু; একটি মানুষকে তৈরি করতে দু-দশক সময় কেটে যায়। গরিবের সন্তানকে প্রস্তুত করে দারিদ্র্য; তার কিছু নেই, তার ওপর সহজেই চাপিয়ে দেয়া যায় বিধাতাকে। বাঙলাদেশে এখন তাই হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীলতা যে তীব্র বেগে বাড়ছে, তার কারণ দারিদ্র্য। ধনীরা ধর্মকে পাত্তা দেয় না কিন্তু ধর্ম দিয়ে যেহেতু তারা প্রতারণা করতে পারে, তাই নানা খেলা খেলে তারা ধর্মের সাথে; এবং সবচেয়ে করুণ খেলাটি খেলে গরিবদের সাথে।

দারিদ্র্য কোনো বিধাতার উপহার নয়, কোনো ঐতিহাসিক নিয়তিও নয়; এটা রাজনীতিক, ও প্রচণ্ড সন্ত্রাসের ফল; দারিদ্র্য সম্পদের অভাবের জন্যে ঘটে না, ঘটে তার অপব্যবহারের জন্যে; একথাই জানিয়েছিলেন মার্ক্স। কিন্তু চারপাশে তাকালে কী দেখতে পাই? দেখতে পাই দারিদ্র্য করুণাময়ের দান, তিনি যাকে করুণা করেন তাকে পাঁচখানা পাজেরো দান করেন, আর যাকে ইচ্ছে করেন তাকে রেললাইনের পাশে টায়ার পুড়ে রান্না ক'রে খেয়ে মরতে বাধ্য করেন। গরিবদের অনেকের সাথে আমি কথা ব'লে শিউরে উঠেছি, দেখেছি সত্যিই তারা বিশ্বাস করে তাদের দারিদ্র্য বিধাতারই দান। ধর্ম এমন ব্যাপার যা শূদ্র হওয়াকে, দরিদ্র হওয়াকে ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত করে; শূদ্র ও দরিদ্র বিশ্বাস করে এভাবেই সে স্বর্গে যেতে পারবে। এ-বিশ্বাস অবশ্য নিজের নয়, হাজার হাজার বছর ধ'রে এটা তাকে শেখানো হচ্ছে, প্রতিদিন ধার্মিকেরা তাদের এটা শেখান; তাই তাদের মনে এ-বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। ধর্ম দিয়ে তাদের এখন আরো মাতিয়ে রাখা সম্ভব। কিছু টাকা ছেড়ে দিলে ধর্ম ও অর্থের বিশ্রণে তাদের মধ্যে উৎপন্ন হয় এমন উত্তেজক মাদক, যা বিপ্লবের সব সম্ভাবনাকে দীর্ঘকালের জন্যে স্থগিত ক'রে দেয়। আমরা অবশ্য অনেক বিপ্লব ও তার ব্যর্থতা দেখেছি। বিশশতক তো যুদ্ধ ও বিপ্লবেরই শতাব্দী। উনিশশতক ছিলো জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ প্রভৃতির শতাব্দী, যা বিপন্ন ক'রে তুলেছিলো পৃথিবীকে; আর বিশশতকে ঘটেছে এতো প্রচণ্ড বিপর্যয় যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষকে মুক্ত করা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ আর বিপ্লব এক নয়, যদিও দুটিতেই ঘটে সন্ত্রাস; বিপ্লব আধুনিক ব্যাপার, বিপ্লবের সাথে থাকে মুক্তির চেতনা। হান্না আরেন্ড্ট্ দেখিয়েছেন আধুনিক বিপ্লবের ধারণার সূচনা হয় আঠারোশতকের আমেরিকা ও ফরাশিদেশে। যুদ্ধের ফলে নানা বদল ঘটে, কিন্তু বিপ্লব শুধু বদল ঘটায় না। বিপ্লবের সাথে জড়িত থাকে এ-চেতনা যে সমাজের চলিত অবস্থা অবধারিত নয়, আবশ্যকও নয়। প্রাকৃতিক সূত্রে কোনো ধনীগরিব নেই। বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনি যখন মানুষ বোধ করে যে দারিদ্র্য অবধারিত নয়, এটা মানুষের সৃষ্টি; মনে করতে থাকে যে একদল মানুষ, পরিস্থিতির সুযোগ, বা শক্তিপ্রয়োগ, বা জোচ্চুরি ক'রে ধন

আয়ত্ত করেছে, এবং আরেক দল, যারা তা পারে নি, হয়ে আছে দরিদ্র; তাই ধনীগরিবের পার্থক্য অবধারিত নয়, শাশ্বতও নয়। কোনো বিপ্লব আজো সফল হয় নি; পৃথিবীর দুটি বড়ো বিপ্লব—ফরাশি বিপ্লব ও রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেছে। দু-এক দশকে আর বিপ্লবের মুখ দেখবো ব'লে আশা করতে পারছি না; কেননা প্রতিক্রিয়াশীলতা এখন ব্যাপক, আর গরিবেরা বিশ্বাস করছে যে বিধাতাই তাদের গরিব করছে, আর ধনী হ'তে চাইলে তাদের সুযোগ নিতে হবে পরিস্থিতির, বা জোচ্চুরির—এটাই বিধাতার বিধান।

চারদিকে চলছে জীবনের উৎসব, প্রাণের রঙিন কার্নিভাল, আবেগে গাল লাল হয়ে উঠছে, সবুজ হয়ে উঠছে পাতা; এ-কার্নিভালে কুৎসিত মুখোশ প'রে কে নাচছে তুমুল নাচ?—মৃত্যু। মানুষের চিন্তায় মৃত্যু বিমূর্ত ধারণা নয়, মানুষের মনে মৃত্যু এক সজীব অস্তিত্ব, যার কাজ তার রঙিন উৎসবকে অন্ধকার ক'রে তোলা। সে চলছিলো, একদিন থেমে যাচ্ছে, কোনো দিন জানবে না সে ছিলো। অন্যরা হয়তো জানবে, যদি সে জানার মতো হয়, তবে একদিন ভুলে যাবে। আমি বড়ো হয়েছি মৃত্যুর মধ্যে, মৃত্যুপরিবৃত হয়ে; ছেলেবেলায় মাঝেমাঝেই শুনতাম কোনো বাড়ি থেকে উঠছে করুণ কান্নার রোল, বুঝতাম কেউ মারা গেছে, কেঁপে উঠতাম। আমার চারদিকে অন্ধকারে ঢেকে যেতো, কোনো রাতও অমন অন্ধকার নয়। তারা সাধারণত হতো শিশু—বালকবালিকা, আমার মতোই, কখনো আমার থেকে ছোটো, কখনো বড়ো। বুড়োরাও মরতো, তবে অমন করুণ কান্না উঠতো না তাদের মৃত্যুতে। ভাবতাম আমার জন্যেও মৃত্যু অপেক্ষা ক'রে আছে; আমি ম'রে যাবো, আর কুয়াশায় হাঁটবো না, রোদে দাঁড়াবো না, ঝাঁপিয়ে পড়বো না পুকুরে, উঠবো না গাছে, যাবো না ইস্কুলে। বুক সব সময়ই ভারী হয়ে থাকতো; আমার সারাটি বছরই ছিলো মৃত্যু দিয়ে ঘেরা, প্রতিটি মাসই ছিলো মৃত্যুর মাস; চারদিকে দেখতাম মৃত্যুর মুখ, কিন্তু তার মুখ দেখতে পেতাম না। কলেরা আসবে কার্তিকে, রহস্যময় শাদা শাড়ি প'রে এক নারী চুল উড়িয়ে হেঁটে যাবে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে, তার শাদা আঁচল লাগবে আমাদের বাঁশের বেড়ায়, রাতে আমি বমি ক'রে ফেলবো, আমি ম'রে যাবো; বসন্ত আসবে চোত বা বোশেখে, আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে এক দমকা বাতাস বয়ে যাবে, আমার জ্বর আসবে, আমি ম'রে যাবো। সারা বাল্যকাল ভ'রে আমি মৃত্যুকে পথে পথে, বেড়ার পাশে, পুকুরের জলে, ধানের গুচ্ছে, শিশিরে, গাছের ডালে, আর কুয়াশারোদের ভেতরে দেখতে পেয়েছি। যারা আমাদের গ্রামে ম'রে যেতো, যদি তারা আমারই বয়সের হতো, আমি ম'রে যেতাম তাদের সাথে; তাদের সাথে কাফন প'রে আমি নেমে যেতাম কবরে, আমার ওপর মাটি ঝ'রে পড়তো, আমার চারদিকে উঠতে থাকতো অবোধ্য শ্লোকের ভীতিকর শব্দ, আগরবাতির দমবন্ধকরা গন্ধ। আমার ঘুম আসতো না। কতোবার যে আমি ম'রে গেছি আমার বাল্যকালে।

মৃত্যু খুবই কাছে থেকে দেখেছি আমি, বাল্যকালে; যৌবনের পর আর মৃত্যু

কাছে থেকে দেখি নি। মৃত্যু বাল্যকালের পর আমার কাছে মূল্য বা মর্যাদা হারিয়ে ফেলে; আমি ভুলেই যাই যে মৃত্যু আছে, বা থাকলেও আমার তাতে কিছু যায় আসে না, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। পঞ্চম/ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখন, আমাদের পাশের বাড়ির এক বুড়ো, যাঁকে আমি দাদা বলতাম এবং তিনিও আমাকে দাদা বলতেন, তিনি মারা যাবেন, তাঁর পাশে কেউ নেই, শুধু আমি ছিলাম। তিনি মারা গেলেন, আমি সবাইকে ডেকে জানালাম যে দাদা মারা গেছেন। আমার কোনো কষ্ট লাগে নি; এমনকি আমি তাঁর কবরও অনেকটা খুঁড়েছিলাম। কয়েক বছর পর যখন আমার ছোটো এক ভাই ম'রে গেলো, রাতে অসুখ হয়ে চ'লে গেলো ভোরবেলাতেই, কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলো, আমি তার কবর খুঁড়তে পারি নি, আমি তার কবরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। এখনকার শিশুদের, অন্তত আমার শ্রেণীটি যাদের জন্ম দিচ্ছে ও লালনপালন করছে, তারা মৃত্যু চেনে না, মৃত্যু তারা দেখে নি; আমার কাছে মৃত্যুর যেমন জীবন্ত অস্তিত্ব ছিলো, তাদের কাছে মৃত্যুর তেমন অস্তিত্ব নেই। তারা দূর থেকে শোনে মৃত্যু আছে, কিন্তু তা তাদের নাড়া দেয় না, একবার শুনে তারা অন্য দিকে মন দেয়, ক্রিকেট খেলতে যায়; তারা কান্নার করুণ সুর শুনতে পায় না। তারা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, মৃত্যুর ভয় ও বেদনা থেকেও বিচ্ছিন্ন। তারা হয়তো অনেক কুসংস্কার থেকে মুক্ত; এবং মুক্ত অনেক ভয় থেকে। ইউরোপ আমেরিকায় মৃত্যু আরো বিমূর্ত, আরো নিরবয়ব হয়ে উঠেছে; সেখানে অনেকে আছে, যারা কখনো কারো মৃত্যু দেখে নি, কোনো লাশ দেখে নি। সেখানে শিশুদের পিতামাতারা সাধারণত মারা যায় না, আর সাধারণত শিশুরা মারা যায় না; যারা মারা যায়, তারা জীবন থেকে অনেক আগেই অনেক দূরে স'রে গেছে। হাসপাতাল তাদের মানবিকভাবে লোকান্তরিত হওয়ার ব্যবস্থা করে, সমাহিতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মানবিকভাবে তাদের সমাহিত করে; চারপাশে কোথাও মৃত্যুর দাগ লাগতে দেয় না। সেখানে কেউ মরে না, একদিন অনুপস্থিত হয়ে যায়।

শুধু মানুষ নয়, সব প্রাণীর মৃত্যুর কথাই আমার মনে পড়ে। হিংস্র বাঘ, বিশাল হাতি, হরিণ, বা সাপ, বা পিঁপড়ে কীভাবে মারা যায় আমি জানি না; তারা কতোটা কষ্ট পয়, তা আমি জানি না। কীভাবে মরে টিয়ে, চড়ুই, কবুতর, কাক, তাও আমার জানা নেই। আমি জানি না তারা মৃত্যুকে মানুষের মতোই ভয় করে কি না। তারা কি জানে মৃত্যুর কথা? আমি দু-একটি পাখি ও বেড়ালকে ধীরেধীরে মরতে দেখেছি; কী তীব্র কষ্টে তারা বিবশ হচ্ছে, মুমূর্ষু হচ্ছে, চোখে চরম হতাশা জমা বাঁধছে, তাও দেখেছি; কিন্তু তারা কি জানতো, তারা মারা যাচ্ছে? সম্ভবত অন্য কোনো প্রাণীরই মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা নেই; না কি আছে?

খুবই কষ্ট পাই আমি তাদের জন্যে, যারা হঠাৎ ম'রে যায়, আর যারা মরে যায় নামপরিচয়হীন। পরিস্থিতি একটু ভিন্ন হ'লেই তারা মরতো না, থাকতো জীবনের উৎসবে; কিন্তু পরিস্থিতি সামান্য ভিন্ন হওয়ায় তারা স'রে গেছে। তাদের

কথা ভাবলে খুব তীব্র নিরর্থকতার বোধে আক্রান্ত হই আমি, যেমন তীব্র নিরর্থকতার বোধ হয় হিরোশিমা আর নাগাসাকির কথা ভাবলে। ওই দুই নগরের মানুষ যুদ্ধের মধ্যেও ভালো ছিলো; হঠাৎ তাদের ওপর লাফিয়ে পড়লো বিস্তৃত নরক। যারা ম'রে গেলো তারা জানলোও না কীভাবে কোথায় থেকে হঠাৎ এলো এমন মৃত্যু। চরম নিরর্থকতার ও আকস্মিকতার বোধ নিয়ে স'রে গেছে ওই দুই নগরের মানুষ। মৃত্যু কী রূপে দেখা দিয়েছিলো আউসহিবট্‌জে, হিটলারের মানুষনিধনকুণ্ডে? ধার্মিকেরা বলেন বিধাতা করুণাময়, এটা কেমন করুণা তাঁর? দুটি নগরের অসংখ্য মানুষ ধ্বংস করা হলো আণবিক বোমায়, আউসহিবট্‌জে পোড়ানো হলো লাখ লাখ মানুষ তাঁরই করুণায়? নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি কি দয়াময় নন? না কি তিনি মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন ওই সময়? হ্বেইনবার্গ এমন নির্বিকার বিধাতার কাছে প্রার্থনা করাকে মনে করেন চরম অভদ্রতার কাজ। এলাই হ্বিসেল বলেছেন আউসহিবট্‌জে শুধু মানুষের মৃত্যু হয় নি, মৃত্যু হয়েছে মানুষ ধারণাটিরও; আউসহিবট্‌জে বিশ্ব পোড়ায় তার আপন হৃদয়। আউসহিবট্‌জ একা হিটলারের কাজ নয়, ওই কাজে অংশ নিয়েছিলো নানা পেশার মানুষ : লেখক ও শিক্ষকেরা প্রস্তুত করেছিলো ঘেন্নার উর্বর জমি, যেখানে হিটলার বুনেছিলো তার ইহুদিবিদ্বেষের বীজ, ছাত্র ও পাঠকেরা তুলেছিলো তার ফসল; আইনজীবীরা আইন তৈরি ক'রে বিচ্ছিন্ন করেছিলো ইহুদিদের এবং প্রস্তুত করেছিলো বধ্যভূমি, চিকিৎসকেরা নারীপুরুষশিশুর ওপর গ্যাস প্রয়োগ ক'রে চালিয়েছিলো পরীক্ষা; বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানসাধকেরা সম্পন্ন করেছিলো বন্দীদের ওপর তাদের নৃশংস নিরীক্ষা; ব্যবসা-ব্যবস্থাপকেরা ব্যবহার করেছিলো তাদের শস্তা শ্রমিকরূপে। কোনো আদিম সমাজে ঘটে নি আউসহিবট্‌জ; ঘটেছিলো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, শিল্পকলায় উন্নত এক সমাজে। এ-সমাজের কাছে কি চাইবো না আমার মানবিকতা বা মনুষ্যত্ব? তার বদলে যা দেখতে পাই, তা হচ্ছে সব কিছুই সম্ভব মানবসমাজে; মানুষের এক গোত্র সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারে আরেক গোত্রকে। একাত্তরে কি তা-ই দেখি নি আমরা? সম্ভব হ'লে কি পাকিস্থানি ঘাতকেরা সম্পূর্ণ নির্মূল করতো না বাঙালিদের?

আউসহিবট্‌জে বিধাতার ভূমিকা কী? এ প্রশ্ন শুনে আমি হো হো ক'রে হেসে উঠবো; ন্যায়পরায়ণ ধার্মিকেরা চুপ ক'রে থাকবেন, স্থূল ধার্মিক হয়তো একে গণ্য করবে ইহুদিদের ওপর বিধাতার অভিশাপ ব'লে। কিন্তু বাঙলাদেশে গণহত্যায় কি ভূমিকা বিধাতার? রাজনীতিক কারণে হয়তো সবাই চুপ থাকবে। বাঙলাদেশে গণহত্যা বা আউসহিবট্‌জে বিধাতার ভূমিকা কি দর্শনের বিষয় হ'তে পারে? হ্যাঁ, হ'তে পারে; যেমন আউসহিবটজে বিধাতার ভূমিকাকে দর্শনের বিষয়ে পরিণত করেছেন এলাই হ্বিসেল। হ্বিসেল নিজে বন্দী ছিলেন আউসহিবট্‌জের মৃত্যুশিবিরে; কিন্তু বেঁচে গিয়েছিলেন, তবে ওই বাঁচা বদলে দিয়েছিলো তাঁর সব কিছু। তিনি বলেছেন লেখক হওয়ার কথা তাঁর ছিলো না; কিন্তু তিনি লেখেন,

কেননা তিনি তাৎপর্য দিতে চান তাঁর বেঁচে থাকাকে; নইলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। যে-ইহুদিনিধনকুণ্ড জ্বালিয়েছিলো হিটলার, তার মূলে রয়েছে সামাজিক রাজনীতিক আর্থনীতিক কারণ ও তার ব্যক্তিগত বিকার; তবে হ্বিসেল এর সাথে যুক্ত করেন বিধাতাকেও। তাঁর মতে বিধাতাকে বাদ দিয়ে এ-মহানরক ব্যাখ্যা করা যায় না। কীভাবে বিধাতাকে জড়ানো যায় এমন অশুভ ব্যাপারে? তাহলে কি বিধাতা আর শয়তানের মধ্যে পাতাতে হবে আবার বন্ধুত্ব, মিটমাট ক'রে ফেলতে হবে তাদের পুরোনো কলহ? বিধাতাকে কি দাঁড় করাতে হবে কাঠগড়ায়? ধার্মিকেরা সব সময় বিধাতাকে শুভ দেখতে চান, আর অশুভ সব কিছু চাপিয়ে দেন শয়তানের বা মানুষের ওপর। হ্বিসেল এটা মেনে নেন না; তাঁর মতে বিধাতাকে অতি শুভ মনে করাতেই বৈধতা পায় অশুভ। এ নিয়ে তিনি লিখেছেন এক অসাধারণ নাটক : *বিধাতার বিচার*।

মৃত্যু কাকে বলে? মৃত্যু হচ্ছে জীবনপ্রক্রিয়ার উল্টোনোঅসম্ভব পরিসমাপ্তি; আর ফেরা নেই, আর অগ্রগতি নেই; চিরকালের জন্যে থেমে যাওয়া। যে ছিলো সে আর নেই; আর সে নিশ্বাস নেয় না, তার শিরা আর কাঁপে না, আলো তাকে আর চকিত করে না, আঘাত তাকে আর ব্যথা দেয় না। তাপহীন হয়ে ওঠে তার শরীর, কিছুক্ষণ পর শক্ত হয়, আরো কিছুক্ষণ পর পচন ধরে। জীবনের কিছু আর তার জন্যে নয়—একদিন স্বপ্ন ছিলো, সোনা ছিলো, তা আজ নিরুত্তর শান্তি পায়, যেনো কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে; তার জন্যে অপেক্ষমাণ এখন মাটি ও আগুন। বিজ্ঞান এখন নানা উপায় বের করেছে নিশ্চিতভাবে জানতে যে সত্যিই লোকটি মরেছে কি না? কেনো এতো উপায়? মানুষ মরতে চায় না ব'লেই—গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে? অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে? মৃত্যুর ভয়ে চিরকালই জ'মে গেছে মানুষ; আধুনিকদের থেকে সম্ভবত পুরোনোরাই ভয় পেয়েছে বেশি; তাই মৃত্যু নিয়ে তাদের ভাবনাকল্পনার শেষ নেই। তারা কল্পনা করেছিলো আত্মা; আর আত্মাকে বিস্মৃতির নদী পার করিয়েছে, বাস করিয়েছে বিস্মৃতিলোকে, তাকে ত্রাণ করার উপায় কল্পনা করেছে, ছায়ামূর্তিরূপে রেখেছে মৃতদের দেশে, প্রেতলোকে, শেষে বিচার করিয়েছে, এবং পাপপুণ্য অনুসারে রেখেছে স্বর্গে বা নরকে। মৃত্যুভয়েই দেখা দিয়েছিলো এসব উন্মত্ত কল্পনা; সত্যের মুখোমুখি না হয়ে তারা তৈরি করেছিলো সুখকর সুন্দর মিথ্যে। অনেক পাগল ভেবেছে মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই আরেক রূপ, তার জীবন ছুটে চলেছে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায়, এক বিমানবন্দর থেকে আরেক বিমানবন্দরে। হিন্দুরা ভয়ে কল্পনা করেছে বারবার জীবন, বৌদ্ধরা নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে চেয়েছে জীবন থেকে। আমি যেমন ছেলেবেলায় চারপাশে মৃত্যু দেখতাম পুরোনোরাও দেখতেন, তাই তাঁরা অনেক কিছুর মুখে দেখতে পেতেন মৃত্যু। তাঁরা মৃত্যু ও নারীকে দেখতেন অভিন্নরূপে। হোমারে পাই পাখিনারী সাইরেনদের, যারা মৃত্যুর প্রতিমূর্তি। কঙ্কালও এক সময় ছিলো মৃত্যুর প্রতীক।

রোম্যান্টিক কবিরা অবশ্য শিশুর মতোই কল্পনা করেছেন মৃত্যুকে : রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনো তা রাধার কাছে কৃষ্ণের মতো, কখনো মায়ের এক স্তন থেকে আরেক স্তনে স্থানান্তর—প্রচুর মাতৃদুগ্ধ পানের ব্যবস্থা রয়েছে মৃত্যুর পর; ডান যদিও বোধ করেছিলেন যার জন্যেই ঘন্টা বাজুক তা বাজে তাঁর জন্যেই, কিন্তু কবিতা লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'মৃত্যু তুমি গর্বিত হয়ো না' চিৎকার ক'রে বলেছেন, 'মৃত্যু তুমি নেই'। মৃত্যুর থেকে গর্ব করার অধিকার আর কার আছে? হাহাকারের মতো শোনায় ডানের এই চিৎকার। তবে মৃত্যু সাম্যবাদী, সবাইকে নামিয়ে আনে একই সমতলে—একই আবর্জনাস্তূপে; সব সোনার ছেলেরা অবশেষে চিমনিঝাড়ুদার বালকদের মতো ধুলোয় মেশে, এবং রাজা ও সম্রাটের হাড় প'ড়ে থাকে পাশাপাশি। আসলেই কি থাকে—মর্মর প্রাসাদ ওঠে ভিখিরির কবরে? কবরে না কি গরিবও কোটিপতিকে, মৃত্যুদণ্ডিত কবি পিটার পেট্রিক্স-এর ভাষায়, বলতে পারে : we're equal now, I'll not an inch resign;/This is my dunghill, as the next is thine। স্বর্গনরক নেই, আমরা কেউ স্বর্গে কেউ বা নরকে যাবো না, কিছু দিন শুয়ে থাকবো নিজ নিজ গোবরগাদায়।

আমি জানি, ভালো ক'রেই জানি, কিছু অপেক্ষা ক'রে নেই আমার জন্যে; কোনো বিস্মৃতির বিষণ্ন জলধারা, কোনো প্রেতলোক, কোনো পুনরুত্থান, কোনো বিচারক, কোনো স্বর্গ, কোনো নরক; আমি আছি, একদিন থাকবো না, মিশে যাবো, অপরিচিত হয়ে যাবো, জানবো না আমি ছিলাম। নিরর্থক সব পুণ্যশ্লোক, তাৎপর্যহীন সমস্ত প্রার্থনা, হাস্যকর উদ্ধত সমাধি; মৃত্যুর পর যে-কোনো জায়গায়ই আমি প'ড়ে থাকতে পারি,—জঙ্গলে, জলাভূমিতে, পথের পাশে, পাহাড়ের চুড়োয়, নদীতে, মরুভূমিতে, তুষারস্তূপে। কিছুই অপবিত্র নয়, যেমন কিছুই পবিত্র নয়; কিন্তু সব কিছুই সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর এই তাৎপর্যহীন জীবন। অমরতা চাই না আমি, বেঁচে থাকতে চাই না একশো বছর; আমি প্রস্তুত, তবে আজ নয়। চ'লে যাওয়ার পর কিছু চাই না আমি; দেহ বা দ্রাক্ষা, ওষ্ঠ বা অমৃত, বা অমরতা; তবে এখনি যেতে চাই না; তাৎপর্যহীন জীবনকে আমার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে আমি আরো কিছুকাল তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে যেতে চাই। আরো কিছুকাল আমি নক্ষত্র দেখতে চাই, নারী দেখতে চাই, শিশির ছুঁতে চাই, ঘাসের গন্ধ পেতে চাই, পানীয়র স্বাদ পেতে চাই, বর্ণমালা আর ধ্বনিপুঞ্জের সাথে জড়িয়ে থাকতে চাই, মগজে আলোড়ন বোধ করতে চাই। আরো কিছু দিন আমি হেসে যেতে চাই। একদিন নামবে অন্ধকার—মহাজগতের থেকে বিপুল, মহাকালের থেকে অনন্ত; কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি আরো কিছু দূর যেতে চাই।
